পরিচয়

বর্ষ ৪২ । সংখ্যা ৪-৫

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

সূচিপত্র

সম্পাদক:

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ: কমল সাহা

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

বাংলা-বিহার সীমান্তে ছড়িয়ে থাকা চারজন
কবির একত্র সংকলিত কাব্যগ্রন্থ

আলোকিত ইচ্ছার তরীগুলি

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। অজিত পান্ডে। সুভাশীষ দাসগুপ্ত
তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ করছেন : বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

পরিচয়
বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৪
কার্তিক ১৩৭৯

'লুটেশিয়া'-র মুখবন্ধ

হাইনরিখ হাইনে

[উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগণ্য জার্মান কবি ও প্রবন্ধকার হাইনরিখ হাইনে-কে (১৭৯৭-১৮৫৬) বলা হয় "মানুষের মুক্তির চারণ কবি।" তিনি নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার শবাধারের উপরে একটি তরবারি রেখে দিও কারণ মানব-মুক্তির যুদ্ধে আমি নিষ্ঠাবান সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।"

কার্ল মার্কসের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো হলেও, হাইনে ছিলেন মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মার্কসের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। মার্কস তাঁর বহু লেখায় হাইনের কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হবার পর হাইনে তা পড়ে কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন এবং স্বভাবতই এই "মানব-মুক্তির সৈনিক-কবি" কমিউনিস্ট-বিরোধী উগ্র টিউটনিক জাতীয়তাবাদী জার্মান বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

হাইনের এই 'লুটেশিয়া' পত্রাবলী তারই ফল। ১৮৫৫ সালে এই প্রবন্ধ-সংকলনটি যখন ফরাসী অনুবাদে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি প্রকাশকের অনুরোধে তার এই মুখবন্ধটি লেখেন। এতে হাইনে একদিকে যেমন জার্মান জাতীয়তাবাদীদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন, আরেকদিকে তেমনি তিনি বুর্জোয়া সমাজের অনিবার্য পতন আর বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর জয় ঘোষণা করেছেন।—অনুবাদক]

রিপাবলিকানরাই যেক্ষেত্রে 'আউগ্‌সবের্গের জেইটুং'-এর সংবাদদাতার কাছে এমন একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই সংবাদপত্রটির পক্ষে সোশ্যালিস্টগুলোর তাল সামলানো যে আরো কতো ভয়ানক কঠিন, তা

তো বোঝাই যায়। সোশ্যালিস্ট না বলে বরং ওই দানবগুলোকে, ওদের আসল যে নাম, সেই কমিউনিস্ট নামে অভিহিত করাই ভালো। কিন্তু তবু, বাস্তবিক পক্ষে, আমি এই পত্রিকাটিতে ওদের নিয়ে আলোচনা করার কাজে সত্যিই সফল হয়েছি। এর সম্পাদক মহাশয়গণ এই প্রাচীন নীতিবাক্যটি মনে রেখেছিলেন যে "দেয়ালের গায়ে ইবলিসের ছবি এঁকো না", আর এই নির্দেশ-নামাটি মনে রেখে তাঁরা বহু চিঠিই চেপে গেছেন। কিন্তু আমি যা যা লিখেছিলাম তার সবটাই তাঁরা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। এবং, আগেই যে-কথা বলেছি, তাঁদের সংবাদপত্রের অতীব বিচক্ষণ স্তম্ভগুলিতে এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করার সুযোগ আমি খুঁজে নিয়েছি যেটার প্রচণ্ড জরুরী গুরুত্বটাকে সে সময়ে ঠিক মতো উপলব্ধি করা হয় নি।'

আমার নিবন্ধটির দেয়ালের গায়ে আমি ওই ইবলিসের ছবিই এঁকেছি; কিংবা, একজন সুরসিক ব্যক্তির ভাষায় বলা যেতে পারে, আমি ওর হয়ে অতি চমৎকার প্রচারকার্য চালিয়েছি। এই কমিউনিস্টগুলো প্রত্যেকটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাদের অভিন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর জানার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত; 'আউগ্‌স্‌বের্গের জেইটুং' পড়েই ওরা প্রথম জানতে পারল যে ওদের সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে; জানতে পারল তাদের আসল নামটাও—যে নামটা পুরনো সমাজ কর্তৃক রাস্তার কোণে পরিত্যক্ত এই সব বেচারী অনাথ শিশুদের অনেকেই একেবারেই জানত না। 'আউগ্‌স্‌বের্গের জেইটুং'-এর মারফতেই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কমিউনিস্টদের ছোট ছোট দলগুলো এই নির্ভরযোগ্য খবরটুকু জানতে পারল যে তাদের আদর্শের অবিচলিত অগ্রগতি ঘটে চলেছে; অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তারা জানতে পারল যে, ছোট্ট দুর্বল একটা গোষ্ঠী হওয়া তো দূরের কথা, তারাই বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত পার্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাদের দিন এখনও না এলেও, ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে, আর সেইজন্যেই কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাটা তাদের পক্ষে সময়ের অপব্যয় হবে না।

ভবিষ্যৎ যে কমিউনিস্টদের হাতে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা আমি এক মহা যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তার স্বরে ব্যক্ত করেছি, এবং, হায়! আমি মোটেই ভান করে এ কথা বলি নি। আমি সত্যিই মহা আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ভবিষ্যতের সেই দিনটির দিক তাকিয়ে আছি যেদিন এই বদমাস কালাপাহাড়গুলো ক্ষমতা দখল করে বসবে। নির্মম হাতে অত্যন্ত হৃদয়হীন ভাবে তারা আমার একান্ত

প্রিয় এইসব অপূর্ব সুন্দর মর্মর মূর্তিগুলি ভেঙে চুরমার করবে। কবি যেসব জিনিস প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, শিল্পের সেই সমস্ত খেলনা আর নিতান্ত তুচ্ছ অতিলৌকিক কল্পনাকে পিষে মারবে। আমার লরেল গাছের কুঞ্জকে ধ্বংস করে দিয়ে তারা সেই ক্ষেতে আলু বুনবে। মাঠের ওই লিলি ফুলগুলি—যারা কোনো কাজও করে না, সুতোও কাটে না, অথচ রাজসিক মহিমায় সমুজ্জ্বল সম্রাট সলোমনের মতোই এক অপূর্ব গৌরবে ভূষিত—ওরা সব হাতে মাকু তুলে নিতে অনিচ্ছার ভাব দেখালেই ওদের সব্বাইকে সমাজের জমি থেকে উপড়ে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। গোলাপদের ভাগ্যেও এই একই ব্যাপার ঘটবে—ওই যারা নাইটিঙ্গেল পাখিগুলোর অকর্মা অবসরবিলাসী প্রিয় বধূ, আর নিতান্তই অকেজো গাইয়ের দল ওই নাইটিঙ্গেলগুলোকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এবং, হায়! হায়! ওই মুদী কি-না আমার গানের বই কাব্যগ্রন্থের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানাবে ভবিষ্যৎ দিনের বুড়ীগুলোকে কফি কিংবা তামাক দেবার জন্যে।

হায়! দেখতে পাচ্ছি, এই সবই আসন্ন; এবং, যখনই ভাবছি যে বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের হাতে আমার কবিতার কী দুর্দশাই না হবে, তখনই আমার মনটা এক অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় ভরে উঠছে: পুরনো এই রোমান্টিক জগতের সব-কিছুর সঙ্গে সে-ও বিনষ্টি লাভ করবে।

কিন্তু তবু, খোলা মনেই স্বীকার করছি, আমার সমস্ত মানসিক প্রবণতা আর আগ্রহগুলির প্রতি এহেন শত্রুভাবাপন্ন কমিউনিজমের দিকে আমার হৃদয় এমন একটা গভীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে থাকে যে আমি কিছুতেই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারিনে। আমার মনের মধ্যে দুটি কণ্ঠস্বর তার পক্ষ নিয়ে অনবরত বলে চলেছে—দুটি কণ্ঠস্বর—যে-কণ্ঠ দুটিকে আমি কিছুতেই রোধ করতে পারছিনে। বাস্তবিক পক্ষে তারা ওই ইবলিসের ফিসফিসানি হলেও হতে পারে; কিন্তু সে যা-ই হোক-না-কেন, আমাকে ওদের ভূতে ধরেছে এবং এমন কোনো ভূত ঝাড়ার মন্ত্র নেই যার শক্তি ওদের তাড়িয়ে দিতে পারে।

এই কণ্ঠ দুটির মধ্যে প্রথমটি হল: যুক্তিশাস্ত্রের কণ্ঠস্বর। দান্তে বলেছেন, ইবলিস যুক্তিতর্কে ভারী পটু। যুক্তিশাস্ত্রের ভয়ঙ্কর একটা অনুমানবাক্য আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, এবং "প্রত্যেক মানুষেরই খাবার অধিকার আছে"—এই সূত্রমুখটিকে যদি আমি খণ্ডন করতে না পারি, তাহলে এর সমস্ত ফলশ্রুতিই আমি মেনে দিতে বাধ্য। কথাটা যখনই ভাবতে বসছি, তখনই আমাকে

উন্মাদ হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি, আমাকে ঘিরে সত্যের শয়তানগুলো বিজয়োল্লাসে নৃত্য করছে, নিদারুণ এক হতাশায় আমার মনটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে আর আমি চিৎকার করে বলে উঠছি: এই পুরনো সমাজের বিচার আর শাস্তিবিধান বহুকাল আগেই হয়ে গেছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক! ধ্বসে পড়ুক এই পুরনো জগৎ—যে-জগতে সরলতা-পবিত্রতার বিলোপ ঘটেছে, অহংবাদেরই বাড়বাড়ন্ত—যে-জগতে মানুষই মানুষকে শোষণ করে। মিথ্যা আর দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ এইসব চুনকাম করা সমাধি-স্তম্ভগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাক। এবং, ধন্য হোক সেই মুদী যে-কিনা আমার কবিতার বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা তৈরি করে কফি বা তামাক ওজন করে দেবে গরীব মানুষগুলোর জন্যে, ভবিষ্যৎ দিনের সেই বুড়ী ভালো মানুষের মেয়েগুলোর জন্যে—যাদের হয়তো আমাদের কালের অন্যায়-অবিচারে ভরা এ-জগতের এই সব ছোটখাটো সামান্য সুখগুলি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু তবু, বিশ্বসংসার বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, ন্যায়-সুবিচার অধিষ্ঠিত হোক!

যে-উদ্ধত কণ্ঠস্বর দুটি আমাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, তার দ্বিতীয়টি আরো বেশি বাধ্যতামূলক, ঢের বেশি নারকীয়—কারণ, এটা ঘৃণার কণ্ঠস্বর—যে ঘৃণা আমি বোধ করি এমন একটা পার্টির বিরুদ্ধে যে-পার্টির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হল কমিউনিজম এবং তারই ফলে যে-পার্টি আমাদের অভিন্ন শত্রু। আমি বলছি, জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের তথাকথিত প্রতিনিধিদের পার্টির কথা, সেই সব নকল দেশাভিমানীদের কথা—যাদের নিজেদের দেশের প্রতি ভালোবাসা অ-জার্মানদের প্রতি আর প্রতিবেশী জাতিসমূহের প্রতি এক নিতান্ত নির্বোধ অনীহা ছাড়া আর কিছু নয় এবং বিশেষ করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যারা প্রতিদিন তাদের ঘৃণা বমন করছে। হাঁ, আমার সারা জীবন ধরে আমি ১৮৫০-এর ওইসব উগ্র টিউটন জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের, কিংবা ধ্বংসাবশিষ্টদের, মনে প্রাণে ঘৃণা করে এসেছি এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি—যারা এখন শুধু তাদের অতি-টিউটনিক ভাঁড়ের ছেঁড়া পোশাকটাকে সেলাই-টেলাই করে নিয়ে একটা নূতন রূপ দিয়েছে আর তাদের কানগুলিকে লম্বায় আরেকটু ছোট করে নিয়েছে। এদের মুমূর্ষু হাতগুলো থেকে তলোয়ারগুলো খসে পড়ছে দেখে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পাচ্ছি যে, এই পার্টিটাই কমিউনিজমের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, কমিউনিজম এর উপরে মরণ আঘাত হানবে, এবং

সেটা নিশ্চয়ই পদাঘাত হবে না। না, দৈত্যটা স্রেফ একে পোকামাকড়ের মতো পদদলিত করে মারবে! জাতীয়তাবাদের এই সব প্রবক্তাদের প্রতি আমার ঘৃণা থেকেই আমি এই কমিউনিস্টগুলোকে প্রায় ভালোবেসে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছে। অন্তত এরা তাদের মতো ভণ্ড নয় যারা অনবরত ধর্ম আর খ্রীস্টধর্মের কথা বলে বেড়ায়। একথা ঠিক যে কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না (কোনো মানুষই নিখুঁত নয়)। এমন কি, কমিউনিস্টরা নাস্তিক (এটা নিশ্চয়ই মস্ত পাপ)। কিন্তু তারা সবচেয়ে ঐকান্তিক এক বিশ্ব নাগরিকতা, সর্ব জাতির মধ্যে সর্বজনীন প্রেম আর এই ভূগোলকের স্বাধীন নাগরিক সমস্ত মানুষের সমানাধিকার সহ ভ্রাতৃত্বকে তাদের প্রধান মত হিসেবে ঘোষণা করে। তাদের এই নীতি আর বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এ ঘোষিত নীতি একই; সুতরাং, আদর্শ আর সত্য, এই দুই দিক থেকেই আমাদের তথাকথিত জার্মানিক দেশপ্রেমিকদের চেয়ে—শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এক জাতীয়তাবাদের ওই সব সংকীর্ণমনা প্রবক্তাদের চেয়ে—কমিউনিস্টরা ঢের বেশি খ্রীস্টান।

কিন্তু আমি বড়ো বেশি জোর গলায় বলছি; অন্তত বিচক্ষণতা বশে আর ঠিক এই মুহূর্তে আমার গলার দুর্বলতার কথা মনে রেখে, যতোটা গলা চড়ানো উচিত তার চেয়ে। সুতরাং, উপসংহারে আমি আর দু-একটি কথা মাত্র যোগ করব। আমার মনে হয়, যে অবস্থায় আমি 'লুটেশিয়া' পত্রাবলী লিখেছিলাম, সেটা যে কতোখানি প্রতিকূল অবস্থা ছিল, তা আমি স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছি। অবস্থানজনিত বাধা-অসুবিধাগুলি ছাড়াও, সময়ের বাধাও আমাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। যে-কালে আমি এই চিঠিগুলি লিখেছি সেই সমকালীন বাধা অসুবিধাগুলির কথা বলতে গেলে, যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই অবস্থাটা চোখের সামনে দেখতে পাবেন। তিনি শুধু এই চিঠিগুলির তারিখগুলির দিকে নজর করলেই স্মরণ করতে পারবেন যে সেই সময়ে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী, অথবা তথাকথিত দেশপ্রেমিক পার্টিগুলির খুব একটা আধিপত্য চলছিল। 'জুলাই বিপ্লব' তাদের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পিছন দিকে কোনো-এক জায়গায় ঠেলে সরিয়ে দিলেও, ১৮৪০ সালে ফরাসী সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি যে একটা মারমুখো হৈ-হল্লা সৃষ্টি করেছিল, সেটাই এইসব ফরাসীবিদ্বেষীদের নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো সুযোগ দিয়েছে। সেই সময়ে এরা গাইছিল 'মুক্ত রাইন'-এর গান। 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব'-এর সময়ে আরো বিচক্ষণ কিছু কণ্ঠস্বর এই উচ্চকিত আওয়াজগুলিকে চাপা দিয়ে

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সাহিত্য

এইচ. ও. লেমান

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রথম কয়েক বছরের সাহিত্য

হিটলার জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের জয়লাভ ছিল ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত—জার্মানির জাতীয় বিকাশের রূপান্তরণের জন্যে, সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবন শিক্ষা শিল্প ও সাহিত্যের গণতান্ত্রিক পরিবর্ধনের জন্যে।

ফ্যাশিস্ট মতাদর্শ ও সমরবাদী ঐতিহ্যকে পরাভূত করার প্রয়োজন ছিল যাতে সকল শ্রেণীর জন্য এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে, এমন এক সাহিত্য যা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মহান মূল্যবোধগুলিকে সমন্বিত ও বিকশিত করে।

তার ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল জার্মানির পূর্বাংশে, সেটি ছিল সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকা।

আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী একচেটিয়াপতিদের ও বৃহৎ জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করেছে, গণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কার কার্যকর করেছে, জাতীয়কৃত অর্থনীতি ও ফ্যাশিস্টবিরোধী-গণতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমী দখলদারী শক্তির নীতি ছিল ক্রমান্বয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অবদমন ও সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এটি ঘটেছে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এস পি ডি) কমিউনিস্টবিরোধী নীতির ফলে। তারা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য বানচাল করেছে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের নীতি প্রবর্তন করেছে এবং তার ফলে সেই ১৯৪৮ সালেই একচেটিয়াপতিরাও ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জার্মানির পূর্বতন দখলীকৃত এলাকাগুলির সাহিত্য সম্পর্কে একথা বলা চলে যে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেই এই সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে।

লেখক ও জনগণের মধ্যে মৌল নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একমাত্র সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকাতেই। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক লেখক নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন ও নতুন ফ্যাশিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই গণতান্ত্রিক

জার্মান সংস্কৃতি লীগে যোগ দিয়েছিলেন, পত্রপত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন, প্রকাশভবনগুলিতে কাজ করেছিলেন, জার্মানির গণতান্ত্রিক নবজীবনলাভে ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম জার্মানির মুদ্রা-সংস্কারের ফলে পূর্বের ফ্যাশিস্টবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বই পশ্চিমে বিক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমাজতন্ত্রবিরোধী ফ্রণ্টে শামিল হয় পশ্চিম জার্মানি এবং এই ফ্রণ্টের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকায় সোভিয়েত সামরিক প্রশাসন এবং পরবর্তী কালে নব-প্রতিষ্ঠিত জার্মান প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ফ্যাশিস্টবিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। প্রগতিশীল জার্মান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রচনাবলী, বিশ্বজনীন সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ক্লাসিক লেখকদের রচনাবলী ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছিল নির্বাসিত লেখকদের ফ্যাশিস্টবিরোধী সাহিত্য (যথা, বেষের, ব্রেখট, জেগার্স, টমাস ও হাইনরিখ মান, ফয়েখ্‌ট্‌-ভাঙ্গের) এবং সোভিয়েত লেখকদের বই (যথা, গর্কি, মায়াকোভস্কি, শলোকভ, অস্ত্রোভস্কি)। এই সমস্ত বই দেশের সকল মানুষের ফ্যাশিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক শিক্ষার কাজে সহায়ক হয়েছিল এবং বিশেষ করে তরুণ কবি ও লেখকদের কাছে মতাদর্শ ও নন্দনতত্ত্বের বহু সমস্যা পরিষ্কার করে তুলেছিল।

এ-কারণেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে নৈরাশ্যের প্রকাশ ঘটে নি, উদ্দেশ্যহীন ফ্যাশিবাদবিরোধিতারও নয়। গোড়া থেকেই আমাদের সাহিত্য আলোচনা তুলেছিল আমাদের জাতীয় সাহিত্য নিয়ে, পথ দেখিয়েছিল নতুন সমাজের।

লেখকরা তাঁদের রচনায় যুদ্ধোত্তরকালের জার্মানির দুর্দশাও ফুটিয়ে তুলে-ছিলেন, কিন্তু বুর্জোয়া লেখকদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এই যে তাঁরা সমস্যা-গুলিকে রূপ দিয়েছিলেন জার্মানির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে, নতুন গণ-তান্ত্রিক জার্মানির কর্তব্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এই সাহিত্যে এসেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের কথা, এবং সেই সমস্ত দেশপ্রেমিকের কথা যাঁরা জনগণের শত্রুদের পরাভূত ও পরাজিত করতে সহায়তা করেছিলেন।

ইওহানেস আর বেষের সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসেছিলেন ১৯৪৫ সালে, তারপরে তিনি যে সব কবিতা প্রবন্ধ ও নাটক লিখেছিলেন তা ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি দেখেছিলেন মাতৃভূমির দুর্দশা ও ধ্বংস, কিন্তু প্রশ্ন তুলেছিলেন : এটা কেমন করে ঘটতে পারল ? এটা কি ভবিতব্য ছিল, নাকি

আমাদের ব্যর্থতা? সন্ত্রাস ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে কেন আমরা প্রতিরোধ করি নি? কিন্তু বেষের-এর ছিল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা, যখন অন্যরা ছিল হতাশাগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ।

তিনি বলেছিলেন, অতীতকে বিদায় জানাতে হবে, তা হলেই ব্যাপারটা হয়ে যায় অন্যরকম।

বিদায় জানাতে হবে
মানুষকে ও সময়কে,
অনেক কিছুকে ও এমন অনেককে
যারা আমাদের নিকট,
যারা আমাদের প্রিয়,
যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কষ্টের।
তবে সব সময়েই নয়।
এমন অনেক বিদায় আছে
যা আমাদের কাছে আনন্দের,
যখন আমরা বলি 'আঃ, বাঁচা গেল',
বলি না 'আবার এসো'।
নিজেদের কাছ থেকে
আমরা বিদায় নিই
দীর্ঘ কষ্টকর
বিদায়ের মধ্যে দিয়ে,
কেননা যখন বিচ্ছেদ ঘটে
অতীতের সঙ্গে
তখন বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়
যা আমাদের মধ্যে অতীত
তার সঙ্গেও।
কিন্তু এমন অনেক কিছু থেকে যায়
যা আমরা ভাবতাম
চিরকালের জন্যে আমরা হারিয়েছি…
বিদায়।
আর তখনই ব্যাপারটা হয়ে যায় অন্যরকম!

১৯৪৬ সালে কবি লুইস ফ্যুর্নবের্ক নির্বাসন থেকে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন স্টেফান হের্মলিনও, যিনি ছিলেন ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের সৈনিক। ফিরে এলেন কুবা, ইংলণ্ড থেকে। তাঁরা তাঁদের কবিতায় জয়গান করলেন লালফৌজের বিজয়ের, ফ্যাশিস্টবিরোধীদের আত্মত্যাগের। সমকালীন সাহিত্যে নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত সমাজতন্ত্রীদেরই প্রাধান্য ছিল। নির্বাসনে থাকাকালীন তাঁদের রচনায় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নবীনতম জার্মান ইতিহাস। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন, নাৎসীবাদের পরাজয় ছিল অনিবার্য ও নিয়মসঙ্গত।

আনা জেগার্স-এর অবদান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর উপন্যাস 'সপ্তম ক্রস'-এ দেখিয়েছিলেন বন্দিশিবিরে বন্দীদের জীবন ও সাহসী সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক সংহতিতে অপরাজেয় মানবতা ও ন্যায়।

আনা জেগার্স ফিরে এসেছিলেন ১৯৪৭ সালে, মেকসিকো থেকে। ১৯৪৯ সালে তাঁর সে-সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'মৃতরা তরুণ থাকে' শেষ করেছিলেন। এই উপন্যাসের পটভূমি বিরাট—১৯১৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানির শ্রেণী-যুদ্ধ, যাতে প্রতিফলিত হয়েছিল জার্মান জনগণের ঘটনাপূর্ণ অতীত। উপন্যাস শুরু হচ্ছে স্পার্টাকাস-পন্থী একজন তরুণ সৈনিকের হত্যাকাণ্ড দিয়ে। উপন্যাসের শেষে তার ছেলেকে খুন করা হচ্ছে, কেননা সে তার বাবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়। উপন্যাসের নামে রয়েছে আশা, যার নির্দেশ ভবিষ্যতের দিকে : ফ্যাশিস্টবিরোধীরা তরুণ থেকে যায়, তারা এগিয়ে চলে ভবিষ্যৎ পুরুষের মধ্যে দিয়ে, শ্রেয়তর জার্মানির জন্যে তাদের লড়াই যেখানে সম্পূর্ণ হয়।

ফিরে এসেছিলেন ভিলি ব্রেডেলও। নির্বাসনে থাকার সময়েই তিনি শুরু করেছিলেন তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর উপন্যাস : পিতা, পুত্র, পৌত্র। উপন্যাসের কাহিনী একটি জার্মান শ্রমিক পরিবারকে নিয়ে—নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে, ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সময়ে, নতুন জার্মানি শুরু হবার সময়ে।

বিখ্যাত নাট্যকার ফ্রীডরিখ ভোল্‌ফ্‌ অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন। একটি হচ্ছে 'প্রফেসর মামলক', যাতে বলা হয়েছে নাৎসীদের ক্ষমতায় আসার সময়ে একজন ইহুদী ডাক্তারের জীবন ও পরিণতি। আরেকটি হচ্ছে 'কাটারোর নাবিকরা', যাতে ১৯১৮ সালে নাবিকদের ব্যর্থ বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে।

বিশ শতকের লেখকদের মধ্যে ব্রেখট এমন একজন যাঁর রচনা বিশ্বের সকল দেশে প্রায়শই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি অবিসম্বাদিত। ১৯৪৮ সালে তিনি বার্লিনে এসেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী হেলেনে ভাইগেল একসঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন বিখ্যাত বের্লিনার অঁসেম্বল। সকল দেশের নাটকের মানুষের কাছে এই নাট্যগোষ্ঠী হয়ে উঠেছে সমকালীন শিল্পের পীঠস্থান।

দ্বন্দ্ববাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্রেখট তাঁর শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বকে এমনভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন যাকে চেনা যায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যায় ও পরিবর্তিত করা যায়। তিনি লিখেছিলেন :

এই সময়ে,
বিপুল পরিবর্তন ঘটে চলার
এই সময়ে,
মানবিক সম্পর্কগুলোর সামনে
বহু প্রকারের পরীক্ষা।
থিয়েটারকে নিতে হবে
গোষ্ঠীজীবনের বৈপ্লবিক পুনঃরূপায়ণে
দায়িত্বপূর্ণ অংশ।
নতুন দর্শকদের কাছে
তার দায় ও দায়িত্ব—
অপ্রচলিত মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার
নতুন ধ্যান-ধারণা ও সমাজতান্ত্রিক আবেগ
সঞ্চারিত করার।
একাজ হওয়া চাই ভালোভাবে,
মানুষকে আনন্দ দিয়ে।
সেজন্যে চাই
নতুন কর্তব্যের উপযোগী করে
সকল সম্বলকে নতুন করে দেখা আর
নিখুঁত করে তোলা।

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে, নির্বাসনের শেষে জি. ডি. আরের রাজধানীতে যখন কাজ করছিলেন, তিনি লিখলেন 'কমিউনের দিনগুলি'।

কমিউনার্ডদের বিয়োগান্তক কাহিনীকে তিনি দেখালেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ও বিভক্ত জার্মানির পূর্বাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর চোখে কমিউন ছিল "অসফল ঐতিহাসিক পরীক্ষাকার্য নয়, বরং প্রথম বড়ো রকমের শক্তি পরীক্ষা; আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অতি-জরুরি প্রাথমিক লড়াই; জনগণের রাষ্ট্রের জন্যে লড়াই, যে-রাষ্ট্র প্রকৃতই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের পরিপোষক।" বর্তমান কালের প্রতি এই নাটকের যে সরাসরি চ্যালেঞ্জ, যা তিনি প্রকাশ করেছেন ডেপুটি লাঁগেভিনের এই উক্তিতে—"নিজেদের কাছ থেকে যতোটুকু আশা করো, তার চেয়ে বেশি কমিউনের কাছ থেকে আশা কোরো না"—তা উপলব্ধি করার এই হচ্ছে একমাত্র পথ।

এমনিভাবে ব্রেখট কমিউনকে দেখালেন প্যারিসের সাহসী প্রোলেতারিয়েতের মহান একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে। শাসকশ্রেণীরা জনগণকে ঠেলে দিয়েছিল ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের মধ্যে আর সেই যুদ্ধের মধ্যে থেকেই প্যারিসের শ্রমিকরা হাত মিলিয়েছিল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে এবং ফরাসী শোষণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছিল, জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল আর গঠন করেছিল ইতিহাসের প্রথম প্রকৃত জনগণের সরকার।

ব্রেখট এই নাটকে উপস্থিত করেছেন মুক্তির জন্যে সকল জাতীয় ও সামাজিক সংগ্রামের মূল বিষয়টি: কি-ভাবে ক্ষমতা লাভ করতে হয় এবং এই ক্ষমতা লাভ করার পরে কি-ভাবে ক্ষমতা লাভ বজায় রাখতে হয় ও জোরদার করতে হয়।

তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, কমিউন ছিল বিশ্বে প্রথম স্বাধীনভাবে নির্বাচিত লোকায়ত সরকার, যে-সরকার ১৮৭১ সালের ৭০টি দিনের মধ্যে জনগণের জন্যে যা করতে পেরেছিল পূর্বেকার অন্য কোনো সরকার তা পারে নি। কমিউন শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল ছোটখাটো ভুল করার জন্যে নয়, কতকগুলো বৃহৎ পদক্ষেপে অবহেলার জন্যে।

ব্রেখট বললেন, শুধু কতকগুলো ধারণা বা বাস্তবতার শিক্ষামূলক চিত্র উপস্থিত করাটাই নাটকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নাটককে উদ্দীপিত করতে হবে ধারণার আনন্দ, সংগঠিত করতে হবে বাস্তবতাকে পরিবর্তনের উল্লাস। শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস কি-ভাবে মুক্ত হচ্ছে, শুধু এইটুকু দেখা নয়; শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসকে মুক্ত করার ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে পারা-ও। নাটককে শেখাতে হবে উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকের ইচ্ছা ও উল্লাস, মুক্তিযোদ্ধার বিজয়ের অনুভূতি।

২. জি. ডি. আর. প্রতিষ্ঠার পরে সাহিত্যের বিকাশ

১৯৪৯ সালের ৭ই অকটোবর তারিখে যখন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জার্মানির এই অংশের লেখক ও কবিরা এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দ্বারা সুনিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত হন। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের পরে বহু লেখক—তাঁদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর তরুণ লেখকরাও—তাঁদের লেখায় গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন জনপ্রিয় ও বাস্তববাদী শিল্প। ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই নতুন মানবতাবাদী সম্পর্ক, সামাজিক পরিবর্তন থেকে যা উদ্ভূত। উপস্থিত করেছিলেন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের নতুন নায়ক হিসেবে মুক্ত শ্রমিককে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সক্রিয় স্রষ্টাকে। তবে এই প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে ঘটতে পেরেছিল তা নয়, কেননা বহু লেখকই জন্ম ও শিক্ষার সূত্রে গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিলেন পুরনো বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মধ্যে, সমাজতন্ত্র তাঁদের কাছে ছিল নতুন এক অভিজ্ঞতা। কাজেই তাঁদের কারও কারও পক্ষে সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করে নিতে, আদৌ সমাজতন্ত্রকেই স্বীকার করে নিতে সময়ের প্রয়োজন ছিল।

সেই সময়ে বিশেষ করে লিরিক কবিতায় নতুন প্রাণস্পন্দন এসেছিল। লেখা হয়েছিল প্রচুর জনপ্রিয় সঙ্গীত, গাথা, গীতি ইত্যাদি। তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল মুক্ত মানুষের জীবন ও অনুভূতি, সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণকার্য, শ্রমিক ও কৃষকের নতুন রাষ্ট্রের সাফল্য। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছিল শান্তির জন্যে কাজ ও লড়াই করার ওপরে। ইওহানেস আর বেষের সৃষ্টি করলেন জি. ডি. আরের নতুন জাতীয় সঙ্গীত যাতে প্রকাশ পেল সমাজতান্ত্রিক জার্মানি সম্পর্কে আশা ও গর্ব।

> শ্মশানস্তূপ থেকে উঠেছি সবে,
> ভবিষ্যতে তাকিয়ে দাঁড়াই ফের
> আমরা খাঁটি সেবার গৌরবে
> হে জর্মনি! জননী আমাদের!
> শতদুঃখ অতীতে হবে লীন
> ঐক্য যেই অর্জি মৈত্রীতে,
> গ'ড়ে তুলতে হবে আগামী দিন,
> যখন আহা আমাদের এ মাতৃভূমি ব্যেপে
> সূর্যালোক হাসবে দীপ্তিতে।

প্রেরণা পাক আনন্দে শান্তিতে
হে জর্মনি, জননী আমাদের।
শান্তি চায় সবাই পৃথিবীতে।
হাত মেলাও সর্বজনে-জনে
ভ্রাতৃত্বে অটুট বাহুবলে
জণগণের শক্তি করি নত
শান্তি পথ রাখুক জ্বলজ্বলে
কোনো মাতারই অশ্রু আরবার
যেন না ঝরে পুত্র-শোকাহত।

চালাই চাষ, গড়ছি গোটা জাতি,
শিখি ও খাটি অভূত উদ্যমে,
তবে তো পাবে নবীন যত সাথী
স্বাধীনভাবে আস্থা নিজশ্রমে।
দেখ, দেশের তরুণ! একপ্রাণ
কাজ ক'রে যাই সারা দেশের হিতে,
তোমরাই জার্মানির নবগান!
যখন আহা আমাদের এ মাতৃভূমি ব্যেপে
সূর্যালোক হাসবে দীপ্তিতে

[অনুবাদঃ বিষ্ণু দে]

আমাদের কালের মানুষের মুখ ও চরিত্রকে রূপ দেবেন যে আধুনিক সমাজতন্ত্রী লেখক তার একটি ধারণা খুঁজে পাবার জন্যে বেষের কয়েক বছর ধরেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর তত্ত্বমূলক রচনা 'কবিতার সপক্ষে' (১৯৫২), 'কাব্যের স্বীকারোক্তি' (১৯৫৪) ও 'কাব্যের নীতি' (১৯৫৭) এবং তাঁর শেষ সংকলন-গ্রন্থ 'শতাব্দীর মধ্যভাগে পদক্ষেপ' হয়ে উঠেছিল আমাদের কবিদের ও লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে তরুণদের কাছে শিক্ষা-সহায়ক ও মডেল। মহাশূন্যের বিজয়ী অভিযাত্রীর প্রশস্তি রচনা করেছিলেন বেষের কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের রূপান্তরণ।

রূপক ও অলঙ্কারে সমৃদ্ধ ভাষায় কবিতা লিখে লুইস ফ্যুর্নবের্ক ফুটিয়ে তুললেন নতুন মানবগোষ্ঠীকে। মহান অকটোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকীর উদ্দেশে

নিবেদিত তাঁর কবিতা 'লৌকিক স্তবগান' সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর বন্ধু কুবা।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গল্পরচনা হচ্ছে 'প্রাগ-এ মোৎসার্ট' ও 'ভাইমার-এ মোলাকাৎ'। প্রথম রচনায় সঙ্গীত-রচয়িতা মোৎসার্ট বয়স-হওয়া ক্যাসানোভার সঙ্গে কথা বলছেন। দ্বিতীয় রচনায় গ্যোটে এমন এক রূপে উপস্থিত হয়েছেন যা সাহিত্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

গেওর্গ মাউরার অনেকগুলো সনেট লিখেছিলেন। তাঁর সংকলন-গ্রন্থ '৪২টি সনেট' (১৯৫৩)-এ এমন একজন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মর্মস্পর্শী কথা বলা হয়েছে যে তার পুরনো জগতের মতাদর্শকে মানতে পারছে না এবং অবশেষে শ্রমিকশ্রেণীর নতুন মানবতাবাদের সন্ধান পাচ্ছে।

স্টেফান হের্মলিন লিখলেন 'মান্‌স্‌ফেল্‌ড ওরেটরিয়াম', যাতে উপস্থিত করলেন মান্‌স্‌ফেল্‌ড তামা-খনি শ্রমিকদের ৭০০ বছরের ইতিহাস। এই রচনায় অতীত ও বর্তমান সময় হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দর্পণ।

তরুণ কবিরাও প্রকাশ করলেন তাঁদের প্রথম রচনা। তাঁদের কয়েকজন হচ্ছেন গ্যুন্টের কুনার্ট, গ্যুন্টের ডাইকে, হাইন্‌ৎস কালাউ, পাউল ভীন্‌স।

চিরায়ত সাহিত্যের লেখকদের কাছে বিশের ও ত্রিশের দশকের সোভিয়েত উপন্যাস ছিল আদর্শস্বরূপ (যেমন, এফ. ডবলু. গ্লাদকভের 'সিমেণ্ট')

ভূতপূর্ব রাজমিস্ত্রী ও স্পেনের গৃহযুদ্ধের সৈনিক এডুয়ার্ড ক্লাউডিয়ুস প্রকাশ করলেন তাঁর উপন্যাস 'আমাদের সঙ্গের মানুষরা'। উপন্যাসের নায়ক একজন রাজমিস্ত্রী। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও কর্মোদ্যোগ নিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে হাজার হাজার মার্ক বাঁচালেন। এই উপন্যাস থেকেই শুরু, তারপরে আরো অনেকগুলো প্রকাশিত হল। অধিকাংশই লিখলেন শ্রমিক-শ্রেণীর লেখকরা। সমাজতান্ত্রিক জীবনের শ্রমিকরাই এসব উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাদের মধ্যে পাওয়া গেল নতুন নীতিবোধ, শ্রমের প্রতি নতুন মনোভাব (দৃষ্টান্ত, হান্‌স মার্খভিৎসা-র 'পিণ্ড লোহা')

কৃষির ক্ষেত্রে অটো গোট্‌শে-র 'গভীর হলকর্ষণ' হয়ে উঠল অন্যদের কাছে আদর্শস্বরূপ। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে গ্রামের কৃষকরা কি-ভাবে পূর্বতন বৃহৎ জমিদারের জমি বাঁটোয়ারা করে নেয়।

এমনিভাবে কয়েকটি উপন্যাস লেখা হল যার বিষয় ছিল গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিবর্তন—ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা

পর্যন্ত। তবে এই বিষয় নিয়ে সেরা উপন্যাস লিখেছিলেন বোনা ফোয়েল্‌কনার (কারভেনক্রথ-এর মানুষ, কারভেনক্রথ-এর কৃষক) ও এরভিন স্ট্রিটমাটের।

রুটি-প্রস্তুতকারকের ছেলে এরভিন স্ট্রিটমাটের আমাদের দেশের একজন প্রধানতম লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাখাল'-এ পাওয়া যায় গ্রামের একটি ছেলের ক্রমবিকাশ। 'টিস্কো' উপন্যাসের নায়কও একজন বালক। তার ঠাকুর্দা সনাতন প্রথা আঁকড়ে থাকতে চায়, তার বাবা সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিশিবির থেকে ঘরে ফিরেছে—এ দুয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে বালকটি বড়ো হয়। মানুষের সামাজিক পরিবর্তনগুলো স্ট্রিটমাটের অত্যন্ত মরমীভাবে উপস্থিত করেন। তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পাওয়া যায় প্রচুর চরিত্র ও গ্রামীন রস। সময়ের মূল বিষয়টি তিনি ধরতে পারেন—জমিতে কী ঘটছে, যারা নতুন পথ গড়ে তুলছে তাদের মনের মধ্যে কী ঘটছে, তাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ভাবনাচিন্তা প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতায়। যুদ্ধ ও যুদ্ধবন্দিশিবির থেকে ফিরে আসা তরুণ লেখকরা যুদ্ধের বিষয় ও তার বিশেষ সমস্যা নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন পরবর্তী কালে,যখন নতুন সমাজ গড়ে উঠছিল, যখন মানুষের মনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো দেখে তাঁরা যুদ্ধফ্রন্টের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে পারছিলেন।

স্টেফান হাইম যুদ্ধের সময়ে ছিলেন মার্কিন বাহিনীর অফিসার। তিনি লিখলেন 'ক্রুসেডার্স'। তিনি দেখালেন ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে আমেরিকা কি ভাবে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধকে তিনি দেখালেন অন্যদিক থেকে, জার্মান সৈনিকদের অভিজ্ঞতা সেখানে ছিল না।

ফ্রান্‌ৎস ফ্যুমান ছোট একটি উপন্যাস লিখলেন—'কমরেড'। এই উপন্যাসটির তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ছিল। তিনজন সৈনিক ভুল করে তাদের মেজরের কন্যাকে খুন করে বসে। কিন্তু তাদের কোনো শাস্তি হয় না। অফিসাররা এই খুনের ঘটনাকে ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে, কেননা আক্রমণ শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল পরদিন সকালেই। ফ্যুমান এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সৈন্যবাহিনীর অমানবিক চরিত্রও।

ঔপন্যাসিক ভের্নের স্টাইনবের্ক জি. ডি. আরে এসেছিলেন ফেডারেল রিপাবলিক থেকে। তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর উপন্যাস 'ঘড়ি যখন বন্ধ হয়ে

বাঘ'। এই উপন্যাসে রয়েছে ব্রেমলাউ দুর্গের শেষ কয়েকটি দিনের বিবরণ। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'গ্ল্যাডিয়েটররা আসছে'-র ঘটনাস্থল পশ্চিম জার্মানি। সেখানে দেখানো হয়েছে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে কি ভাবে পিছু হটানো হচ্ছে এবং আমেরিকানদের সাহায্যে পুরনো দিনের পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থা পুনঃস্থাপিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ভাবনাচিন্তা আরও তীব্র ও লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত ছিল সেই সমস্ত তরুণ লেখকদের লেখায় যাঁরা নিজেরা জেনেছিলেন ফ্যাশিস্ট সৈন্যবাহিনীর ভাঙন ও সেইসঙ্গে নিজেদের ধ্যানধারণারও সম্পূর্ণ ভাঙন। দৃষ্টান্ত ঃ

হারবার্ট অটো—'মিথ্যা'।

বোডো উজে—'দেশপ্রেমিক'।

ফ্যাশিস্ট কাল বলতে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বোঝায় না, তার মধ্যে পড়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধও, ফ্যাশিস্টবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনও। বর্তমান কালে আমাদের জাতীয় সমস্যাকে বুঝতে হলে এই সমস্ত সমস্যা নিয়েও লেখার দরকার ছিল।

এরিখ ভাইনার্ট—'ক্যামারাডাস'।

লুডভিক রেন—'স্পেনের যুদ্ধ'।

উভয় লেখকের সঙ্গেই স্পেনের দেশপ্রেমিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রেন ছিল উচ্চপদস্থ অফিসার।

অটো গোট্শে—'মার্চের ঝড়', 'রাত্রি ও প্রভাতের মধ্যে', 'ক্রিভই রক্-এর পতাকা'।

এই তিনটি উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন ১৯১৮ থেকে তৃতীয় রাইখের পতন পর্যন্ত ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে মান্স্ফেল্ট শ্রমিকদের ও ফ্যাশিস্টবিরোধী একটি দলের সংগ্রাম।

আমাদের জাতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—ব্রুনো আপিৎস-এর 'নেকেড অ্যামঙ্গ উল্ফ্স'। সারা বিশ্বে পরিচিত এই উপন্যাসটি প্রায় ৩০টি ভাষায় অনূদিত ও কুড়ি লক্ষেরও অধিক কপি প্রচারিত হয়েছে।

শ্রমিকের সন্তান আপিৎস নাৎসীদের দ্বারা কারারুদ্ধ ও দাস-শ্রমিক হিসেবে বুখেন্ভাল্ট বন্দিশিবিরে প্রেরিত হন। বুখেন্ভাল্ট বন্দিশিবির যতোদিন ছিল ততোদিন তিনি সেখানে ছিলেন, বেরিয়ে আসেন শেষ দলের সঙ্গে।

কাহিনী একদল বন্দীকে নিয়ে। শিবিরবাসী জনকয়েক অসমসাহসী লোক এস-এস্-দের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে একটি প্রতিরোধ-দল গড়ে তুলেছে। বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার শক্তি তারা পায় আন্তর্জাতিক সংহতি থেকে। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে, সমস্ত রকমের সন্ত্রাসের মধ্যে, অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটে ; একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় বাচ্চা একটি ছেলে বন্দীদের নজরে পড়ে যায়। ছেলেটির মা-বাপ খুন হয়েছে, ছেলেটিরও যাতে একই গতি না হয় সেজন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়েছে একজন পোলিশ বন্দী। ছেলেটিকে এখন কিছুতেই খুনেদের হাতে পড়তে দেওয়া চলে না, তাছাড়া বন্দীরা সবাই জানে প্রতিটি ঘণ্টা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তির সময়ও এগিয়ে আসছে। ছেলেটিকে বারেবারেই নতুন জায়গায় লুকোতে হয়, বারেবারেই এস-এস প্রহরীদের চোখে ধুলো দিতে হয়। বন্দীরা জানে, ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখছে বলে তারা বিপদে পড়তে পারে কিন্তু সাহসের সঙ্গে তারা ভয় দূর করে। ছেলেটির অস্তিত্বের কথা যারা জানে তাদেরই ভয় যে ছেলেটির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়বে যে অবৈধ একটি দল বিদ্রোহের প্রস্তুতি করছে। এমনিভাবে ছেলেটি হয়ে ওঠে মুক্তির জন্যে আবেগপূর্ণ ইচ্ছার প্রতীক। ছেলেটির ভাগ্যের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত হয়ে যায়।

লেখকের নিজের জীবনও ছিল এই কাহিনীর অংশীভূত, এমন এক কাহিনী যা বন্দিশিবিরের সমস্ত কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে শিহরণসৃষ্টিকারী। তবুও এই কাহিনী শুধু বর্বরতা ও সন্ত্রাসের নয়, মানবজাতি সাহসের প্রতি স্তবগানও। ব্রুনো আপিৎস লিখেছেন, "এই বইটি দিয়ে আমি সকল জাতির মৃত সহ-যোদ্ধাদের উদ্দেশে প্রণাম জানাই, বুখেনভাল্‌ট বন্দিশিবিরে বহু আত্মদানের মধ্যে যাঁদের আমরা রেখে এসেছি। তাঁদের সম্মানে এই বইয়ের কয়েকটি চরিত্রের নাম আমি দিয়েছি তাঁদের নামে।"

বুখেনভাল্‌ট বন্দিশিবিরের সেই শিশুটি এখন বড়ো হয়েছে, কয়েক বছর আগে যখন সে জি. ডি. আরে বেড়াতে এসেছিল তখন তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকজন অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিকের নাম করা দরকার। তিনি হচ্ছেন আর্নোল্ট ৎসাইক। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে অন্য আরো অনেকের মতো তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। নাৎসীরা তাঁর নাগরিকত্ব

কেড়ে নেয়। তের বছর পরে প্যালেস্টিনা থেকে তিনি ফিরে এলেন ও বার্লিনে অভ্যর্থনা লাভ করলেন। সাতটি উন্যাসে তিনি লিখেছেন 'সাদা মানুষদের মহান যুদ্ধ' উপন্যাস-মালা। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভাইমার রিপাবলিকের সময়ে জার্মানির জীবন। তাঁর অসাধারণত্ব এই যে তাঁর চরিত্রচিত্রণ সতেজ, তাঁর পর্যবেক্ষণে রয়েছে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, নিরাপত্তা ও শান্তির জন্যে আশায় তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী। উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের জন্যে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যতি প্রতিষ্ঠিত।

আনা জেগার্সের রচনাবলী সে-সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ছোট-গল্পের সংগ্রহ 'মানুষ ও তার নাম'-এ তিনি লিখেছেন জি.ডি. আরের সামাজিক পরিবর্তন ও নতুন মানবিক সম্পর্কের কথা।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর 'সিদ্ধান্ত' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে দুই জগতের মধ্যে—জার্মানির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সীমান্তের দ্বারা বিভক্ত দুই জগত। জীবনের সকল মণ্ডলেই এই সিদ্ধান্তের স্পর্শ, এমনকি ভালোবাসা ও বিবাহের মতো অন্তরঙ্গ মহলেও। প্রধান ঘটনা ঘটছে একটি ইস্পাত কারখানায়, ১৯৪৭-৪৮ সালে। কারখানাটি জাতীয়কৃত। পূর্বতন মালিক থাকেন পশ্চিমে, কারখানার পুনর্নির্মাণ-কার্যকে বানচাল করার জন্যে তিনি নানা কারসাজি চালিয়ে যান।

সে-সময়ে কবি ও লেখকদের বহু উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস ও লিরিক কবিতা। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় নি।

অনেক নাট্যকারই সমসাময়িক নাটক লিখতে ইতস্তত করেছিলেন। মাত্র দুটি নাটক উল্লেখযোগ্য : ভোল্ফ্-এর 'মহিলা মেয়র আনা' ও স্ট্রিটমাটের-এর 'কাৎস্গ্রাবেন'। শেষোক্তটি গ্রামের শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে লেখা প্রথম নাটক।

হেডা ৎসিনার লিখলেন 'দুষ্ট চক্র', গেওর্গি ডিমিট্রফের বিরুদ্ধে রাইখ্স্টাগ বিচারের বিষয় নিয়ে। ১৯৩৩ সালে ফ্যাশিবাদ বিজয়ী হবার কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলির মনোভাব ও চালচলন থেকে বোঝা যায়।*

*এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ 'জি. ডি. আরের নবীনতম সাহিত্যক' আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক

নীড়হারা

সৌরি ঘটক

১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

বাঙলাদেশ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি।

আর এই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য লক্ষাধিক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য কামান-বন্দুক-ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙলাদেশের ওপর।

সারা বাঙলাদেশ জুড়ে শুধু আগুন আর মৃত্যু, কান্না আর হাহাকার।

আক্রমণের চাপে প্রায় এক কোটিরও বেশি বাঙালি ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। যারা আছে তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে পলাতক। এ জেলার লোক ও জেলায়, এখানকার মানুষ ওখানে। সারাটা দেশ যেন এক বিরাট উদ্বাস্তু শিবির।

পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। যেখানে পড়ে আছে শুধু ছাই আর পোড়া কালো মাটির দেওয়াল। গ্রামের মানুষ যাদের ধরতে পেরেছে তাদের পুরুষদের হত্যা করেছে। সে মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে আছে পথে প্রান্তরে। শেয়াল কুকুর আর শকুনে সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মেয়ে যাদের পেয়েছে তাদের ধর্ষণ করে হয় গুলি করে মেরেছে নয়তো ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে ক্যান্টনমেন্টে, মিলিটারি ক্যাম্পে কিংবা পিল বক্সে। সেখানে তারা রূপান্তরিত হয়েছে বারোয়ারি বেশ্যায়।

এই চরম অত্যাচারে দিশেহারা মানুষ যে-যেদিকে পারে পালিয়েছে। সারা বাঙলাদেশের গ্রামগুলো আজ জনশূন্য, পথ পথিক শূন্য, হাটবাজার প্রাণীহীন, শ্মশান। রাস্তাঘাটের সাঁকোগুলো ভাঙা, নদীগুলোর ব্রীজ বিধ্বস্ত, রেল পথে লাইনগুলো ওলটানো। সড়কগুলোর মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বড় বড় গাছের গুঁড়ির ব্যারিকেড। এরই মাঝে সেই পথের বাধা কাটিয়ে কখনও চলছে মিলিটারি কনভয়, কখনও বা পলাতক মানুষের মিছিল, কখনও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দল।

এমনি পরিস্থিতিতে সেদিন দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার এক প্রান্তে গোবিন্দনগর বলে যে একটি গণ্ডগ্রাম আছে সেখানে একটি ঘরের মধ্যে জড়ো হয়েছে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। একটু আগেই তারা ঠাকুরগাঁও সহরের এক প্রান্তে টাঙন নদীর ধারে ছাত্রদের কলেজে পাক সৈন্যদের যে ক্যাম্প হয়েছিল সেটা উড়িয়ে দিয়েছে। পাক সৈন্য সেখানে যারা ছিল প্রায় সবাই মারা গেছে। ক্যাম্পটি ধ্বংস করে তারা উদ্ধার করেছে কটি বন্দিনী বাঙালি মেয়ে। মেয়েকটিকে নিয়ে তারা নদী পার হয়ে এসে উঠেছে এই ঘরে।

ঘরটি ছোট। মাটির মেঝে। বাঁশের ছেঁচাবেড়ার দেওয়াল। ঘরের মধ্যে যে মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছে তারা নানা বয়সী। এদের কারও বয়স ষোলসতের, কারও বা পঞ্চাশ-ষাট। এদের কারও পরনে খাকির ফুল শার্ট, কারও পরনে মালকোচামারা ধুতি।

আজকের রাতটিকে তারা আক্রমণের ক্ষণ হিসাবে বেছে নিয়েছে এই জন্য যে আজ বড় দুর্যোগ। সারা আকাশে চাপ চাপ কালো মেঘ। মাঝে মাঝে সেই মেঘের বুক থেকে কড় কড় করে ভয়াবহ গর্জন ভেসে আসছে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আঁকা বাঁকা তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের ঝিলিক যেন এই বিশ্বজোড়া অন্ধকারের বুকের ওপর বিদ্রূপের নাচ নেচে পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর এর সঙ্গে মুষলধারে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে আর সাঁ সাঁ করে বইছে উদ্দাম ঝড়। তার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে মনে হচ্ছে যেন এক অন্ধ আক্রোশে গোটা সৃষ্টিটাকেই ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে।

এমনি রাতে সেই স্বল্প পরিসর ঘরটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে অগোছালভাবে। তাদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র—রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান, বোমা। আর তাদের মাঝখানে মেঝের ওপর বসে আছে উদ্ধার করে আনা মেয়ে কটি। এদের মধ্যে সব চেয়ে বড়টির বয়স প্রায় চল্লিশ। আর বাকিগুলি চোদ্দ-পনের থেকে কুড়ি-পঁচিশ।

ঘরের মধ্যে দপদপ করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তার আলো আংশিক ভাবে পড়েছে মানুষগুলির গায়ে, কারও মুখে, কারও গায়ে, কারও বুকে। আর তাদের পাশাপাশি ঘরের দেওয়ালে পড়েছে তাদের কালো কালো দীর্ঘ ছায়া। আর এই ছায়াগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আর একদল অশরীরি আত্মা এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশাপাশি। নীরবে তারা প্রতীক্ষা করছে অশুভ কোনো কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায়।

আর কিছু যে একটা ঘটবে পরিবেশই যেন তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে বৃষ্টিপাতের শব্দ, মেঘের গর্জন। দুরন্ত ঝড় যেন বারবার এই বন্ধ ঘরের দরজায়-জানলাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে হা হা করে অট্টহাসি হেসে যাচ্ছে, বিদ্যুতের ঝিলিক যেন মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে মানুষগুলিকে।

ঘরের মধ্যে যে মানুষগুলি রয়েছে তাদের আচরণও কিছুটা অস্বাভাবিক। যে মেয়েগুলি মেঝোয় বসে আছে তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বয়স্কা তার মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল, পরনে শুধু মাত্র একখানা ময়লা শাড়ি, রুক্ষ কঠিন মুখ, চোখে এক অস্বাভাবিক জ্বলন্ত দৃষ্টি। ঠিক তার পাশে অপর যে মেয়েটি বসে রয়েছে তার বয়স মাত্র চোদ্দ-পনের। কিন্তু সে পূর্ণগর্ভা। তার পরনে শুধু মাত্র একটি শায়া আর গায়ে একটি ব্লাউজ। আবছা আলোয় এই স্বল্প বসনা পূর্ণগর্ভা মেয়েটিকে দেখতে কেমন যেন বীভৎস লাগছে। তার পাশে একটি বছর সাতাশের অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে বসে ফিক্ ফিক করে হাসছে। একটি কালো মেয়ে দুটো হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আরও দুটি মেয়ে বসে রয়েছে ওদের পাশে। তাদেরও ছিন্ন বেশ রুক্ষ কেশ। বসে বসে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শুধু তাকাচ্ছে এধার-ওধার।

এমনি পরিবেশে মানুষগুলি যখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তখন অনেক দূর থেকে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। ভয়ঙ্কর সে আওয়াজ। এই জল ঝড়, এই মেঘের ডাক সব কিছুকে ছাপিয়ে মনে হল সে আওয়াজ যেন ঘরখানাকে সুদ্ধ থর-থর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

আওয়াজটি শোনা মাত্র মুক্তিযোদ্ধারা সবাই একসঙ্গে চমকে ওঠে। এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। একটি মালকোঁচা মারা গেঞ্জি গায়ে ষোল-সতের বছরের ছেলে হাতের রাইফেলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে বিড় বিড় করে বলল, 'ব্রিজটা উড়ল নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে বছর ত্রিশেক বয়সের দলের কমাণ্ডার তাকে বাধা দিল, 'না। এ বোধহয় অন্য কোথাও। আমরা যেখানে মাইন পুঁতে রেখে এসেছিলাম—?'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বছর চব্বিশের একজন যুবক হাতের রাইফেলটা কাঁধে তুলে বলল, 'আমি দেখে আসব?'

সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডার হাত বাড়িয়ে তার শার্টের প্রান্তটা টেনে ধরে বলল, 'আঃ প্রফেসার হাই, সমস্যা সৃষ্টি করো না।'

প্রফেসর হাই সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে তার দিকে ঘুরে বলল, 'কিসের সমস্যা

কমাণ্ডার জব্বার ?'

কমাণ্ডার এ কথার কোনো জবাব দেওয়ার আগেই অপর একজন বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা বলে উঠল, 'তুমি নিজেই একটা সমস্যা।'

'আমি'—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রফেসার হাই একবার তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর ওপরে মুখ তুলে কি যেন একটু ভেবে আপন মনে বলল, 'না, আমি কোনো সমস্যা নই। 'সমস্যা সৃষ্টি করে থুয়ে গিয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষরা। আমরা তার মূল্য শোধ করছি।'

প্রফেসর থামা মাত্র পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'কেন খোঁচালি। নে শোন একবার বক্তৃতা।'

প্রফেসর ঘুরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভুল করলে বন্ধু! এ বক্তৃতা নয়, গান। বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন বাঙালির বেদনার গান গাও। তেমনি এ আমাদের বেদনার গান। কিন্তু কমাণ্ডার জব্বার এত কামান বন্দুকের গর্জনে আপনার বিরক্তি আসছে না, আর আমি দুটো কথা বললেই আপনার আপত্তি। বেশ আমি আর কিছু বলব না। আমায় অনুমতি দিন আমি গিয়ে দেখে আসি টাঙন নদীর ব্রিজটা উড়ল কি না।'

কমাণ্ডার জব্বার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না। ব্রিজটা ভেঙে গিয়ে থাকে থাক। ওটা পরে দেখলেও কোনো ক্ষতি হবে না। এখন আশু কাজ হল এই মেয়েদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া। আজ রাতের মধ্যেই সরে যেতে হবে আমাদের। নইলে সকাল হলে খান সেনারা এসে গোটা এলাকা চষে ফেলবে।'

প্রফেসর হাই বলল, 'তবে তাই চলুন। এখানে এভাবে বসে থেকে লাভ কি ?'

কমাণ্ডার জব্বার সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েগুলির দিকে ফিরে বলল, 'উঠুন আপনারা। চলুন যাই।'

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সবচেয়ে বয়স্কা মেয়েটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'না। না। না। আমি তো বলেছি আমি কোথাও যাব না। আমি মরতে চাই। আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।'

কমাণ্ডার জব্বার বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই এক ঘণ্টা ধরে সেই এক কথা বলছেন আপনি। জানেন আপনার এই দেরি করার জন্য আমাদের জীবনও বিপন্ন হচ্ছে।'

মেয়েটিও সমান উদ্ধত ভাবে জবাব দিল, 'আমাকে ছেড়ে দিন না। আপনারা ওদের নিয়ে চলে যান।

'আর তুমি ?'

'এই নদীতে একটা মেয়ে ডুবে মরার মতো যথেষ্ট জল-আছে।'

কমাণ্ডার জব্বার এবার তাকে কড়া গলায় ধমক দিল, 'না তোমায় যেতে হবে। আমরা জোর করে নিয়ে যাব।'

'না আমি যাব না। না-না-না' বলে প্রবল চিৎকার করে উঠে মেয়েটি হঠাৎ মূর্চ্ছিত, হয়ে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে 'ধরো ধরো' বলে অধ্যাপক হাই এসে মেয়েটিকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'জল দাও মুখে। জল।'

দু'তিনজন ছুটে গিয়ে তার মুখে,চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। আর এরই মাঝখানে সেই অর্ধনগ্ন সুন্দরী মেয়েটি সজোরে খিলখিল করে হেসে উঠে জোরে জোরে দুলতে লাগল বসে বসে।

২

একটু শুশ্রূষা করার পরই বয়স্কা মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এল। শ্রান্ত দেহটাকে টেনে আস্তে আস্তে উঠে বসল সে। তারপর গভীর ক্লান্ত দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন আপনারা আমার জন্যে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। আপনারা চলে যান। আমি আর এ মুখ কাউকে দেখাব না। আমার যা হবার হয়েছে। আমাকে এখন শান্তিতে মরতে দিন। আল্লা আপনাদের দোয়া করবেন।'

প্রফেসর হাই মেয়েটির পাশেই বসে ছিল। সে আস্তে আস্তে বলল, 'মরণের মুখ থেকে ফিরে এসে আর কি কেউ মরে মা ? এখন বাঁচতে হবে।'

মেয়েটি মাটির দিকে তাকিয়ে আত্মগত ভাবে বলল, 'মরণের মুখ থেকে ফিরে আসতে আমি চাই নি। আমি মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমায় মরতে দেয় নি। আমি যাওয়ার আগে কজন মেয়ে পরনের শাড়ি গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেই জন্যে ওরা আমাদের শাড়ি পরতে দিত না। দিনরাত উলঙ্গ করে রেখে দিত।'

'আপনার বাড়ি কোথায় মা'—কমাণ্ডার জব্বার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে।

'না। না। সে সব আমি বলব না।—না। না'—মেয়েটি হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। চঞ্চল দৃষ্টিতে এধার-ওধার তাকিয়ে বলল, 'আমাকে মরতে দিন। আমি মরব'—বলেই সহসা অধ্যাপক হাইয়ের দিকে ফিরে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'জানেন আপনার মতো আমার এত বড় ছেলে আছে ?'

'কোথায় সে ?'

'খোদা জানে। জানেন, আমার স্বামী ছিল ডাক্তার। তিন ছেলে দুই মেয়ের মা ছিলাম আমি। আমার বড় মেয়ের বয়স উনিশ, ছোট মেয়ে সতের। সেই সংসারের কর্ত্রী ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার স্বামীর কাজ বেড়ে গেল। রাতে গোপনে কত রকম মানুষ আসত আমাদের ঘরে, কেউ আহত, কেউ আধমরা। আপনাদেরই মতো মুক্তিযোদ্ধা তারা। স্বামী গোপনে তাদের চিকিৎসা করত আর আমরা করতাম শুশ্রূষা। আমার ছেলেরা আগেই বাড়ি ছেড়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে নাম লিখিয়েছিল। এমনিভাবে চলছিল দিন। তারপর হঠাৎ একদিন বিকালবেলা পাক-সেনা বোঝাই একখানা লরি এসে থামল আমাদের বাড়ির সামনে। তাতে ওখানকার দালালও ছিল একজন। সে এসে আমার স্বামীর নাম ধরে ডাকল। আমার স্বামী তখন ছিল না বাড়িতে। সাড়া না পেয়ে ওরা হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমাদের বাড়ি। ঘরে তখন আমি আর আমার দুই মেয়ে। ওরা ঢুকে মারতে মারতে উলঙ্গ করল আমাদের তিনজনকে। আমার মেয়ে দুটি আতঙ্কে চিৎকার করছিল। মুখে বন্দুকের কুঁদো মেরে তাদের থামিয়ে দিল ওরা। তারপর আমাদের তিন মা মেয়েকে পাশাপাশি ফেলে অত্যাচার করে চলল ওরা এক, দুই, তিন—পরপর অনেক সৈন্য। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমার ছোট মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে ওরা সেখানেই গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর আমাকে আর আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তুলল দুটো ট্রাকে।

একটু থেমে দম নিল মেয়েটি. তারপর আস্তে আস্তে বলে চলল, 'জানি না আমার সে মেয়ে এখন কোথায়। আমি শুধু হাতের পর হাত বদল হয়ে ঘুরতে লাগলাম। উলঙ্গ দেহটাকে নিয়ে শুতে হল সৈন্যদের বাঙ্কারে, ক্যানটন-

মেণ্টে, ট্রাকে, জিপে, কত দেশ, কত গ্রাম, কত মাঠ, বন, নদী, খোলা আকাশের নীচে। সে যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে এক এক সময় আকাশের নক্ষত্র ছিটকে খসে পড়েছে। তারপর ওরা এনেছিল এখানে। প্রায় দিন পনের আগে। তারপর আজ তোমরা ওদের মেরে আমায় বার করে আনলে।

আবার একটু থামল মেয়েটি। তারপর কমাণ্ডারের দিকে ফিরে বলল, 'আর আমার বেঁচে কোনো লাভ আছে?'

'কিন্তু মরেই বা কি হবে'—কমাণ্ডারের বদলে উত্তর দিল অধ্যাপক হাই।

'লজ্জার হাত থেকে বাঁচব

'কিসের লজ্জা?'

'কিসের লজ্জা'—চুপ করে খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল মেয়েটি। তারপর মুখ তুলে অধ্যাপক হাইয়ের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলল, 'আচ্ছা আপনি বলুন তো আমার ছেলেকে স্বামীকে এ মুখ আমি কি করে দেখাব? বলুন, দেখানো যায়? এর পর কি আমার ছেলে আমায় মা বলে ডাকবে? আমার স্বামী কি আমায়···না। না। আপনাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন আপনারা।'

'যদি মা না বলে, তবে বুঝতে হবে সে হারামের বাচ্চা'—হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে একটা ভারী কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল। সবাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকাল তার দিকে। হাতে একটা ব্রেনগান নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাষী রসিদ মিঞা। ষাটের ওপর বয়স। মাথায় এলোমেলো পাকা চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোল মুখ, চোখে ভারী শুষ্ক দৃষ্টি।

সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে কারও দিকে লক্ষ্য না করে ক-পা এগিয়ে এল মেয়েটির সামনে। তারপর তেমনি ভারী গলায় বলল, আমার নাম 'রসিদ মিঞা। রাণীশংকৈল থানায় বাড়ি। বুঝলেন।' বলেই সে হঠাৎ গায়ের জামাটা টান মেরে খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিঠটা দেখিয়ে বলল, 'দেখছেন দাগ। বাঘে থাবা মেরেছিল। কিন্তু তবু রসিদ মিঞা মরে নি—' বলে আবার সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, জীবনে তিনটে বাঘ আমি মেরেছি। মনে বড় অহঙ্কার ছিল বীর বলে। কিন্তু তবু আমি পারি নি। জোর করে আমার মা মরা মেয়েদের তুলে নিয়ে গেল গাড়িতে। কিছু করতে পারলাম না। বন্দুকের কুঁদোর বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম

সেখানে। শুধু একবার শুনলাম মেয়েরা ডাকছে, 'আব্বা বাঁচাও। আব্বা বাঁচাও।' তারপর জ্ঞান হল, উঠে দাঁড়ালাম। শুধু চারধার থেকে শুনতে লাগলাম আমার মেয়েরা কাঁদছে, 'আব্বা বাঁচাও। আব্বা বাঁচাও।' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। গ্রাম থেকে ছুটে গেলাম মাঠে। কিন্তু সেখানেও চারিধার থেকে সেই এক ডাক 'আব্বা বাঁচাও। আব্বা বাঁচাও।' সেই ডাক না শুনবার জন্যে পাগলের মতো ছুটে বেড়ালাম এধার ওধার, আকাশে দু-হাত তুলে আল্লার কাছে হাউ হাউ করে কেঁদে বললাম, 'আল্লা, মেয়েদের ইজ্জত যদি রাখতে না দিলে তবে আমায় বার করেছিলে কেন?' কেউ জবাব দিল না। তখন ভাবলাম আত্মহত্যা করব। কি লাভ এ এ জীবন রেখে। কিন্তু তারপরই মনে হল শোধ না নিয়ে তো মরা হবে না। তখন এসে যোগ দিলাম মুক্তিফৌজে। হাতে তুলে নিলাম অস্ত্র। আজ পর্যন্ত তেরজন খান সেনাকে মেরেছি। আর যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ওদের মারব। এই আমার কাজ।'

চুপ করল চাষী রসিদ মিঞা। ঘরের ভেতরটা অকস্মাৎ নীরব হয়ে গেল। পুরুষরা সবাই কি রকম চঞ্চল ভাবে তাকাতে লাগল এধার-ওধার। রসিদ মিঞার কথায় হয়তো সবারই নিজের নিজের ঘরের কথা মনে পড়ে গেল। এই তো ক মাস আগেও সবারই ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, স্ত্রী ছিল, পুত্র-কন্যা মা-বাবা সব ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক ঝড়ের ঝাপটায় সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল। আজ আর কেউ জানে না কোথায় কোন সৈন্য শিবিরে তার স্ত্রী কন্যা। জানে না এদেরই মতো তারাও কেউ পূর্ণাগর্ভা, না উন্মাদিনী না আত্মঘাতিনী। জানে না যে-ঘরে তারা জন্মেছে সে-ঘর আজও আছে, না জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে সবাই চুপ করে রয়েছে। যেন থমকে গিয়েছে ঘরের হাওয়া। এমন সময় হঠাৎ সেই পাগল মেয়েটি খিল খিল করে সজোরে হেসে উঠল।

সেই হাসির শব্দে চমকে উঠল ঘরের সবাই। বিরক্তি ভরে ফিরে তাকাল মেয়েটির দিকে। অধ্যাপক হাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেই মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে রাইফেলের কুঁদোটা মাটিতে ঠুকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করো।'

সামনে রাইফেলটাকে দেখে মেয়েটি এক মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর বোবা জন্তুর মতো একটা আর্ত চিৎকার করে কোমরের কাপড়টি খুলে

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তার সর্বাঙ্গে চাবুকের লম্বা লম্বা কালো কালশিরা দাগ।

হঠাৎ মেয়েটি উলঙ্গ হয়ে সামনে শুয়ে পড়তেই অধ্যাপক হাই ভয় পেয়ে "বাপরে' বলে ছিটকে সরে এল পেছনে। অন্য সকলেও কি রকম হকচকিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ চাষী রসিদ মিঞা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'ওঠো মা। ওঠো ওঠো।'

মেয়েটির মুখখানা তখনও গভীর আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে রয়েছে। শুয়ে শুয়ে সে কাঁপছে ঠক ঠক করে। রসিদ মিঞা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বাঁ হাত দিয়ে তার শরীরটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর অধ্যাপক হাইকে বলল, 'বন্দুকটা সরিয়ে নিন তো সামনে থেকে। সবাই বন্দুকগুলো আড়াল করে দাঁড়ান তো।'

রসিদ মিঞার কথা মতো সবাই বন্দুকগুলো পিছনে নিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল। রসিদ মিঞা আস্তে আস্তে ধরে তুলে বসিয়ে দিল মেয়েটিকে। কিন্তু তার ভয় তখনও কাটে নি। ফ্যাকাসে মুখে সে তাকাতে লাগল এধার ওধার আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল অধ্যাপক হাইকে।

গোটা ঘর নির্বাক নিস্পন্দ। বাইরে কড়কড় করে একবার মেঘ ডেকে উঠল। দমকা ঝড়ের ঝাপটায় একবার মড় মড় করে কেঁপে উঠল ঘরের খড়ের চালটা। সহসা অধ্যাপক হাই সজোরে নিজের মাথার চুলগুলো বাঁ হাতে মুঠো করে চেপে ধরে রসিদ মিঞার দিকে ফিরে বলল, 'মানুষের সহ্য করার শক্তি কতখানি বলতে পারো রসিদ মিঞা?'

রসিদ মিঞা বিড়বিড় সরে উত্তর দিল, 'কি জানি। বোধ হয় ধরিত্রীর চেয়েও বেশি।'

৩

ঘরে যে এত ঘটনা ঘটে গেল তাতে অন্য মেয়েগুলির কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তারা যেন বোবা। চোখের নিথর দৃষ্টিতে শুধু এক অপরিসীম শূন্যতা। একটু পরে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে কমাণ্ডার জব্বার সেই মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে? এইবার তো আমাদের যেতে হয়। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে আসছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুক্তিযোদ্ধারা কমাণ্ডারের কথায় সায় দিয়ে বলল,'হাঁ চলুন। এই মেয়েগুলিকে নিয়ে যেতে বহু সময় লাগবে।'

কমাণ্ডার সেই মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,'কি গো, তোমরা যাবে তো? চলো। তারপর ক্যাম্পে গিয়ে তোমাদের ব্যবস্থা করা হবে।'

একমাত্র পাগলীটি ছাড়া অন্য মেয়েগুলি অনুগত পোষা জন্তর মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে জানাল তারা যাবে।

কমাণ্ডার জব্বার এবার সেই বয়স্কা মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'সবাই যখন যেতে রাজি তখন আপনি আপত্তি করছেন কেন? চলুন।'

মেয়েটি স্পষ্টভাবে কমাণ্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায়?'

'আমাদের ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে তারপর আপনার কেউ বেঁচে আছে কি না খোঁজ খবর নেওয়া হবে।'

'তারপর?'

'তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপনার নিজের লোকের কাছে।'

মেয়েটি মাথা হেঁট করে নীরবে কি যেন একটু ভাবল, তারপর মুখ তুলে সহজ গলায়, বলল, আপনারা যদি সত্যি করে আমাদের বন্ধু হন তাহলে একটা কাজ করুন।'

'কি?'

'আমাদের গুলি করে মেরে আপনারা চলে যান। তাতে আমরা শান্তি পাব। আপনাদেরও বোঝা কমবে।'

'কি বকছেন পাগলের মতো?' একটু বিরক্ত হয়ে ঝেঁকে উঠল কমাণ্ডার জব্বার।

মেয়েটি শান্তভাবে বলল, 'ঠিক বলছি। তাকিয়ে দেখুন তো এর দিকে।' বলে সে পূর্ণগর্ভা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, 'কত বয়স? বড় জোর তের কি চোদ্দ? এরই মধ্যে ও মা হতে চলেছে। এই দেখুন এই মেয়েটি পাগল হয়ে গিয়েছে। এদের বেঁচে থেকে তো কোনো লাভ নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি এদের মরণ হয় ততই ভালো।'

কমাণ্ডার কিছু বলার আগেই অধ্যাপক হাই মেয়েটিকে বলল, 'কেন. এদের বেঁচে থেকে লাভ নেই কেন?'

মেয়েটি বলল, 'এই জীবন নিয়ে এরা বেঁচে থেকে কি করবে? না পাবে এরা বাড়ীতে জায়গা, না পাবে সমাজে স্থান। সবাই এদের দেখে শুধু মুখ

ফিরিয়ে নেবে।'

'না। নেবে না'—হঠাৎ মেয়েটির কথার মাঝখানে গর্জন করে উঠল অধ্যাপক হাই। একটু উত্তেজিতভাবে বারকয়েক এধার ওধার তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'তাহলে আমরা কিসের জন্যে লড়ছি। সে স্বাধীনতার কি দাম হবে যদি তা যারা সব চেয়ে নির্যাতিত তাদের সম্মান দিতে না পারে? আমি বলব এ সব কথা ভেবে আপনি ভুল করছেন।'

মেয়েটি বলল, 'আমি ভুল করি নি। আমি ঠিক বলছি। ভুল করছেন আপনারা। কারণ আপনারা পুরুষ। মেয়েদের এ সমস্যার কথা আপনারা বুঝবেন না।'

'কেন বুঝব না?'

'আপনারা মেয়ে নন বলে।'

'মেয়ে নই বলে বুঝব না?'

'হ্যাঁ। যদি মেয়ে হতেন তো বুঝতেন ইজ্জত চলে গেলে মেয়েদের আর কিছুই থাকে না। সে কাঙালের বৌ হোক; কি ধান ভেনে ঘুটে কুড়িয়ে থাক, লোকে একমাত্র দেখে মেয়েদের ইজ্জত। যার নাই তাকে আর যাই করুক কেউ কোনোদিন সম্মান দেয় না।'

'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। না—না'—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল অধ্যাপক হাই, 'তা কেমন করে হবে। শুধু কটা পশু ধর্ষণ করেছে বলে এই মেয়েদের গোটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? এরা আর কিছুই করতে পারবে না? কাউকে ভালোবাসতে পারবে না? সুখের ঘর বাঁধতে পারবে না? ছেলেপিলের মা হতে পারবে না? একটা গান গাইতে পারবে না? একটু হাসতে পারবে না? এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। এই তো আমি। জানি না আমার স্ত্রী এখন কোথায়? কিন্তু যদি কোনো পিল বকস্ কি ব্যারাক থেকে আপনাদের মতো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করি, তাহলে কি আমি তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারবে না? সে আমায় আগেকার মতো ভালবাসতে পারবে না? তা কি হয়? এই রসিদ মিঞার মেয়েদের যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তারা আর ওকে বাবা বলে ডাকবে না? এ হতে পারে না। ও সব ভুল। আমরা পুরুষ বলে শত্রু আমাদের ওপর দৈহিক নির্যাতন করে একভাবে। গুলি করে আমাদের গা থেকে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেয়। আর আপনারা মেয়ে—আপনাদের ওপর

দৈহিক নির্যাতন করে অন্য ভাবে। কিন্তু সেই দৈহিক বিপর্যয়টাই তো জীবনের সব কিছুর ওপর হতে পারে না।'

এতক্ষণ একটানা কথা বলে উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে অধ্যাপক হাই। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছে। ফুলে উঠেছে, কানের পাশে রগের শিরা দুটো। একটু থেমে সে আবার বলল, 'মেয়েদের ঐ ইজ্জতের ধারণা সেকেলে ধারণা, মোল্লা-মৌলভিদের ধারণা। তারা বলত বোরখা না পরে পথে বেরুলেই মেয়েদের বেইজ্জতি হয়, কিন্তু আজ মেয়েরা যেখানে পাশে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে লড়ছে সেখানে একটা সৈন্য তার ওপর দৈহিক নির্যাতন করলেই তার ইজ্জত চলে যাবে? না, তা হয় না। তাহলে কেন মেয়েরা লড়বে এই স্বাধীনতার জন্য? তাহলে কিসের এ আহ্বান 'বাঙলার সাড়ে সাতকোটি মেয়ে-পুরুষ তোমরা দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করো।'

চুপ করল অধ্যাপক। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। বাইরে শুধু ঝম ঝম করে বারিপাতের শব্দ আর ঝড়ের গর্জন।

ঘরের মধ্যে অন্য মেয়ে কটি নীরবে বসে আছে। শুধু একমনে দুলছে সেই পাগলীটি। বয়স্কা মেয়েটি অধ্যাপক হাইয়ের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার চোখ দুটো জলছে দপ দপ করে। মনের ভেতর তার যে ঝড় বইছে সেই অস্থিরতায় বারবার এধার ওধার মাথা নাড়তে নাড়তে সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কিন্তু লজ্জা, লজ্জার হাত থেকে বাঁচবো কি করে?'

'কিসের লজ্জা আপনার'—এবার কথা বলল কমাণ্ডার। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'আমি যতদিন বাঁচব ততদিন তো লোকে বলবে ঐ মেয়েটাকে খান সেনারা—না না না। কাল যদি আমার নাতি নাতনি হয়, তারাও তো বড় হয়ে শুনবে? না। না। আর আমার ছেলে। সে যদি আমায় আর মা বলে না ডাকে? না—না গো। তোমাদের কথা ভুল। ভুল'—বলতে বলতে মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুলেই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

দরজাটা খোলামাত্র প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে চড়চড় করে জলের ছাঁট এসে আছড়ে পড়ল ঘরের মেঝেয়। হারিকেনটা একবার দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। অন্ধকারে ঝড়ের ঝাপটায় চিৎকার করে উঠল একটি মেয়ে। পরক্ষণেই হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে কমাণ্ডার জব্বারই প্রথম চিৎকার করে উঠল, 'ধরো। ধরো। ধরো ওকে।'

কমাণ্ডার জব্বার, অধ্যাপক হাই, চাষী রসিদ মিঞা সবাই এক সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু সেই দুরন্ত ঝড় ঠেলে কার সাধ্য এগোয়। তবুও ওরা প্রাণপণ শক্তিতে খানিকক্ষণ খুঁজল তাকে। কিন্তু না। কেউ পেল না তাকে। একটু পরে ভিজে সপ সপে হয়ে সবাই নীরবে ফিরে এসে, ঘরের মধ্যে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। বুকের ভেতরটা যেন মনে হল শূন্য হয়ে গিয়েছে সবারই। একটু আগের সফল অভিযান, পাক সেনাদের হত্যা, বন্দিনীদের উদ্ধারের আনন্দ যেন এক ফুৎকারে নিভে ম্লান হয়ে গেল। একটু পরে সেই অন্ধকার কে যেন ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ?'

কথাটা শুনে সম্বিত ফিরে এল সবার। কমাণ্ডার জব্বার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে আর কি ? এদের নিয়ে চলো আমরা চলে যাই।'

'আমি থাকব ? কাল সকাল হলে ভালো করে দেখতাম খুঁজে,—মিনতি ভরা কণ্ঠে অনুমতি চাইল অধ্যাপক হাই।

কমাণ্ডার জব্বার সংক্ষেপে বলল, 'না।'

মেয়ে ক'টিকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল নিরাপদ আশ্রয় স্থানের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে সবাই একবার করে পিছন ফিরে তাকাল তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে চাষী রসিদ মিঞা গেরিলা যুদ্ধের সব নির্দেশ ভুলে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'মা, ফিরে আয় রে। কেউ যদি না নেয়, আমি তোকে মাথায় করে রাখব।'

কিন্তু কোনো সাড়া এল না। শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসা উন্মত্ত ঝড় ওদের চারিপাশ ঘিরে আ আ করে গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে গেল।

বন্যা ও লাবণ্য

শচীন বিশ্বাস

সকাল থেকে আকাশ মেঘের ভারে থম থম করছিল। প্রায় সারারাত ধরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। এখন শীত শীত জলীয় বাতাস গায়ে বিঁধছে। লাবণ্য খুব ভালো করে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিল। বসাকদের বাড়ির নিচে এসে সে হিজল গাছটার তলায় দাঁড়াল। সামান্য একখানা এক চিলতে মাঠের ওপাশে ওদের ভাঙাচোরা দোমড়ানো ঘরখানা দেখা যায়। পিঠেপোড়া গাছের তলা দিয়ে বারান্দার এক কোণে মিনুকে দেখতে পেল। মিনু এখনও কাঁদছে। হাত পা ছুঁড়ছে। লাবণ্যর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু দুর্বল হলে তাকে চলবে না। কাঁদুক, যত পারে কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে এক সময় চুপ করবে, ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় চটের উপর ঘুমিয়ে পড়বে। বুড়ি শাশুড়িও মিনুর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করছে। ইদানিং সে আপন মনে বকে, সব কথার অর্থও হয় না। ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকে বুড়ি খুবই বেসামাল হয়ে পড়েছে।

লাবণ্য এগিয়ে চলল মেঠো পথ ধরে। দুই পাশে ধানের জমি, কোথাও বা পাট। লাবণ্য ধান পাট বেনাঝাড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। এই রাস্তাটুকু ভয় ভয় করে। কিন্তু তাকে ভয় পেলে চলবে না। মিনু কাঁদছে, কাঁদুক। বিনুরও মন ভার। ছেলে মেয়ের জন্যে লাবণ্যর দুর্বল হওয়া চলবে না। গোবিন্দর কথা মনে পড়ল। না, সেকথাও সরিয়ে রাখতে হবে মন থেকে।

সামনে হালদারদের বাড়ি। পুজো শেষ হয়েছে। মণ্ডপ চত্বরে এখনও পূজার উপকরণের কিছু কিছু চিহ্ন পড়ে আছে। ধূপের গন্ধটা লাবণ্যর খুব ভালো লাগে। এখানে এলেই গন্ধটা তার নাকে লাগে। লাবণ্য শূন্য মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত ঠেকাল।

সামনে বেঁকে গেছে রাস্তাটা। দাসেদের পুকুর। পুকুরপাড়ে কলা বাগান। ডাগর ডাগর নারকেল সুপারি গাছ। রাস্তাটা বাঁয়ের দিকে পাটের ক্ষেতের পাশে বেঁকেছে। আর একটা আড়াল। হালদারদের ছেলে জয়ন্ত আসছিল সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে। রাস্তায় কাদা জমেছে। যদিও বেলে

মাটি, আর কিছুক্ষণ বৃষ্টি না হলে শুকিয়েও যাবে, কিন্তু এখন সারারাত বৃষ্টির পর কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। লাবণ্যকে দেখে জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। লাবণ্য বলল, সাইকেল ঠেলছ যে ঠাকুরপো। চড়ে যাও না—

জয়ন্ত বলল, সব সময় কি চড়া যায়, এখন তোয়াজ করছি—

লাবণ্যর হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু সে হাসল না। হাসলে জয়ন্ত প্রশ্রয় পাবে। হয়ত এই পাট ক্ষেতের আড়ালেই একটা কাণ্ড করে বসবে। লাবণ্য পাশ কাটাল। জয়ন্ত যথারীতি বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে বাধা দিল, চলেছ কোথায় ?

লাবণ্য ওর হাতখানা সরিয়ে দিতে দিতে বলল, যাই—

জয়ন্ত। হালদারদের ছেলে জয়ন্ত, বালুরঘাট কলেজে পড়ে। সবে গোঁফ রাখতে শুরু করেছে। সে সন্ত ছাঁটা সরু গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল, আমি জানি বৌদি—

লাবণ্যর বুকের মধ্যে ধুক-ধুক করে উঠল। বলল, জানো—কি জানো ?

তুমি জয়কিষাণের কারখানায় রেডিমেড সেলাই করতে যাও—

হুঁ যাই ত। লাবণ্য আর দাঁড়াল না। এগিয়ে চলল। জয়ন্ত তখন পেছন ফিরে একটু জোরেই বলল, জয়কিষাণের মতো একটা কাপড়ের দোকানও যদি থাকত—

লাবণ্য অনেক দূরে চলে এসেছে। সামনে ছেলেদের বল খেলার মাঠ। ডাইনে ঘোষেদের বাড়ি। বাঁয়ে হাইরোডের নিচে খাল। বিরাট এই নাবাল চত্বরের জল গড়াতে গড়াতে খাল হয়ে গেছে। একটু এগিয়ে পুনর্ভবা নদী। গত কাল পর্যন্তও খালে বেশি জল ছিল না। এখন পার হতে গিয়ে লাবণ্য দেখল, হাঁটুর উপরে জল উঠেছে। কাপড়ের প্রান্ত একটু ভেজাতেই হল। খাল পার হয়ে হাইরোডে ওঠার রাস্তা। পাহাড়ে ওঠার মতো করে উঠতে হয়। লোহার জাল দিয়ে হাইরোডের গা ঢাকা। বৃষ্টিতে বা জলস্রোতে হাই-রোডের মাটি কেটে যেতে পারে না। ভাঙনের হাত থেকেও রক্ষা পায়। লাবণ্য এগিয়ে চলল। জয়ন্ত বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলে। ওকি জয়-কিষাণকে সহ্য করতে পারে না! কিন্তু লাবণ্যকে ত আসতেই হবে। উপায় কি !

জয়কিষাণের সেলাই কারখানা বাজারের এক পাশে। পুনর্ভবার পাড়ির ঠিক উপরে। দুটি পুরুষ ও চারটি নারী কাজ করে এখানে। ম্যানেজার

আছে, হিসাব লেখার লোক আসে সন্ধ্যার দিকে। পেছনের খুপরি ঘরে জয়কিষাণ এসে বসে। অনেক ব্যবসাপত্তর, বিস্তর কাজ তার। সদা ব্যস্ত।

মুক্তি এরই মধ্যে মেশিনে বসে গেছে। দুর্গা শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, হাসছে, রেডিমেড কাজ। ফুরণে বন্দোবস্ত। ডজন ডজন মাল তুলে পয়সা উপায় করতে হয়। পুরুষ দুটি, অনিল আর বিশ্ব কাপড় কাটছিল। ইজের, প্যান্টের ছিট, কয়েকটি থান সামনে স্তুপ করা। নীল রঙের ক্রেপ; মাড়ে কড় কড় করছে। মিনুটার জন্যে একটা ছোট্ট জাঙ্গিয়া করে নিতে ইচ্ছা হয় লাবণ্যর। জয়কিষাণ শক্ত হিসেবী মানুষ, নিশ্চয়ই চার-ছ আনা কেটে রাখবে। সংসার বিরাট মুখে হাঁ করে আছে। চার-ছ আনার মূল্যও সেখানে অনেক।

জয়কিষাণ অনিল ও বিশ্বকে ইজের প্যান্টের সাইজ বোঝাচ্ছিল। এবার লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে বলল, কতোক্ষণ ঠারিয়ে রইবে, কাজ কোরবে কোথন? সে কথাগুলো বলছিল আর লাবণ্যকে দেখছিল। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে লাবণ্যর চোখ মুখ গলা বুক দেখছিল। দেখবেই—লাবণ্য জানে।

লাবণ্য মেশিনের দিকে এগিয়ে গেল। কাঠের বেড়া, টিনের ঘর। জানলা দিয়ে পুনর্ভবার তাণ্ডব দেখা যায়। জল ফুলছে বা বলা যায় ফুঁসছে—আজকের চেহারা খুবই ভয়াবহ। হয়ত আবার গ্রাস করবে। এ অঞ্চলে পুনর্ভবার তাণ্ডব নিত্য ব্যাপার। ফুলে ফেঁপে উঠে প্রায়শ সে গ্রাস করে ফেলে মাঠ ঘাট জনপদ দোকান হাট বাজার। সিটে বসতে বসতে লাবণ্য আর একবার তাকিয়ে দেখল, পুনর্ভবার ঘোলাজল পাক খেতে খেতে দ্রুত বয়ে চলেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা জলস্রোত পাক খেতে থাকে।

দ্বিতীয়বার যখন বর্ষা নামল, এই অসময়ে বিজয়া দশমীও যখন চলে গেছে, সামনে লক্ষ্মী পূর্ণিমা, এ অঞ্চলের কেউ ভাবতে পারে নি এমন ভয়ঙ্কর হবে তার রূপ। বানগড় রাজবাড়ির গা ঘেঁষে ঘেঁষে যে ছোট্ট খালটা পর্বতপ্রমাণ উঁচু হাইরোডের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদূরে পুনর্ভবায় পড়েছে সেখানে গতকাল পর্যন্তও তেমন জল ছিল না। আজ সকালেও ছিল হাঁটু সমান জল। দুপুরের মালদা-বালুরঘাট বাসের যাত্রীরা শ্যাম ঘোষের দোকানের চা সিঙ্গাড়া খেয়ে লোহার জাল জড়ানো হাইরোডের গা বেয়ে নিচে নাবাল জমিতে নেমে গ্রামের পথ ধরেছে। তখন অবশ্য মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির তীব্র ঝাপটা লেগে

শ্যামের দোকানের চাটায়ের ঝাঁপ দুমড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির জল হাইরোডের কনক্রিটের উপর দিয়ে বেশ মোটা ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল পাশের খালে। ছাতা মাথায় ছিপ হাতে অনেকে মাছ ধরতে যাচ্ছিল পুনর্ভবায়। ওরা বলাবলি করছিল, জল বাড়বে। জেলেরা জাল নিয়ে শিববাড়ির কালভার্টে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। ওরাও বলছিল, জল বাড়বে। খবরের কাগজের স্থানীয় রিপোর্টার পুনর্ভবার সেতুর সাদা ঝকঝকে থামের গায়ের স্কেল থেকে জলের পরিমাপ করতে করতে বলল, ডেঞ্জার লেভেল ক্রস করেছে···। নিচের গ্রাম থেকে আসা হারাণ মণ্ডল গরু চরাচ্ছিল, সে বলল, কি গ বাবু মশাইরা, কি কইছেন। কে একজন বলল, বন্যা আসছে গো, বন্যা, পুলাপান গরু-মোষ মাগ-মরদ নিয়ে হাইরোডে চলে এসো।

হাইরোডে ছুটে ছুটে যায় আশেপাশের মানুষ। চোখে মুখে আতঙ্ক। তিস্তার জলও নাকি বাড়ছে। খবরের কাগজ রেডিওতে তার বিবরণ। ব্রহ্মপুত্র ফুলছে। দার্জিলিং-এ ধস্ নেমেছে। যতই শুনছে, আতঙ্ক বাড়ছে। মুখ শুকনো, চোখের দৃষ্টিতে দিশেহারা ভাব।

লাবণ্য বাজারের পথে ফিরছিল। জয়কিষাণের কারখানায় সারাদিনের পরিশ্রম। জানলা দিয়ে পুনর্ভবার ফুলে ফেঁপে ওঠা জলস্রোত। জয়কিষাণের লুব্ধ দৃষ্টি। অনিল-বিশ্বর শস্তা রসিকতা। দুর্গার কারণে অকারণে হাসি। সব মিলিয়ে এক অস্বস্তির মধ্যে সারাদিন কাটে। হাত পা ধরে যায়। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তবুও দ্রুত মেশিন চলে, হাত পা চলে। ফুরণে কাজ। ডজন ডজন মাল না তুললে খাবে কি! লাবণ্যর চোখের সামনে মিনুর কচি ম্লান মুখখানা ভাসে। বিনুর অভিমান। বুড়ি শাশুড়ির অসহায় মুখখানাও। ছেলে মরে যাওয়ার পর থেকে বুড়ির মাথার ঠিক নেই। লাবণ্যকে গালাগালি দেয়, হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকে। যেন গোবিন্দ মারা যাওয়ার জন্যে লাবণ্যই দায়ী। যেন গোবিন্দর জন্যে ওর মনে কোনো দুঃখ নেই।

রাস্তার মোড়ে বিপিনের পানের দোকানের সামনে পশুপতিরা জটলা করছিল। জয়ন্তও ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বালুরঘাট থেকে একটা বাস এসে থামল। ঘড়র্ ঘড়র্ করে ডিজেল ছাড়ছে। সামনের কাঁচের উপর দুটি কাঠি যান্ত্রিক গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। যাত্রীরা চা খাচ্ছে, সিগারেট টানছে। বিপিন সনাতন বা ঘোষেদের দোকানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। উনানে জল

ফুটছে। কাপ প্লেট নিয়ে ছুটোছুটি। সিঙ্গাড়া নিমকি ভাজা হচ্ছে। বৃষ্টির জন্যে বিরক্তি, বন্যার সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠা। বৃষ্টি থামছে না, বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা।

লাবণ্য সনাতনের দোকানের ঝাঁপের তলায় দাঁড়াল। বেশ ভিজেছে। কাপড়খানার জন্য চিন্তা তার। কাল সকালে আবার আসতে হবে। একখানিই ত মোটে কাপড়। কোনো এক দুর্বল মূহূর্তে জয়কিষাণ তাকে একখানা শাড়ি দিতে চেয়েছিল। নিতে সাহস হয় নি লাবণ্যর। জয়কিষাণ হাত ধরেছিল। সাড়া দিতে পারে নি লাবণ্য। জয়কিষাণ আরও কি কি সব দিতে চেয়েছিল, স্নো পাউডার গন্ধতেল, নিতে সাহস পায় নি লাবণ্য। জয়কিষাণ বলেছিল, রাণী বানায়ে দিব; লাবণ্য ভয় পেয়ে ছেলেমেয়ে ও বুড়ি শাশুড়ির কথা ভেবেছে। জয়কিষাণের হাতে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা।

তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। লাবণ্য বের হয়ে পড়ল। একটু এগিয়ে যেতেই জয়ন্ত ছুটে এল, বৌদি, এখন ফিরছ?

লাবণ্য চলতে চলতেই বলল, হুঁ দেখ না বৃষ্টির জ্বালাতন—

আমার ছাতাখানা তুমি নিয়ে যাও, আমার ত ফিরতে অনেক রাত, তখন বৃষ্টি নিশ্চয়ই থাকবে না।

লাবণ্যর মুখ ঘাড় গলা বেয়ে শির শির করে জলের ফোঁটা পড়ছে। এখন এই মুহূর্তে তার ভিজতে ভালো লাগল। বলল, না ভাই, তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই ত যেতে হবে—কেউ যদি দেখে ফেলে। জয়কিষাণের লুব্ধ দৃষ্টি তাকে তাড়া করছিল।

কি দেখবে? ছাতা কি আর কেউ কিনতে পারে না?

আর কেউ পারলেও আমি পারি না—আমি যাই, বলতে বলতে লাবণ্য হাইরোড ধরে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে সে জয়ন্তর কথাই ভাবছিল। আগে, গোবিন্দ বেঁচে থাকতে, ওদের বাড়িতে ঠাকুর দেখতে এলে জয়ন্ত নিজের হাতে প্রসাদ দিত। আমোদ রসিকতা ভালোবাসে। গোবিন্দকে বলত, তোমার ভাগ্য ভালো গোবিন্দদা, একখানা বৌয়ের মতো বৌ পেয়েছ। নাও বৌদি আর দুখানা ফল খাও।

বছর তিনেক রোগ ভোগার পর গোবিন্দ যখন মারা গেল লাবণ্য তখন মিনু আর বিনুর দিকে তাকিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিল। বুড়ি মা বুক চাপড়ে কাঁদল। জয়ন্তরা যখন তার চোখের সামনে থেকে গোবিন্দর মৃতদেহটা সরিয়ে

নিয়ে গেল, লাবণ্য তখন উঠোনে ধুলোর মধ্যে পড়ে পড়ে কাঁদছিল। কিন্তু এ-কান্নাও ত একদিন থাকবে না। তখন বিনু মিনুর দিকে তাকাতে হবে। বুড়ি আছে। তার নিজের পেটই বা কতক্ষণ শাসন মানবে। সংসারের এতগুলি প্রাণী খাবে কি!

গোবিন্দর সম্বল বলতে পাঁচকাঠা জমির উপর একখানা খড়ের চালা ঘর। গোবিন্দ খ্যাপলা জাল ঘাড়ে করে খাল বিল নদীতে মাছ ধরে সন্ধ্যার আগে হাইরোডে বসত বিক্রি করতে। উপায় সামান্যই। ভাঙা ঘরে ঝলমল করত লাবণ্য। কিন্তু সে রূপ বেশিদিন টিকল না। এখন যা আছে ছাইচাপা আগুন। কেবল সরু কপালের নিচে এক জোড়া ডাগর চোখ চক চক করে। ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে জয়কিষাণ দিশেহারা হয়ে যায়। অনিল-বিশ্বরা মুখ তুলতে না পেরে দূর থেকে রসিকতা করে। কেবল জয়ন্তটা বড় দুরন্ত সাহসী। সে স্থির দৃষ্টিতে লাবণ্যর চোখের দিকে তাকায়। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে দৃষ্টিপাত করে। তার তাজা তরুণ রক্ত দাপাদাপি করে। লাবণ্য জয়কিষাণের মুখকে ভয় করে। জয়ন্তর মুখখানা ভেবে সুখ পায়।

লাবণ্যর ভয় ছিল, বুক কাঁপত। তবুও তাকে সংসারের দিকে তাকিয়ে বের হতে হল। দুর্গা যখন জয়কিষাণের দর্জির দোকানে কাজের কথা বলল, লাবণ্য রাজি হল। সোজা সেলায়ের কাজ। লাবণ্য পনের দিনেই শিখে ফেলল। অবশ্য দুর্গার সামনে কাজ সে করতে পারে না। দুর্গা এখানকার মধ্যমণি। দুর্গা জয়কিষাণের পয়মন্ত লক্ষ্মী মেয়ে। এখানে অনেকেই জানে, কাজ শেষ হয়ে গেলেও দুর্গা বাড়ি যায় না। পুনর্ভবার পাড়ে জলের উপরে জয়কিষাণের খুপরির মধ্যে মালিকের সান্নিধ্যে তাকে অনেকক্ষণ কাটাতে হয়। কিন্তু লাবণ্য ত দুর্গার মতো হতে পারে না—সে দ্রুত পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে।

এই সব ভাবতে ভাবতে লাবণ্য এগিয়ে যাচ্ছিল। এখনও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাইরোডের নিচের খালে এখন আরও জল বেড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে, কাপড় তুলে সে খাল পার হল। কাপড় ভিজলে তার চলবে না। তাকে যে আবার এই কাপড় পরেই আগামী কাল সকালে কাজে আসতে হবে, জয়কিষাণের উপহার ত সে নিতে পারে নি।

পুকুরপাড়ে এসে ডানপাশ থেকে ধানের মাঠ ভেঙে জয়ন্তকে আসতে দেখল লাবণ্য। থমকে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। বৌদি বৌদি বলে চিৎকার

করছে জয়ন্ত। ছেলেটির লজ্জা সরমও নেই। সামনেই তাদের বাড়ি। ওর বাবা ভীষণ কড়া লোক। একবার যদি বুঝতে পারে গোবিন্দর বিধবা বৌয়ের সম্পর্কে জয়ন্ত খুবই আগ্রহী, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। ছেলেও বাবাকে খুব ভয় করে। কিন্তু ঐ এক স্বভাব—ঠিক থাকতে পারে না। কী এক দুর্বার আর্কষণ তাকে সর্বদা লাবণ্যর দিকে টানে।

কাছে এসে জয়ন্ত বলল, চলো তোমাকে এগিয়ে দেই—

লাবণ্য বলল, আমাকে ভিটেছাড়া করবে নাকি ?

জয়ন্ত লাবণ্যর মাথার উপর ছাতা ধরল, চলো ঘুরে যাই। পুনর্ভবার পাড় ঘেঁষে জমির আলের উপর দিয়ে। যাবে ?

না, লাবণ্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্ত বাঁ হাত বাড়িয়ে লাবণ্যর ডান হাতখানা ধরে ফেলল, যাবে না ?

লাবণ্যর সারা শরীর অবশ হয়ে এল। মুহূর্তে গোটা সংসার এবং তার দুর্ভাগ্যের জীবনযাত্রার দৃশ্যাবলী সামনের উপর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে গেল। জয়ন্ত বলল, তোমার ভালো লাগে না এই টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে এই ধানের খেত পাটের খেত ভেঙে অনেক দূর চলে যেতে—

জয়ন্তর হাত ছাড়িয়ে দিতে পারল না লাবণ্য।

ধানগাছের ডগা প্রসবের প্রত্যাশায় পুরু নধর। কিছু কিছু শিষ বের হয়েছে, বৃষ্টিতে বাতাসে দুলছে।

জয়ন্ত বলল, দেখ দেখ বৌদি, কি সুন্দর শিষগুলি—সে ধানের শিষগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মুখ নামিয়ে গন্ধ শুঁকল। ধানের ফুল হাতে লেগে গেল। জয়ন্ত লাবণ্যের মুখে কপালে গলায় ধান ফুল মাখিয়ে দিল—

এই, কী পাজিরে, কি হচ্ছে—চলো ফেরা যাক এবার—

ফিরতে দিল না জয়ন্ত। হাত ধরে টানতে টানতে পুনর্ভবার দিকে নিয়ে গেল। মাঠে নরম মাটিতে পা বসে যাচ্ছিল। কিন্তু সে জন্যে ওদের চলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। লাবণ্য এখন অনেক হালকা, মুক্ত ভাবছিল নিজেকে। জয়ন্তর স্পর্শে মুঠো মুঠো শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল লাবণ্যর গায়ে, মনে—।

নদীতে এখন অনেক জল। একটা গাছের গুঁড়ি মতো কি যেন ভেসে যাচ্ছিল। লাবণ্য দেখল, পুনর্ভবা এখনও ফুলছে, ঘোলাজলের পাকগুলো ফুঁসছে। এত জল কোথা থেকে এল। গাছের গুঁড়িটা অনেক দূরে ভেসে

গেল। ঘোলাজলে পাক খেতে খেতে ভেসে গেল। এ পাড়ের কাশ ঝোপ আখের ক্ষেতের মধ্যে জল ঢুকছে। পাড় ছাপিয়ে আজ রাতের মধ্যেই নিশ্চয়ই পাড়ায় পাড়ায় জল ঢুকবে। জল বাড়তে থাকবে, উঠানে উঠে আসবে, ঘরে ঢুকবে। তারপর—

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল লাবণ্যর। ওর হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল। চাল ডাল কিছু তরিতরকারী আছে। দুখানা বিস্কুট আছে মিনু আর বিনুর জন্যে—সব ভিজে গেল বোধহয়। লাবণ্য ঘরে ফেরার জন্যে দ্রুত পা বাড়াল। জয়ন্ত ধরতে গেল, পারল না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। পুণর্ভবার জলে তখন কল কল শব্দ। ধানের মাঠে জল আর বাতাসের দাপাদাপি। লাবণ্য ফিরল না। সে মিনু বিনু বুড়ি শাশুড়ি পুনর্ভবার জলে ভাসমান গাছের গুঁড়িকে ভাবতে ভাবতে ধান ক্ষেতের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাড়ি পৌছতে বুড়ি চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল, সারাদিন একমুটো দানা পড়েনি প্যাটে, কে তোর ছাওয়াল মিয়া আগলায় লো সোয়ামীখাকি। কাল তুই উদের নিয়ে যাবি তোর সাথে—। আমি আর পারব না কয়ে দিলাম।

লাবণ্য মিনুকে কোলে নিয়ে বলল, খাওনি কেন, ভাত ত ছিল—

ভাত ছিল? বলি কতগুলো ভাত ছিল শুনি। নিজে খালি ওই শত্রুরদের রাখতি পারতাম। একবার খালি কি পুলাপনদের দিন যায়?

লাবণ্য কাতর হয়ে বলল, ঝগড়া কর ক্যান মা, খেতে দিতে না পারলে একবার খেয়েই দিন কাটাতে হবে, উপায় কি।

বুড়ির রাগ পড়ছে না। মিনু আর বিনুকে নিয়ে খুবই বিব্রত অবস্থায় তার দিন কাটে। খেতে না পেয়ে ওরা খ্যান খ্যান করে। মাকে না পেয়ে হাত পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দেয়। রাস্তায় মাঠে ঘাটে নদীর দিকে চলে যায়। বুড়িকে ওদের পিছে পিছে দৌড়তে হয়। ওদের জ্বালাতনে বুড়ি সারাদিন একটুও স্থির হতে পারে না। সুতরাং এখনই বুড়ির রাগ পড়বে না, মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না লাবণ্য জানে।

লাবণ্য বলল, যা বাদলা শুরু হল, বন্যা যদি আসে ত কাজকর্মই ত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন—

তখন মরব, বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলল, মরব—। আমাকে ত সুখ খাতিই

রা'খে গেছে বিটা! বুড়ি কাঁদতে লাগল, আমি যে বড় আশা নিয়ে ভিঁটে ছাড়িছিলাম গো—আমার মরণ হয় না।

রাত্রিতে জল বাড়ল। লাবণ্য জেগে ছিল অনেক রাত পর্যন্ত। এমনিতেই নিচু জমিতে ওর চলাঘর। বড় ঢল সামলে উঠানে জল চলে আসে। পুনর্ভবা ফুলে ফেঁপে উঠলে ত কথাই নেই। লাবণ্য বার বার ঘরের বাইরে এসে জলের গতি পরীক্ষা করছিল। তখন ঘরের পোঁতা জেগেছিল। উঠোনে জল থৈ থৈ করছে। লাবণ্য বুড়িকে ডেকে তুলল। বুড়ি কাশতে কাশতে আবার শুয়ে পড়ল। লাবণ্য মিনু ও বিনুকে ডেকে তুলল। ঘুম জড়ানো চোখে কেঁদে কেঁদে ওরা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। লাবণ্য আপন মনে বলল, মর তোরা, আমার আর কি! আসুক বান, সকলেই মরি—

পুনর্ভবার ঘোলা জলের ঘূর্ণি। একখণ্ড মরা কাঠ স্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। জয়কিষাণের লুব্ধ দৃষ্টি, হাতে টাকার বাণ্ডিল—রাণী বানায়ে দিবে জয়কিষাণ। জয়ন্ত আর এক মুগ্ধ যুবক। কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে লাবণ্যকে। পুনর্ভবার জলে মরা কাঠ—। ঘোলা জলে পাক উঠছে—

বুড়ির আর্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসল লাবণ্য। কখন তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রা থেকে ঘুম, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন। লাবণ্য বলল, কি হল? বুড়ি তখন জলের মধ্যে থেকে বিনু ও বিছানা পত্তর টেনে চৌকির উপর তুলছে। বিনুকে নিয়ে সে মেঝেয় শোয়। এখন জল ঘরে ঢুকছে। বিছানা ভিজে গেছে। বুড়ি তারস্বরে চিৎকার করছে, এখন আমার কি হবি, আমি জলে ডুবেই মরে যাব। ও বৌ বসে থাকিস নি, বাইরে যা, কমলাদের ডাক, নৌকা নিয়ে আসুক—

লাবণ্যর হতবুদ্ধি ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগল। বিনু তখন জেগেছে। সেও ভয়চকিত দৃষ্টিতে মেঝের জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘরে কেরোসিনের একটা বাতি জ্বলছে। বিনু বলল, মা ভয় করছে—

লাবণ্য বাইরে এলো। কী ঠাণ্ডা জল। বাইরে তখন সাঁতার পাথার। কোনদিকে যাবে। কমল বলে একবার ডাকল। কোনো সাড়া নেই। অথচ আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে মিনু বিনুদের বাঁচানো যাবে না। বুড়িকেও না। ওরা কেউ সাঁতার দিতে পারবে না। লাবণ্য সাঁতার জানে সে সাঁতরে

হাইরোডে উঠতে পারবে। কিন্তু তখন সঙ্গে যদি কেউ না থাকে। পুর্ণভবা যদি তার ছেলে-মেয়েদের গ্রাস করে নেয়। তাহলে! হাইরোডে উঠে সে কি করবে! জয়কিষাণের কাছে যাবে! জয়ন্ত আসবে!

লাবণ্য আর ভাবতে পারে না। ঘরে এলো। বুড়ি তখনও চিৎকার করছে। তার চিৎকার কান্নার মতো হয়ে বাইরে অন্ধকারে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিস্তারিত হচ্ছে। কিন্তু কৈ, কেউ ত উদ্ধার করতে আর আসছে না। লাবণ্য বিনুর দিকে তাকাল। বৃষ্টির হিমেল হাওয়ায় ছেলেটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। মিনু তখনও ঘুমচ্ছে। লাবণ্য শক্ত করে কাপড় জড়াল মাজায়। যেন লড়াই করতে চলেছে এমনিভাবে আঁটো সাঁটো করে কাপড় পরল। গামছায় জড়িয়ে মিনুকে পিঠের সঙ্গে বাঁধল। বিনুর হাত ধরল শক্ত করে। বুড়িকে বলল, চলো মা, আর দেরি কোরো না, এরপর আর পালানো যাবে না—

বুড়ি ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে বলল, জিনিষপত্তর সব ফেলে—

লাবণ্য বলল, ও-সব থাক, চলো, বের হও তাড়াতাড়ি। বিনু বলল, মা কোলে উঠব। ভয় করছে—

লাবণ্য বিনুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বুড়িকে বলল, ঠিক আমার পেছনে পেছনে এসো মা, ভয় নেই, আমরা যেতে পারব।

বুড়ির সন্দেহ কাটছে না। বলল, আমার গোবিন্দ যদি থাকত মা। আমরা আজ—

লাবণ্য বলল, চলো মা, আর দেরি কোরো না। মিনু বিনু আর বুড়িকে নিয়ে লাবণ্য ফুলে ফেঁপে ওঠা বন্যার-জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুক সমান গলা সমান জল। ঘুরে ঘুরে পথ চিনে অতি সাবধানে সে মিনু বিনু আর বুড়িকে নিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলল। ডান পাশে পুনর্ভবা বাঁ পাশে খাল। জলস্রোত তীব্র হচ্ছে। এখানে সেখানে ঘূর্ণিপাক। লাবণ্যের পিঠের উপরে মিনু বুকের উপর বিনু, বুড়ি পাশে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। লাবণ্য বলল, মা সাবধানে এসো, ভয় নেই। আমার গা ধরে এসো। ঐ ত হাইরোড, একটা নৌকা ঠিক পেয়ে যাব—মা—। বুড়ি ততক্ষণে ডান পাশে হাতের বাইরে সরে গেছে। দুর্দান্ত স্রোতের টানে সে তখন পুনর্ভবার দিকে এগিয়ে চলেছে। লাবণ্য চিৎকার করে ডাকল, মা—। বুকের মধ্যে বিনু ভয়ার্তকণ্ঠে ডাকল, মা—। লাবণ্য বিনুকে বুকের মধ্যে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বন্যার স্রোত কেটে কেটে সাবধানে এগিয়ে চলল।

আসামের ভাষা সমস্যা ঃ সমাধানের সূত্র

আশিস সান্যাল

ভাষার প্রশ্নে আসাম আবার এক সংকটের সম্মুখীন। স্বাধীনতা লাভের পর এই নিয়ে কয়েকবার ভাষা-কলহে রক্তস্নাত হয়েছে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। দেশের প্রতিটি বিবেকবান নাগরিকই এই রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃকলহের পরিণাম চিন্তা করে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। আসামে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান সূত্র নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরেই একটা স্থায়ী সমাধান-সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। তবে এই ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা সহ ভাষাগত গোঁড়ামিকে দূরে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সকলেরই মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষা আমাদের যাই হোক না কেন, আমরা একই ভারতবর্ষের নাগরিক। এই বোধ মনের মধ্যে প্রসারিত করতে পারলে ভাষা নিয়ে এই সমস্যার সমাধানের পথ নির্ণয় সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

সংকটের প্রেক্ষাপট

আসামে অসমীয়াভাষী ও বাঙলাভাষীদের মধ্যে ভাষা নিয়ে কলহ স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনা নয়। বিগত দেড়শ বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসছে। ১৯৬১ খৃঃ ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংহতি সম্মেলনে তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতীয় সংহতির মৌল সমস্যার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : "Some of our difficulties are inherited from the past; but otherwise the result of the very progress that we are making. Therefore, I am not disheartened by them. In fact the way these difficulties are occurring is an indication that we are fighting the evils which come in our way." আসামের ভাষাসংকটও প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আজ অসমীয়া ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন যখন প্রবল, তখন এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই সংকটের সূত্রপাত ভারতে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকেই। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ বাঙলাকে ইংরেজের সান্নিধ্যে আনতে সাহায্য করে। আসামে

ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তারও প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮২৭ খৃঃ ইংরেজরা কিন্তু সরকারী শাসন ব্যবস্থা তাঁদের মতো করেই গড়ে তুললেন। তাঁরা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, তাতে এমন শিক্ষাই প্রসার করছিলেন, যা ইংলণ্ডে তখন প্রচলিত ছিল। ফলে "The well educated leaders of yesterday had become almost 'illiterate'—not knowing the language of the masters." এই নতুন শিক্ষাধারার কেন্দ্রভূমি ছিল পূর্বাঞ্চলে কলকাতা এবং দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ। কলকাতার নতুন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা দেখতে দেখতে বিহার, ওড়িশা এবং আসামে সরকারী ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজে দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়লেন। এ বিষয়ে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় বা মাদ্রাজের ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কেউই বিদেশী ছিলেন না। পুণার 'গোখলে ইনস্টিটিউট অব পলিটিকস এণ্ড ইকনমিকস'-এর ডাইরেক্টর শ্রী পি. এন. মাথুর এঁদের শ্রেণী-চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন : "a class of usurpers, who taking advantage of a foreign rule had become the *elite* undermining in turn the prestige and power of the old established classes, and thus participated in the rapacious rule of foreigner."

আসামের ঘটনা আরো কিছুটা স্বতন্ত্র। কলকাতা পূর্বাঞ্চলের হেড কোয়ার্টার্স হওয়ায় ইংরেজরা আসামে প্রথমাবস্থাতেই শিক্ষার বাহন হিসেবে বাঙলাকে চালিয়ে দেয়। বিচারালয়েও অসমীয়া ভাষার স্থান ছিল না। ১৮৭২ খৃঃ পর্যন্ত অসমীয়ার বদলে বাঙলা ভাষাই শিক্ষায়তনে, অফিস-আদালতে চলতে থাকে। তারপর অসমীয়ার ব্যবহার হতে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙলা ভাষাই একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এইভাবে ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় আসামে বাঙলাভাষা আধিপত্য বিস্তার করে। ডঃ বিরিঞ্চি বরুয়া ও ডঃ পি. ডি. গোস্বামীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "When the British set up their administrative machinery they had to import Bengali assistants and they were later (1836) instrumental in persuading the English officers to believe that Bengali was the main language while Assamese was but a patois with no literature." এ ধারণা এখনও কিছু কিছু বাঙালি গবেষকের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁরা

ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে গিয়ে অসমীয়া ও ওড়িয়াকে বাঙলার উপভাষা বলে চিহ্নিত করতে চান। ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙলা' প্রবন্ধে (দেশ, বৈশাখ ১৩৬৭) বলেছেন : "পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে অসমীয়া আর ওড়িয়াকে বাঙলার উপভাষা বলা যাইতে পারে।" এসব তথ্য ইতিহাসসম্মত নয় এবং অনেকাংশে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। অসমীয়া ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন পুরনো অসমীয়া ভাষা কামরূপের প্রাদেশিক ভাষাকে আশ্রয় করেই রচিত। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাস তাঁর 'আসামের কথা' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন : "হিউয়েন সাং বলিয়াছেন যে, কামরূপের (আসামের) ভাষা মধ্যভারতের ভাষা হইতে কিঞ্চিত পৃথক ছিল।" অসমীয়া ভাষায় পদ্য সাহিত্যের জন্ম ষষ্ঠ বা সপ্তম, কারও কারও মতে সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীতে। সেটা অভিহিত হয়ে থাকে 'গীতিযুগ' নামে। দ্বিতীয় যুগ হল 'মন্ত্র আর ভণিতার' যুগ। এই যুগেই অসমীয়া লিখিত সাহিত্যের জন্ম। পরের যুগ হল প্রাক-বৈষ্ণব যুগ। পীতাম্বর দ্বিজ, হেম সরস্বতী প্রমুখ এ যুগের খ্যাতনামা লেখক। শঙ্করদেবের কথা তো সর্বজনবিদিত। অসমীয়া ভাষায় উন্নত গদ্য দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতেই। যার উদাহরণ ভারতীয় আর কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি উক্তি থেকে জানা যায় : "Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Litimer in England." এইসব উক্তির মধ্যে কিছুটা আতিশয্য থাকলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ইংরেজদের সহযোগিতায় যখন আসামে বাঙলাভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন অসমীয়া ছিল বেশ সমৃদ্ধ। এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, আসামে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হবার আগেই শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা অসমীয়া পণ্ডিতদের দিয়ে বাইবেলের অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮১৭ খৃঃ)।

স্বাভাবিক ক্ষোভ

এই অবস্থায় অসমীয়া ভাষাকে অস্বীকার করে বাঙলাভাষাকে প্রচলন করায় অসমীয়াভাষীদের মধ্যে যদি ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকে, তাকে অযৌক্তিক বলা

যায় না। শুধু তাই নয়, সরকারী কাজকর্মে সুযোগ সুবিধা পেয়ে সেখানে বাঙালিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ইংরেজ সরকারও এ ব্যাপারে তাঁদের চিরাচরিত 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি অবলম্বন করে এ-সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বাঙালি ও অসমীয়াভাষীদের মধ্যে একটা কলহের বীজ রোপণ করে। এই বীজই আজ মহীরুহ হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে চারদিকে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো নতুন সমস্যা।

এই পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই যখন অসমীয়া ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাত হল, তা হল বাঙলা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রখ্যাত অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) 'অসমীয়া ভাষা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"কথাই কথাই অসমীয়াক 'আসামী ভূত!' নামে সম্বোধন নকরিলে তেঁওবিলাকর গা নুজুরায়।...অসম গভর্নমেণ্টর বাঙালী ভাষার ওপরত অশেষ মমতা। তার স্বাক্ষীস্বরূপে আজিলৈকে, সাপ মারি নেগুরত বিষ থৈ অনাহকত অসমত বাঙলা স্কুলবোর রাখি অসমীয়া ল'রাক বঙ্গলা শিক্ষা দিবর চেষ্টা করি অসমীয়া ভাষার আরু অসমীয়া মানুহর মহা অনিষ্ট অসম গভর্নমেণ্ট করিব লাগিছে।"

অসমীয়া ভাষার প্রতি সরকারী অবিচার এবং বাঙালিদের অনীহা কবিকে যে নিদারুণ ব্যথিত করেছিল, উপরের উক্তিটি তার প্রমাণ। সেকালের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ অসমীয়া ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানিয়েছিলেন কি না, জানা নেই। অথচ ব্রাউন, ব্রনসন প্রমুখ মিশনারীদের কেউ কেউ অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে 'অরুণোদয় সংবাদপত্র' (১৮৪৬ খৃঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। নবাগত বাঙালিদের কেউ কেউ তো এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারতেন? যাই হোক বেজবরুয়ার মতো আরো অনেক কবি-লেখককে এই পরিবেশে ব্যথিত-চিত্ত হতে দেখা গেছে। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া তাঁর 'অসম আরু বঙাল দেশ' নামক সনেটে লিখেছেন :

"কোন সরু কোন বর, দুই ভাই-ভনী,
অসম বঙাল দুয়ো যুঁজে কাল গণি।
অসম যুক্তির বলে বয়সত বর
... ...

অসম জুরুলা যেবে ভটি বয়সত,
পূর্ণ তেজে বঙ্গে আহি কয় অসমত,—
অস্তিত্ব তোমার নাই মোরে মুল-ফুটা
ধবাঁহি জীবন মোতে পরজীবী লতা।
বুরঞ্জী বুকুত ধরা হিমাদ্রি সাগরে
স্বমরি পুরণি সত্য হুমুনীয়া এরে।"

অর্থাৎ, আসাম ও বাঙলার মধ্যে কে ছোট আর কে বড়? দুজনেই দীর্ঘকাল জন্মগ্রহণ করেছে—যমজ বোন তারা। কিছু যুক্তির বলে আসাম বয়সে বড়।..আসাম যেদিন বয়সের ভাঁটায় জীর্ণ, সেদিন নবযৌবনা বাঙলা এসে আসামকে পূর্ণ তেজে বলে—'তোমার অস্তিত্ব নেই। আমার মূল নিয়ে তুমি পরজীবী লতা বেঁচে আছ। কিন্তু ইতিহাসের বুকে হিমাদ্রি সাগরে লেখা আছে পুরাতন সত্য কাহিনী—কে প্রাচীন।'

কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'জাতীয় গৌরব', ভোলানাথ দাসের 'আসামবাসী' প্রভৃতি কবিতায় অনুরূপ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, অসমীয়া ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিককালে বাঙলা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। নিজের মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অসমীয়াভাষীরাও যদি আসামে তাঁদের ভাষার যোগ্য সম্মান দাবি করেন, তাহলে তাতে আপত্তির কিছুই নেই। বিবেকবান নাগরিকরা তাকে সমর্থন জানাবেন বলেই আশা করি।

আসাম দ্বি-ভাষী রাজ্য কেন?

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য একালে পত্র-পল্লবে সুসজ্জিত। গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অসমীয়া সাহিত্য অন্যান্য উন্নত ভারতীয় সাহিত্যগুলির সমকক্ষ। কিন্তু সরকারী কাজে, শিক্ষায়তনে, অফিস-আদালতে এখনও তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যই নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্তের ভাষায়—"শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান যত ঘুচবে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রূপ ততই পরিস্ফুট হবে। সেজন্য রাজার ভাষা ও প্রজার ভাষা অভিন্ন হওয়াই বিধেয়। আমাদের বহুভাষী দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এ নীতি পালন করতে পারেন না; কিন্তু রাজ্য সরকার পারেন।" শুধু পারেন না;

মনে হয়, সেটাই একমাত্র করণীয় হওয়া কর্তব্য। কেননা, স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য কেবলমাত্র পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে নয় বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে নয়। এর জন্য চাই আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ। মানুষের মননশক্তি এবং আত্মাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে বড় করা যায় না। আর এই মননশক্তি ও আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ তো মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"A language is not like an umbrella or an overcoat that can be borrowed by unconscious or deliberate mistake ; it is like the living skin." [Creative Unity, Macmillan, London, 1922] তাই, যদি কেউ মনে করেন, ভারতবর্ষের ভাষাবিভেদ বিলুপ্তির জন্য কিছু কিছু ভাষাকে অবলুপ্ত করা দরকার বা তাদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা দরকার—তাহলে ভারতীয় ঐতিহ্যের পক্ষে তা হবে মারাত্মক।

সব প্রদেশের লোক যদি প্রাদেশিক ভাষা ও পরিচয় অস্বীকার করে কেবল মাত্র নিজেদের তারস্বরে ভারতীয় বলে চিৎকার করে তাহলেই এ ব্যাপারে সব সমাধান হয়ে যাবে, একথা চিন্তা করা ভুল। সেই ভারতীয়ত্বের পেছনে কোনো সতেজ প্রাণচেতনা লক্ষ্য করা যাবে না। "গাছের পাতা যদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল বৃহৎ কাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, তবে সে প্রাণরস আহরণ করতে না পেরে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে পড়বে।" তাই প্রতিটি ভাষাভাষী গোষ্ঠীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ-ব্যাপারে চরম সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারত-বর্ষের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ, বাঙালি, অসমীয়া, ওড়িয়া, সাঁওতালী, মণিপুরী ইত্যাদি—এঁরা নিজেদের প্রাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক সত্তার ভেতর দিয়েই সর্বভারতীয় ঐক্যবন্ধনে সংযুক্ত থাকবেন।

আসামের ক্ষেত্রে তাঁদের সার্বিক বিকাশের অন্তরায় আসামের ভাষা-সমস্যা। সেখানে অসমীয়া ভাষার একক প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয় নি। কেননা, আসাম এখনও দ্বি-ভাষিক রাজ্য। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনু-সারে সেই রাজ্যই একভাষী রাজ্য হতে পারে, যেখানে ঐ একটি ভাষায় রাজ্যের অধিবাসীদের ৭০ শতাংশ লোক কথা বলে। আসাম কিন্তু ঐ অর্থে একভাষী হতে পারে না। ১৯৩১ খৃঃ পর্যন্ত আসামে অসমীয়াভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ লাখের কিছু বেশি। ১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারী অনুযায়ী দেখা যায়, ৬৭ লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৫ জন এই ভাষায় কথা বলে। ১৯৫০-এর আদমসুমারী অনুযায়ী

এই রাজ্যের শতকরা ৫৫ জন এই ভাষায় কথা বলে। ফলে, আসাম দ্বি-ভাষিক রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। আইনসঙ্গত হলেও এ কতদূর ন্যায় সঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। এই অবস্থায় ১৯৬০ খৃঃ ২৪ অক্টোবর আসাম বিধানসভায় একক অসমীয়া বিল পাশ হয়ে যায়। তারপর ১৯৬১-র মে মাসে সংগঠিত কাছাড় এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন এবং শেষ পর্যন্ত সরকার কাছাড় জেলার জন্য বাঙলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু এতে প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধান হয় নি, সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল মাত্র। অসমীয়া ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মৌল দিকগুলির কোনো সমাধান আজও হয় নি।

অসমীয়া ভাষার গৃহভূমি

প্রতিটি ভাষার বিকাশের জন্যই তার একটি নিজস্ব গৃহভূমি অথবা সরকারী আনুকূল্য প্রয়োজন। অসমীয়া ভাষার গৃহভূমি হল আসাম। তাই অসমীয়াভাষীরা গত তিন-চার দশক ধরে পাঁচমিশালী আসাম রাজ্যকে এক অসমীয়াভাষী আসামে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আসাম রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন এবং তার প্রচেষ্টার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকের ধারণা, ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কোনো রকম বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যের দাবি তোলাই বোধহয় সংহতির পরিপন্থী। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতা লাভের পরেও দীর্ঘদিন ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে আপত্তি জানিয়েছেন। ফলে অনেক তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে এবং জাতীয় সংহতি বোধও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই তিক্ততা যেমন একদিকে সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্র ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে তেমনি একই রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেও।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু জাতিসত্তার মৌল বিকাশের জন্য সর্বভারতে প্রথম থেকেই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা বিকাশমান জাতিসত্তার স্ব-শাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্রকেও তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন এ ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তবু সুখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচলকে স্বীকার করা হয়েছে

পূর্ণরাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে এবং তার জন্য সংবিধানের কিছু অংশের সংশোধনেরও প্রয়োজন হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আসাম তার ভাষাভিত্তিক প্রদেশের মর্যাদা পায় নি। এ ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি সম্প্রদায়। আসামের এই বাঙালি সম্প্রদায় তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছেন যাঁরা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। দ্বিতীয়ভাগে আছেন যাঁরা বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে আসামে বসবাস করছেন এবং তৃতীয়ভাগে পড়েন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আগত বাঙালি সম্প্রদায়। এঁদের সংযুক্ত করে আসামকে দ্বিভাষিক রাজ্য প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়, বিশেষভাবে যখন অসমীয়াভাষীরা বিকাশমান জাতি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য সম্পাদনে অগ্রণী। তাই আসামে বসবাসকারী বাঙালি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন এবং তা একমাত্র একভাষী রাজ্য হলে সম্ভব। মনে রাখা দরকার, এ সম্প্রীতি প্রতিযোগিতার নয়, সহযোগিতার। প্রত্যেক জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্যই এটা প্রয়োজন। আর এই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত না হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নতিও পদে পদে বিঘ্নিত হবে।

সমাধানের সূত্র

যে কারণে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছিল, সেই একই কারণে বর্তমান আসামে সংখ্যাগুরু অসমীয়াভাষীদের দাবির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব ও সহানুভূতি প্রদর্শন প্রয়োজন। এ সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান এবং যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক সমাধান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙালি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাটিও সহানুভূতির সঙ্গে ভাবতে হবে। ভারতের সংবিধানে অন্যান্য রাজ্যে সংখ্যালঘুদের যে অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি আছে, আসামের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে কিছু কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলেও ভবিষ্যতে আসামে অসমীয়া ভাষার পূর্ণ মর্যাদা দিলে তা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আসামের বিশিষ্ট লেখক ও সাপ্তাহিক 'নীলাচল'-এর সম্পাদক শ্রীহোমেন বরগোহাঞি স্পষ্টতই বলেছেন, আসাম একভাষী রাজ্যে পরিণত হবার অর্থ "অবশ্যে এইটো নহয় যে অসমত কোনো অনা-অসমীয়াভাষী

মানুহ থাকিব নোপারিব বা তেঁওলোকে নিজ নিজ ভাষা-সাহিত্যর চর্চা করিব নোপারিব।” আসলে বর্তমান সমস্যাকে এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা অনুচিত। আসামের বিবেকবান অসমীয়া এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এর সমাধান খুঁজে বের করবেন।

ভাষার প্রশ্নে আসামে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে তা শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সমস্ত বিবেকবান মানুষই তার বিরুদ্ধে। অবিলম্বে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকারের এগিয়ে আসা দরকার। সেই সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে ভাষা-সংকটের একটা স্থায়ী সমাধান। আর সে ব্যাপারে অসমীয়াভাষীদের ন্যায়সঙ্গত যুক্তিপূর্ণ দাবির প্রতিও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। ভাষাগত গোঁড়ামিকে দূরে রেখে বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক উপায়েই নির্ধারণ করতে হবে এই জটিল সংকটের সমাধান-সূত্র।

[ভারতের মতো বিরাট ও বহুভাষী রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতিবিরোধী আঞ্চলিকতাসর্বস্ব উত্তেজনা মাঝে মাঝেই ফেটে পড়ছে। বিশেষত আসামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতির বোধকেই বিপন্ন করে তুলেছে। গণতন্ত্র ও মানবিকতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি ও ব্যক্তিবর্গ এই অবস্থায় নীরব থাকতে পারেন না।

বিশেষত, কেন্দ্রের শাসন-কর্তৃপক্ষ যখন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন : আসামের ভাষাদাঙ্গার পেছনে সি. আই. এ-র হাত আছে, তখন দেশপ্রেমিক মাত্রকেই অধিকতর সতর্ক হতে হয়। তাছাড়া, বাঙলাদেশ থেকে পলাতক রাজাকাররা আসামের দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছে—এ তথ্যও তো আর গোপন নেই।

আমরা আশা করি আসাম সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রতিকারে এগিয়ে আসবেন। সংখ্যাগুরুদের জাতীয় আকাংক্ষাকে যথোচিত মর্যাদা দান এবং সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করেই জাতীয় সংহতির ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস এই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে পাঠকরা দায়িত্ববান আলোচনায় অগ্রসর হবেন। —সম্পাদক]

তোমার ত্রিশূল কেন

শান্তিকুমার ঘোষ

তোমার ত্রিশূল কেন গুরুভার হয় :
আমি যত উঠি পাকদণ্ডী বেয়ে
সমুদ্রের পৃষ্ঠ হতে ওই উর্ধ্বলোকে,
পাহাড়তলীর গাঁও থেকে শিখরের চামুণ্ডা মন্দিরে,
কেন হয়ে ওঠে তীক্ষ্নমুখ···

সকালে শিশির লেগে খেলছিল খুশি—
শিশুর হাসির দ্যুতি ধাতুতে ঠিকরে,
নন্দনকানন হতে বয়েছে বাতাস।

এখন দিবস শেষ :
ত্রিফলকে উথলায় দুঃখের সাগর ;
আমি নুয়ে পড়ি···যেন ভেঙে যাব
এই বোঝা ব'য়ে···

আঁধারে সজীব হবে অস্ত্র কি তোমার—
বিবেকবিহীন খল করবে সে আমাকে হনন।

উদ্যোগপর্ব

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সেদিন আকাশে পাখি ছিল না, প্রখর মৌসুমীঅঞ্চলে কোনো
গান ছিল না, নদীতে ছিল না জল,
কর্কটক্রান্তির সমান্তরাল আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল কাতার-ছেঁড়া কাক,
তাদের ক্ষুধার্ত চীৎকারে শহরের হৃদপিণ্ডগুলি ছিল বিরক্ত, উদ্বিগ্ন।

অফিস-ফেরৎ মানুষেরা স্টেশানের কাঠের পুল থেকে গড়িয়ে
নেমে আসছে,
উত্তর-গোগৃহ থেকে পলাতক, বেইজ্জত সেনাপতিদের মতো।

পাট যেখানে চটে পরিণত হয় সেখানেই অতি সূক্ষ্ম আঁশ এবং যক্ষ্মার
জীবাণুদুষ্ট রক্তের কোলাহল—গামছার কোণায় বাঁধা ছাতু পেঁয়াজ এবং
কাঁচা লঙ্কায় যে এক পলকের ছুটি তাই সম্বল ক'রে
টিকিট ঘরের সামনে গোল হয়ে ভীড় ক'রে দেখছে—

সাজানো কনের পাশে বর।

সিল্কের পাঞ্জাবির নিচে পরিপুষ্ট কলেবর, হাতে টোপর, পায়ের কাছে
ফুল-আঁকা টিনের বাক্স; কিন্তু গাঁটছড়া-বাঁধা কনের দেহে
বিন্দুমাত্র শরীর ছিল না, ছিল গভীর টানা-টানা দুটি চোখ—
চন্দনের ফোঁটায় অন্যমনস্ক দিনান্ত, পাশে রজনীগন্ধার মালা গলায়
তার স্বামী, অন্ধ।

দমবন্ধ ভীড়ের মধ্যে কারো কারো মনে ভেসে ওঠে মাংসের গরম
ঝোলের মধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছে ঘন দৈ, কেউ কেউ আপনমনে
ঠাণ্ডা লুচি সরিয়ে রেখে ঘি-ভাত থেকে বাছাই করে আস্ত এলাচ,
লবঙ্গ, দারুচিনির টুকরো; কেউ বিভোর হয়ে আসে বিস্‌মিল্লার
রেকর্ডে, কেউ বা স্বপ্নে চোয়ানো ঢেকুরের আড়ালে দ্বিতীয় পানটির
জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে—
মেয়েটি সুখী হবে তো? আর সেই ফাঁকে, সকালবেলায় যেখানে
মালগাড়ি উল্টে গিয়েছিল—সেই ইয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে
বিদ্যুতের করাতের নীচে চিরে যাচ্ছে আলকাতরার মতো আশঙ্কার কঠিন সমুদ্র।

সারাদিন আগুনের হলকায় যখন ইন্দ্রপ্রস্থের দোকানপাট কীটপতঙ্গ
জড়োয়া অলঙ্কার বিদুরের দূরদর্শিতা নিপুণভাবে সিদ্ধ হয়—
জিভ-ঝুলে-পড়া মানব যখন নিজের ছায়ার মধ্যে হাঁপায়
শাক-পাতা কুড়িয়ে যখন নুনের সন্ধানে বের হয়, তখন সেই

বধির বায়ুমণ্ডলের চণ্ড চাপে, সম্প্রসারিত সামন্তবর্গের থাবার মধ্যে
দেখি, ঘর্মাক্ত ধৃতরাষ্ট্রের পাশে আয়তচক্ষু এই অকূল গান্ধারী—
আমার ভারতবর্ষকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্মান্ধ পরিচালক,
প্রকল্প রচয়িতা এবং নায়ক, পশ্চাতে রয়েছে চর্বনীয় যামিনীর
দাঁতাল শিবাকুল ; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখব এই দৃষ্টিহীন,
পরান্নপ্রতিপালিত, স্বৈরতন্ত্রী, নির্বোধ, মূর্তিমান কাপট্যকে—
সঞ্জয়ের সামনে অসহায় উপবিষ্ট, নিঃসন্তান—চোখের
বিশ্রী কোটরে জেগে থাকবে ভগ্নজানু মীমাংসা—এক উৎপাটিত মহাতামসরজনী।

দেখব দিকদিগন্ত থেকে নির্বাপিত কুরুক্ষেত্রে নেমে আসছে
তরল গহন রাত্রি—হাজার হাজার মশাল, ছিন্নমুণ্ড, টুকরো টুকরো
দলিলপত্র এবং কঙ্কালের অট্টধ্বনির অন্তরালে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে
সুদূর অগ্নিশিখা, আর মাইলের পর মাইল ঢেউয়ের মতো ফসলের ফেনার উপরে
জেগে উঠছে সিন্ধু-ভৈরব আকাশ এবং পাখিদের স্বাধীন তল্লাস এবং
মানুষের শুধু মানুষের কেবল মানুষের, অনন্ত বিশাল বিকাশমান মানুষের
চক্ষুষ্মান জাগরণ।

১৯৭১ : পশ্চিম বাঙলার চোখে বাঙলাদেশ

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন কুটিল স্রোত, তখন প্রবল বন্যা এল
যখন ভীরুর মতো গুপ্ত হত্যা, সূর্যালোকে তখন হত্যার দীপ্ত গতি
যখন রাস্তায় চলতে ভয় পাই, প্রত্যেককে সন্দেহ করি প্রত্যেকটি মানুষ
তখন সন্দেহহীন একসাথে মারতে অগ্রসর
মরতে চলে যাই,
যত না মানুষ আছে তত ছাপ যখন শরীরে
তখন একটি ছাপ সবার শরীরে
স্পষ্ট চিনে নেওয়া শত্রু-চোখ-মুখ
পথ খুঁজে বার করতে যখন করি না শ্রম, মতান্তর হলেই খতম
সম্প্রদায়ই যখন চরম সত্য, দেশের চেয়েও সত্য

তখন পতাকা উড়ল, এক বছরে এক হাজার শহীদের মিথ্যা নাম
যখন পেটালো ঢাক দমাদ্দম—
সঙ্গীহীন নিষ্প্রভ শীতল মৃত্যু যখন ছিটোলো চারিদিকে—
তখন সাত দিনে মরল সাত লক্ষ বুকের ওপরে বুক তার
গায়ের ওপরে তার গা চলানো, একই সাথে কাৎ হওয়া ঘাড়
সাংবাৎসরিক মেলা! সে সময়ই মরণের দেশজোড়া উৎসব-সম্ভার।

আমার শরীর ঘিরে শেষ স্বপ্ন

শান্তনু দাস

সেই পাখি:
গুরুদেব,
তুমি আমায় তীর ছুঁড়তে শিখিয়েছ;
আজ ধনুকে টঙ্কার দিলে কাঁপে ত্রিভুবন,
অথচ সে লক্ষ্য তাকে দিলে না
কখনো।

সেই পাখি:
গায়ে যার বর্ষার আকাশ, ঠোঁটে যার বনজ শিশির,
যার গান সমুদ্রের নীল থেকে পাহাড় চূড়োয়
প্রতিধ্বনি।
তাকে তুমি চেনাতে পারো নি গুরুদেব।
আমার ধনুকে ছাখো বিষ তীর
হাতের ছিলায় জমা রক্ত,
কপালে আঁকড়ে থাকে সহস্র যোজন মাইল
ছুটে আসা ঘাম,
তাকে তুমি দিলে বাতিদান
অথচ এ ঝড় থামালে না।

সেই পাখি:
আমার শরীর জুড়ে শেষ স্বপ্ন আবহমানের॥

ওর মুখ

রুদ্রেন্দু সরকার

রাত্রে ঘুমের ঘোরে
কুয়াশার মতো নেমে আসে ওর মুখ
সূর্যের উত্তাপে আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়
সকালবেলায়,
পুবের জানালা দিয়ে ক্যালেণ্ডারের
পাতা ওল্টাবার হাওয়া ঢোকে
কত রাতের বাসি জ্বর গায়ে
মৃদু কাঁপুনি লাগে।

রাতটারই বোধহয় যৌবন ছিল
কি জানি…
কুয়াশার মতো নেমে এসেছিল ওর মুখ

স্মৃতি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মরচে-পড়া কাঁটাতারের ওপারে ভাঙা ব্যারাক
পরিত্যক্ত সামরিক এরোড্রাম, রানওয়ে—
উঠে গেছে পিচ, আজ
আগাছায় ভরে আছে ঘাসের জঙ্গল।

পল্টনছাউনির স্মৃতি, এই সেই পুকুরপাড়
যে ঠিকাদার মাংস যোগাতেন প্রতিদিন
এখানে কাটতেন খাসি পাঁঠা
ঘাস ভিজে যেত রক্তে

ভাঙা সামরিক ট্রাক আজ কার লাউমাচা !
গ্রামের মানুষ, ব্যারাকের ইঁট খুলে কে বানাও ঘরবাড়ি !
আজ কোন্ সে রাখাল গরুদের নিয়ে যাও রোজ
আগাছায় ভরা ওই ঘাসের জঙ্গলে।

জনান্তিকেই

স্থমিত চক্রবর্তী

অন্ধকারের স্পর্শে ছিল আত্মীয়তা
শ্রাবণ মেঘের দ্যুতি হঠাৎ চোখ ধাঁধালো
পথ হারাল সহস্র প্রাণ : ছন্নছাড়া।

অথচ ঐ আলোর পথেই যাত্রা-শপথ
জন্মাবধি। নিষ্প্রদীপের আবেশ ছেঁড়াই
একাগ্র-পণ। লক্ষ্য গভীর সূর্যালোকেই।

কিন্তু যখন বর্ষা এল অমানিশায়
বন্যাস্রোতে ভাসিয়ে নিল লক্ষ জীবন
গ্রাম-শহরে বুক গলা জল, মৃত্যুশীতল

হঠাৎ তখন বজ্রশিখায় হারিয়ে গেল
প্রভাত-দিশা। অঙ্গীকারে ধরল ফাটল।
অগ্রে-পিছে জন্ম নিল অন্ধ কারা।

বিবিক্ত সেই মানুষগুলো বিস্মৃত আজ :
খুঁজতে হবে উৎস আলোর জনান্তিকেই।

লাল শালুকের ফুল

কমল চক্রবর্তী

লাল শালুকের ফুল বন্ধু আন্ধার রাতে ফুটে গো...

আধার রাতে ডেপচুর মতো লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে সোহাগী টুরী
আধার রাতে কচরা তেলের প্রদীপ জ্বলছে
কুমারী নদীতে সিনান করলে সব খতম
টেরাকের ধুলা, বাজারী সরাব
ভুরকু ফুলে বনডি, ছোলাডি সাজবে, রাম সিঙায় টংগে আগুন
ভেলা, কচড়া পাতা, চিহরলতার জাল বুনছে দাসু কয়াল
মৃংগা ভাজি গরম ভাত

অনেক রাইত হইল টুরী, ঘুমা
কুকড়া ডাকছে, মৃংগা ফুল ফুটছে
সাঁঝ না অনেক রাত, কুমারী নদীর জলে টুরী ঘুমিয়ে আছে
বনডি, চিহর লতায় ফুল
রনকুন মায়ের কসম কালু, কেঁড্রিটা টুকু বন্ধ কর
লালটিন বুতাই দে
নদীগুলি লুকিয়ে সৌরভ নিতে এসেছে
সাবুই ঘাসের বনে শিহরণ,
জানলায় বন্‌কাড়া না আন্ধার, ফুল না হরিণ
লাল শালুকের ফুল বন্ধু আন্ধার রাইতে ফুটে গো···

বিয়ান হলেই টেরাক আসবে, টেরাক আইলেই
গানা-বাজানা-খানা-পিনা
দূর বাজারে সর্দারের দোকান, সরাব আছে, পয়সা আছে...

তিনটি কবিতা

চিত্তরঞ্জন পাল

অভিনয়

কথা শুধু কথা—শব্দ। জনসঙ্ঘে প্রচণ্ড কথার
প্রতিপাদ্য—আত্মরতি। ভেকধারী সব অভিনেতার
প্রদর্শনী স্বার্থবৃত্ত। যে-মুখোশে স্বদেশী নিশানা,
মুখে তার কদর্যতা কোনোমতে ঢাকে না চুণকাম—
রন্ধ্রপথে দুষ্টগন্ধ বিষাক্ত হাওয়ায়। আরও নানা
বেয়াড়া বাচাল কণ্ঠে বে-শরম বৃহত্ত্বের নাম।
কালচারের কলাবৃদ্ধি, ঐতিহ্যও বাড়ন্ত সম্প্রতি—
নরকের ঘৃণ্য কীট মুক্তিভাষে সাজে বৃহস্পতি।

স্বপ্ন-সরণীতে ঘোরে কুবেরের রথের ঘর্ঘর;
মর্মে ঘোরে চক্রনেমী—স্বার্থ-ঘোরে চিত্ত উপবাসী;
অতৃপ্তি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র কামনার কামড়ে জর্জর—
শিকারে অকুতোভয়, দাঁতে ছেঁড়ে সুন্দরের হাসি।
প্রপিতামহিক পুণ্যে রঙ্গমঞ্চে নাচি-হাসি-কাঁদি;
অভিনয়ে পালা জোর, যবনিকা-অন্তরালে আঁধি।

পঙ্গু

পঙ্গু সে যে দেহে-মনে। বাইরে যে অসীম আকাশ
উধাও অনন্ত শূন্যে, সে তো তার পায় না আভাস
কোনো। জানালায় পথ চেয়ে চেয়ে তুচ্ছের সোহাগে
দেখে ওড়ে প্রজাপতি, পাখি গায়; প্যাঁচার সংরাগে
কাঁপে না কি সন্ধ্যাতারা! সংকুচিত সত্তার পরিধি
রক্তের দোলায় নাচে। পাণ্ডুলিপি রচে যথাবিধি
তুচ্ছতার ইতিবৃত্ত। বন্ধুবর্গ আসে বার্তা নিয়ে
বহমান বাস্তবের। যন্ত্রণায় শরীর বিষিয়ে

উগ্র হলাহল কণ্ঠে ঢালে খর্ব অস্তিত্বের ক্ষুধা।
সংক্রামক বিকারের কারাগারে স্বপ্নের বসুধা
ক্রমশ সংকীর্ণ হয়। বেত্রাহত যৌবনের জ্বালা
মর্মান্তিক। দ্বিধাগ্রস্ত বাসনায় ব্যাপ্তির পেয়ালা
নীরব, অদৃশ্য, গুপ্ত—বুকে তার জমে শুধু ফাঁকি;
সংসারের কোলাহলে কাঁদে সে যে একান্তে একাকী।

মৃত্যুঞ্জয়

মরুর মারে মরি না। কাঁটা চলার পথে কীর্ণ।
রক্ত-রাঙা আলপনা যায় ধূসর ধূলায় শুকিয়ে।
পাথর কেটে চড়াই ভেঙে পথিক পোষাক জীর্ণ
কঠিন শীতে। তপন-তাপও বক্ষে রাখি লুকিয়ে।
মানস-মুকুল ঝরছে মনে। কূল-ভাসানো বন্যায়
হাল ভেঙেছে পাল ছিঁড়েছে—বাঁচার বিপুল চেষ্টায়
বেয়েছি সেই ঝড়ের খেয়া। চাবুক-মারা অন্যায়
ঘর ভেঙেছে—ভিটেয় ঘুঘু চরছে তবু শেষটায়।

আশার রঙে এঁকেছি যারে রুক্ষদিনের বৃন্তে,
স্বপ্ন-আলোয় সাজাতে যারে চেয়েছি সুরে ছন্দে,
দুঃখ-দাহে শুকিয়েছে সে, বুক ফাটে রূপ চিনতে—
রুগণ শিশুর জীবন জুড়ে আঘাত প্রতিবন্ধে।

উপল-কূলে আছাড় খেয়ে সাগর রচে তর্জা—
গভীর-মূল যন্ত্রণার শিকড়ে প্রাণচর্যা।

* সম্প্রতি-প্রয়াত কবির এই তিনটি কবিতা আমাদের দপ্তরে জমা ছিল।—সম্পাদক

মকরমুখী

আবুবকর সিদ্দিক

কি চাও তুমি দেখাতে খণ্ড খণ্ড চোখের অভ্যেসে ?
কি গড়ো অখাদ্য মণ্ড পণ্ড পণ্ড ভাঙচুর দিয়ে ?
শালীনতা লাগল না উদোম বাদার আদিমে
কামরূপী রাতে গেল ভিজে গলে মৌয়ালীর ভাণ্ড,
ন্যাতাকানি পোছা বাছা খুঁজে ফেরে বিনষ্ট পৌরুষ
বংশীবট ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু বাতাস ডেকেছে,
বাতাসের বলে তুমি ছুটে এসে ধরে ফেলতে পারো
মকর গলুই। কেউ ঘড়ি ধরে বসে নেই তোমার আশায়
রোদের আঁচটা জল হিম কিছুই লাগাবে না
অথচ সবটা চাও ফলাতে হে ; এ সব ভণ্ডামি
কোনো কাউন্টারে জমা নেবে মনে হয় না এখন আর।
একবার মিশে দ্যাখো মানুষের নোনা গায়ে গায়ে
কানাকড়ি যা-ই জোটে হারলেও সই।

সাবধান

কায়সুল হক

বুকের ভিতরে ভয় পুষে কোনো বড়ো কাজ কখনো হয় না ;
আবার অন্যের স্বাধিকার
অস্বীকার করলে ফ্যাসিস্ট আখ্যা পেতে হয় ;
দ্রুত পা মেলাও সেই তাদের সঙ্গে যারা
জয় করতে চলেছে ভয় ;
খুব সাবধান, সংগ্রামের নামে যেন
ফ্যাসিস্টদের দলে নাম লিখিও না !

আফ্রিকার ইতিবাহিত কবিতা

অনুবাদ: পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

১ মিশর থেকে

মৃত্যু কমল

পূত পদ্ম আমি
ফুটেছি দিগন্তে
জন্মেছি সূর্যের নাসারন্ধ্রে
আমি সেই পূত পদ্ম
ফুটেছি মাটিতে॥

২ ঘানা থেকে

ব্রহ্মাণ্ড পতি

নদী পেরিয়ে চ'লে গিয়েছে লম্বা সড়ক।
না—সড়ক ফুঁড়েই চ'লে গিয়েছে নদী?
কোনটা ঠিক?
সড়ককে হয় সারাতে, সড়ককে হয় বানাতে।
নদীকে পাই খুঁজে, নদী যায় না বুঁজে।
কালের প্রত্যূষে
ব্রহ্মাণ্ডপতির হাতে নদীর সৃষ্টি॥

৩ নাইজেরিয়া থেকে

তিন বন্ধু

তিন বন্ধু।
একজন বললে আমাকে মাদুরে শুতে,
আর-জন বললে আমাকে মাটিতে শুতে,
আর-একজন বললে তার বুকের উপর শুতে।

আমি শুনলাম তার বুকে :
দেখলাম, ভেসে চলেছি এক নদীর স্রোতে।
দেখলাম নদীর রাজা, দেখলাম সূর্যের রাজা।
আর দেখলাম সারি সারি তালগাছ ঐ দেশে
গুচ্ছ গুচ্ছ সুডোল ফল মাথায়।
ফলের ভারে গাছগুলি পড়েছে নুয়ে
দারুন ভারে গাছগুলি গেছে ম'রে ॥

[প্রথম কবিতাটির জর্মন মূল Bertus Aafjes-কর্তৃক উপস্থাপিত (Der Blinde Harfner)। দ্বিতীয় কবিতাটি আকান ভাষায় kwabena Nketia-কর্তৃক সংগৃহীত (Black Orpheus : 3-এ প্রকাশিত ইংরেজি তর্জমা)। তৃতীয় কবিতাটির মূল য়োরোবা ভাষা—Bakare Gbadamosi এবং Ulli Beier-কর্তৃক সংগৃহীত (ইংরেজি তর্জমা)। তিনটি কবিতাই Ulli Beier-সম্পাদিত কেম্বিজ-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত 'আফ্রিকান পোয়েট্রি' (১৯৬৬) গ্রন্থে সংকলিত আছে। —অনুবাদক]

'বঙ্গদর্শন'-এর বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালি রেনেসাঁস

নির্মল ঘোষ

বাঙলার সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশনা শুধুমাত্র ১৮৭২ সালের একমাত্র উল্লেখ্য ঘটনা নয়, তাৎপর্যের গুরুত্বে এর ভূমিকা একটি যুগ প্রবর্তনার মূল্যমানে বিচার্য। এ-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের আবেগধর্মী মন্তব্যগুলিতে যে সমকালীন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ[১] তার ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার না করেও বলা চলে যে তিনি সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডের যৌন পটভূমিকাকে এড়িয়ে কেবলমাত্র উপরিতলের বিষয়াবলীতেই মগ্ন ছিলেন। কার্যত এ-কারণেই তাঁর বিবেচনায় বাঙলার রেনেসাঁসে রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র একই আন্দোলনের অংশভাক্ দুটি সমধর্মী চরিত্র মাত্র এবং উনিশ শতকের সমগ্র পটভূমির মৌলিক দ্বন্দ্ব নিতান্তই জড় অস্তিত্বে অনাবিষ্কৃত থাকে। তদুপরি personality বা ব্যক্তিত্বের দিকটিও—যা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্যে প্রাথমিক স্তরেই বিচার্য—অস্বীকৃত হয় অমনস্ক ঔদাসীন্যে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যে একক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড যে একটি সমাজব্যবস্থা ও আর্থনীতিক সম্পর্কের সঙ্গে যৌন বন্ধনে আবদ্ধ এবং উক্ত ব্যবস্থার প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংগে সমস্তরে চলমান, এ-তত্ত্ব অস্বীকার করলে তাঁর মানবিক অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে মার্কস-এর দ্বারস্থ না হয়েও সম্ভবত মেনে নেওয়া চলে যে, এক আর্থনীতিক পালা বদলের সীমান্তে যখন এদেশীয় প্রগতিবাদীরা ভাববাদের চোরাবালিতে আশ্রয় খুঁজছিলেন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ব্রাহ্ম সমাজ তার প্রাক্তন ভূমিকা থেকে নির্বাসনের পথে এবং আর্য সমাজ প্রায় দিশেহারা, সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নব্য-হিন্দুবাদের (neo-Hinduism) আবির্ভাবকাল মুখ্যত সূচিত হল ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশে এবং সেই আন্দোলনেরই অগ্রগতি প্রকৃত প্রস্তাবে জন্ম দিল একজন বঙ্কিমচন্দ্রের। এবং তিনিই "openly attempted a re-examination, a re-interpretation and a re-adjustment of our old theology and ethics in the light of the most advanced modern thought and in accordance with the rules of

literary criticism and scriptural interpretaion that had been so powerfully influencing current religious life and thought in Christendom itself."[২] অবশ্যই এমত বিচারে ব্যক্তির ভূমিকাকে সম্পূর্ণত নস্যাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং কেবলমাত্র বিশেষ সামাজিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থাই যে একজন মনীষার জন্মের পক্ষে যথেষ্ট, এ-তত্ত্বও নিতান্ত একপেশে মূর্খতা। পক্ষান্তরে, সূত্র হিসাবেই স্বীকার্য যে, মনীষার চিন্তাচর্চার প্রকাশই কেবলমাত্র সামাজিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে যুক্ত এমন নয়, সেই সঙ্গে যে উপায়ের সাহায্যে তিনি সামাজিক হন সে উপায়ও অবশ্যই সামাজিক। এবং এ-তত্ত্বের প্রয়োগে কেবল যে মার্কসবাদী কড্‌ওয়েল তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করেন তাই নয়, সংস্কৃত আলংকারিকেরাও বিভাবাদির তত্ত্বে এরই সমধর্মা। কার্যত এ-কারণেই নিতান্ত নাস্তিক্য ছাড়া 'বঙ্গদর্শন'-এর ভূমিকা বিচারে তার পশ্চাৎপট বিবেচনার দায়িত্ব অস্বীকার পাপাচরণেরই নামান্তর।

সাধারণভাবে এই শতকের যে চেহারাটা মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : "The British were the first conquerors superior, and therefore inaccessible to Hindu civilisation. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native society. The historic pages of their rule in India report hardly anything beyond that destruction."[৩] উক্ত ধ্বংসসাধনের ফলবশত এদেশীয় কৃষিব্যবস্থার ওপর যে অসহনীয় বোঝা চাপল তা মূখ্যত সমস্ত সামাজিক অস্তিত্বের ভিতটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। তদুপরি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-র ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "বঙ্গদেশে অধঃপাতের চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত"[৪] পাকা হল। শোষণের চেহারাটা তখন সামাজিক ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য এবং সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রবাদের উত্থানপর্বের প্রারম্ভও কিছু অস্পষ্ট রইল না। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ ভারতবর্ষে তখন দ্বৈত ভূমিকায় সমাসীন এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর সমস্তরে তারা এদেশে "laying the material foundations of western society"[৫], সেহেতু সমকালীন জাতীয়তাবাদীরাও তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি জেহাদ ঘোষণায় নিঃসংশয় হতে অপারগ ছিলেন ; পক্ষান্তরে তাঁরা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও শোষণের চেহারাটা শাসকশ্রেণীকে জ্ঞাত করাতেই অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৬] প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ্য, ১৮৭০

সালের ২৭ জুলাই লণ্ডনের Society of Arts-এ দাদাভাই নৌরজীর বিখ্যাত বক্তৃতা 'The wants and Means of India'। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৮৫৭-৫৯ সালের উত্তর ভারতের গণ-অভ্যুত্থান এবং জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর বিক্ষোভ কিছু অগোচর রইল না ; ১৮৫৯-এ Bengal Tenancy Act পাশ হল। এই সময়ের এক সরকারী রিপোর্টে পূর্ব বাঙলা প্রসঙ্গে বলা হয়, a "class of petty cultivating proprietors" determined "to hold their own."[৭] সমকালের এই পটভূমিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা প্রায় উভয়সঙ্কটের মধ্যে দোলায়িত ছিলেন ; কারণ একদিকে কৃষকের বিরুদ্ধে জমিদারশ্রেণীর অত্যাচারের প্রতিপক্ষে সামিল না হবার কোনো যৌক্তিকতা তাদের ছিল না, অন্যপক্ষে জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদেও তাদের ঐকমত্য হওয়া ছিল অসম্ভব ; কেন না তাহলে জাতীয় আন্দোলন উক্ত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মৃত্যুমুখী হবার সম্ভাবনা এবং যে জমি ছিল তখনও পর্যন্ত সরাসরি ইংরেজ শোষণের আওতার বাইরে, তারও সে আওতায় যাবার আর কোনো বাধা থাকবে না। এমতাবস্থায় তারা যে দ্বন্দ্বের মুখোমুখী হলেন তারই যথার্থ প্রকাশ আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' নামীয় রচনায়। প্রাসঙ্গিকভাবে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষে প্রকাশিত প্রথমোক্ত রচনা থেকে দুটি অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

(ক) "জমীদারদিগের সকলপ্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্বত্র এক নিয়ম নহে ; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে ; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন আদায় করেন।"

(খ) "সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে।...আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে কখনও বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে।...যাহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী।" ইত্যাদি।

এই প্রকার দ্বিমুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক তাঁর 'সাম্য'-বিষয়ক রচনাবলীও এবং যা প্রকৃত প্রস্তাবে সমকালীন চিন্তাসূত্রেরই ফলাফল। বিষয়টির যাথার্থ্য বিবেচনার্থে উল্লেখ করা যেতে পারে একটি প্রখ্যাত সংবাদপত্রের ২০ জানুয়ারি

১৮৭১-এ লিখিত সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ : "It is known and universally admitted that as a class they [the Zamindars] do not deserve well of their countrymen, the greater number of them being unenterprising, idle, weak, and ignorant, oppressive and selfish. We know too that they squander away annually vast sums of money alter frivolous and mischievous pursuits which [money] morally belong to the Ryots, and that the ruin of some of them would liberate millions of Ryots from a semi-bondage |" এবং উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত সমস্যাবলীর আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল "Let the people have first some control over the Finances of the country and then we shall oppose with all our heart a soul a settlement which we are at present constrained to support,"[৮] এবং এ-প্রসঙ্গে আমি 'Bangavasi'-র ৩০ অক্টোবর ১৮৯১, 'Mahratta'-র ২১ অক্টোবর ১৮৮৩ ও 'Amrita Bazar Patrika'-র ৮ জানুয়ারি ১৮৮৫-এর সম্পাদকীয়গুলির বক্তব্যের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে ইচ্ছুক। এই সামাজিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বিচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' প্রভৃতি রচনাবলী এবং পরিপ্রেক্ষিত বিচার না করে তাঁকে প্রগতিশীল,প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিতিকরণে মার্কসবাদের গৌরব সূচিত হয় না বরং সমকালীন আন্দোলনের বিভ্রান্তিই প্রকটিত হয়। সম্প্রতি নারায়ণ চৌধুরী লিখিত 'মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র' এমনই একটি অবৈজ্ঞানিকতার উদাহরণ।[৯] তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য এখন তো শিশুদেরও গোচর!

দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় সমকালীন সাহিত্যিক পটভূমি। ১৮৪৩-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র জন্মলগ্ন থেকে ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশনা পর্যন্ত সময়কালকে আধুনিক বাঙলা গদ্যের ইতিহাসের 'তত্ত্ববোধিনী-যুগ' নামে অভিহিত করেছেন জনৈক প্রখ্যাত অধ্যাপক।[১০] অনস্বীকার্য যে মৌলিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় পত্রিকাই একই রেনেসাঁসের ফলশ্রুতি এবং অঙ্গীকার; একই আত্মচেতনার দায়িত্বে সমর্পিতপ্রাণ। উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'তত্ত্ববোধিনী'-র সংগ্রাম সমকালীন খ্রীষ্টীয় অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের প্রতিবাদী সত্তার সাহিত্যিক ভাষ্যমাত্র;

এমত বিবেচনায় উক্তের ভূমিকাকে তার সর্বৈব গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দেওয়া চলে না ; কারণ উক্তের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও যথার্থ উদ্বোধন। এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এর সংযুক্তিকরণে এদেশীয় চিন্তামানসে যে আত্মসমীক্ষার উদ্বোধন, ভারতীয় রেনেসাঁসে তার মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত তথ্য হিসাবে উল্লেখ্য 'বঙ্গদর্শন-এর পূর্বকালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার বিষয়টি। 'দিগ্‌দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন' এই ১৮১৮ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত মুখ্যত উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকাগুলি যথাক্রমে মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), রামমোহন ও ভবানীচরণের 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) প্রভৃতি।[১১] সাহিত্যিক মানদণ্ডে যদিচ এই প্রাথমিক পত্রিকাগুলিকে নস্যাৎ করা চলে তথাপি এদেশীয় নবজাগরণের প্রেক্ষিতে এগুলির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছাড়া অন্যান্যগুলি মুখ্যত তাদের সাংবাদিক দায়িত্ব পালন করেছে এবং এদের সচেতন সমালোচনায় উদ্বোধিত হয়েছে এদেশীয় গণমানস এক গভীর ও গুরুতর আত্ম-সমীক্ষায়। এবং এই আত্মপরিচয়লাভই পরবর্তীকালের বঙ্কিমচৈতন্যের ভিত্তি-ভূমি।

'বঙ্গদর্শন'-এর কীর্তিতে বিমূঢ় রবীন্দ্রনাথ যদিচ উক্ত পত্রপত্রিকার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী ছিলেন এবং 'উচ্চনীচ' ভেদাভেদে চিহ্নিত করেছেন[১২] তথাপি 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রাক্-পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনবোধের বিকাশে উক্তের তাৎপর্যকে অস্বীকার অনৈতিহাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এমতপ্রকার অস্বীকৃতিকে প্রশ্রয় দেন নি ; তাঁর নিজের ভাষায়, "দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।...ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী।"[১৩] অন্যত্র ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি।"[১৪] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিষয়ে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "যে সকল বিষয় লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন

সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।" এবং "তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।[১৫] প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে 'লোকহিতকর' শব্দটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই, যা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রেরও আদর্শরূপে মান্য। এবং কার্যত এই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনিই এদেশের প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি সামাজিক অগ্রগতির বিষয়ে মৌলিক প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেন। বুর্জোয়া প্রগতির যাবতীয় লক্ষণকে তিনি প্রথম তার স্বরূপে চিহ্নিত করে এদেশীয় চিন্তারাজ্যে নবযুগের সূচনা বহন করে আনেন। প্রখ্যাত রুশ ভারততত্ত্ববিদ্ কোমারভ-এর ভাষ্যে "He was the first in India to raise an essential question of the social development—who did benefit by the bourgeois progress? And he showed the fruits of this progress were appropriated by a small exploiting minority."[১৬]

তৃতীয়ত: ইয়োরোপের রেনেসাঁসের আত্মদর্শন ও জাতীয়তাবাদের চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রেক্ষিত হিসাবে এর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাই এই রেনেসাঁসের ফললাভ নয়, সেই সঙ্গে এর মধ্য দিয়েই ইয়োরোপ একদিকে বিশ্বজগত ও অন্যদিকে মানব-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে।[১৭] কাসিরের ধারণা অনুযায়ী, "The man of the Renaissance possesses definite characteristic properties which clearly distinguish him from 'the man of the middle ages'. He is characterised by his joy in the senses, his self containedness for the world of form, his individualism, his paganism, his amoralism."[১৮] প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মানসিকভাবে যে গভীর যোগাযোগের সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন ব্যক্তিগত চর্চায়,[১৯] তার পরিণামে আত্ম-আবিষ্কারে ও যুক্তিবাদী মননে তিনি যে কেবল তাঁর পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণে বিরত থাকেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তারই সমকালীন বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের থেকে দূরত্বে সরে আসেন, যাঁরা তখনো পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রগতিকেই একমাত্র

সত্য বলে মেনেছিলেন। তদুপরি উক্ত ইতিহাস চর্চা থেকেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জাতীয় ভাষার উদ্বোধন ভিন্ন জাতীয়চেতনার যথার্থ জন্ম অসম্ভব। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'য় তাঁর উক্তি এখানে লক্ষণীয়: "আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"[১৯] ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্বোধনে ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে বিষয়টি যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল তার অন্য উদাহরণ মেলে ৩১ মার্চ, ১৮৭০-এ Bengal Social Science Association-এ পঠিত তাঁর 'A populer Literature for Bengal' নামীয় রচনায়: "We Bengalis are strangely apt to forget that it is only through Bengali that the people can be moved. We preach in English and harangue in English and write in English, perfectly forgetful that the great masses, whom it is absolutely necessary to move in order to carry out any great project of social reform, remain stone-deaf to all our eloquence. To me it seems that single great idea, communicated to the people of Bengal in their own language, circulated among them in the language that alone touches their hearts, vivifying and permeating the conceptions of ranks, will work out grander results than all that our all English speeches and preachings will ever be able to achieve.'[২০] এবং অনস্বীকার্য যে এমত চিন্তার ফলশ্রুতিই ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ।

দুই

১৮৭২ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বহরমপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'Mookerjee's Magazine'-এর ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখেন : "I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular ; and this tends daily o widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali Society. This I think is not exactly what it ought to be ; I think we ought *to disanglicise* ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand. I therefore project a Bengali Magazine."[২১] এবং ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসেই 'বঙ্গদর্শন'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এখানে 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়' বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত পত্রের বক্তব্যকেই বিস্তারিত করেন, যার উল্লেখ এখানে অনিবার্য :

"আমরা এই পত্রকে সশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।...

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন।...যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম।...

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দুটিতেই প্রমাণিত যে 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না ; সমকালীন জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারাকেও প্রায় একই কুললক্ষণে চিহ্নিত করা চলে। বাঙলাদেশে তখন জাতীয় চেতনার যথার্থ উন্মেষের প্রাথমিককাল ; রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের জন্যে অধিকারের দাবিতে তখন

এদেশীয় উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনায় ঐক্যবদ্ধ। কৃতবিদ্য বাঙালির সঙ্গে সাধারণ বাঙালির মানসিক যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্তি ঘটুক, এ-আকাঙ্ক্ষার পরিণামই যেহেতু 'বঙ্গদর্শন', অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্যে, সেহেতু বাঙালি শিক্ষিত-মানস স্বভাবতই এর আন্তরিকতার সঙ্গে সহজেই একাত্ম হতে পেরেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ্য যে ১৮৭০ থেকে '৮০-র মধ্যেই বাঙালি লেখকেরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং উদারপন্থীদের রাজনীতিকে 'ভিক্ষার রাজনীতি' নামে উপহাসও করছিলেন; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য উক্ত চিন্তাচর্চারই ফললাভ। তদুপরি স্মরণযোগ্য সমকালের রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাবলী এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মতবাদগত পরিণতি, যা তৎকালেই উপলব্ধি করেছিল যে এদেশে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ কখনোই এক হতে পারে না। ফলতঃ শাসকবর্গের স্বার্থে, তারা এবং তাদেরই পোষ্যরাই যথা রাজা, ভূস্বামী প্রভৃতিরাই, ভোগের অধিকারী, এবং আপামর জনসাধারণ ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না।"[২২] 'বঙ্গদর্শন'-কে মুখ্যত এমত চেতনা প্রচারের বাহনরূপে বিবেচনা করাই শ্রেয়। স্বীকার্য যে, এ-চেতনা যদিচ যথার্থ অর্থে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীচেতনা নয় এবং বিষয়-বিবেচনায় একে বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারনার পূর্বসূচীরূপে চিহ্নিত করা চলে, তত্রাচ এদেশীয় জাতীয় চেতনার উন্মেষের প্রারম্ভ যুগে এ-চিন্তার তাৎপর্য যথেষ্ট অনুধাবনীয়। সমকালের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শোষণের চেহারাটায় অন্তত কোনো অস্পষ্টতা ছিল না জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশের এবং স্বভাবতই তাঁরা সমাজের ওই অংশের প্রতি সহানুভূতিশীলতায় তাদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন; তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যথার্থ কোনো শ্রেণী-

গত অবস্থা অনুধাবনের, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের উক্ত পন্থাবলম্বনে যে বুর্জোয়া বা পেতি-বুর্জোয়া মুখপাত্রের চরিত্র প্রকাশিত, তা সমকালের সামাজিক চৈতন্যেরই প্রতিফলন মাত্র। তদুপরি, "Beginning to see that class contradictions were growing in the country and sympathising with the oppressed in a general humanitarian way, they took to propagating morality as a means of resolving class contradictions and deliverance from social oppression—and this dominated their attitude to the question of class contradiction."[২৩] জীবনবোধ ও চিন্তাচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত মুখপাত্রদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, যদিও নিতান্ত রাজনীতিতে তাঁকে কখনো মগ্ন হতে দেখি না। এবং কেবলমাত্র চাকুরিগত বাধাই যে তাঁর রাজনীতির একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এমন সিদ্ধান্তে আসারও কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না; কারণ সমকালীন সমাজেও তাঁর ব্যঙ্গোক্তির অর্থ কিছু অস্পষ্ট ছিল না। একটি চিঠিতে তিনি লিখেওছিলেন, "I can also take up political question, as you wish"[২৪] কিন্তু পরবর্তী কয়েকমাস পরেই তিনি পুনর্বার ডাঃ শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন: "I won't take up politics. because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonian against Mookerjee. That is why *Banga Darsan* has so little of politics in it."[২৫]

এইভাবে সরাসরি রাজনীতিবাহক না হয়েও 'বঙ্গদর্শন' উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে পরিগণিত হয়; এবং প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব 'কৃতবিদ্য' ব্যক্তিকে 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীভুক্ত করেন, তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন, যাঁদের ভূমিকা এদেশের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ-ছাড়াও ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি। যদিচ বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর মুখ্য লেখক এবং তাঁর সম্পাদিত প্রত্যেক সংখ্যার সর্বাধিক রচনার রচয়িতা; এ-অর্থে 'বঙ্গদর্শন'-এর দর্শন মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনরূপেই বিবেচ্য।

১৮৭২-এর এপ্রিলে (বৈশাখ, ১২৭৯) 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশকাল থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত মাত্র চার বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র এর সম্পাদনা করেন; ইতিপূর্বে তাঁর

কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয় নি একথা বলা চলে : না উপন্যাস, না কোনো চিন্তাশীল প্রবন্ধ ! ১৮৭২ সালে একই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ ও বঙ্গীয় জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা সামাজিক অর্থে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির জীবনের ভিত্তিমূলকে নাড়া দিল এবং এ-অর্থে উক্ত সময়টিকে বিশেষ রূপে চিহ্নিত করা চলে। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে যে কেন এই বিশেষ সময়টিতে উক্ত দুটি বিশেষ ঘটনার সূত্রপাত ঘটল। পুনরুক্তি দোষ ঘটলেও বিষয়টির ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বাঙলার রেনেসাঁসের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা এখানে প্রয়োজন। রামমোহনে এদেশে যে রেনেসাঁসের সূত্রপাত তা মুখ্যত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বল এবং সেকালের মনীষা এদেশীয় প্রাচীন চিন্তাচর্চায় বিন্দুমাত্র উদ্ভাসিত বোধ করেন নি এবং সে কারণেই সরকার কর্তৃক এদেশে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনাকে কিছু সুনজরে দেখেন নি রামমোহন ; তাঁর ধারণায়, তার ফললাভ কেবলমাত্র, "load the minds of youths with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little on no practical use to the possessors or to society." এবং এই উন্মাদনা থিতিয়ে আসতে সময় লাগল ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ; যদিও এর কিছু আগেই এদেশীয় চিন্তাবিদেরা ফিরে তাকিয়েছিলেন দেশজ ঐতিহ্যের দিকে এবং মেতেছিলেন পুনরাবিষ্কারে। এটিই বাঙালি রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্ব। এবং এই পর্বের প্রধান মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণে প্রগতির চেয়ে প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তার কারণও পাশ্চাত্যের প্রতি অবৈজ্ঞানিক আসক্তি। যদিচ এ-পর্বের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার যথার্থ মিলনে এক স্থিতধী দৃষ্টিভঙ্গীর আবিষ্কার এবং তারই আলোকে এদেশীয় চিন্তাচর্চার প্রকৃত মূল্যায়ন। কিন্তু কার্যত রামমোহনের পাশ্চাত্যমুখীনতার প্রতিক্রিয়ায় রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্বের নব্য হিন্দুবাদেরই প্রতিনিধিত্ব করলেন বঙ্কিমচন্দ্র ; যার আত্মচেতনায় পাশ্চাত্য-দৃষ্টিভঙ্গী যদিচ সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত নয়, তত্রাচ তা মৌলিক অর্থে হিন্দুত্বকেই প্রশ্রয় দেয় এবং এর গর্ভেই এদেশীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম। এমত সামাজিক ঘটনাবলী নানা প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে দিয়ে ১৮৭২-এ পেয়েছিল তার প্রকাশক্ষম পূর্ণতা এবং এই সময়কালকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের এক দিক্‌চিহ্নরূপে।

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূত্রপাত

করেন, তখন সেই সঙ্গেই তিনি শুরু করেন তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'বাঙ্গলাভাষা ও উত্তর চরিত' নামীয় রচনাসমূহ। এই চারটি রচনাই যে একই চিন্তাচর্চায় অখণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণীর শোষণে কৃষিজীবী সম্প্রদায় যে কি পরিমাণে জর্জরিত এবং অন্যপক্ষে উক্ত শ্রেণীর অনার্জিত ধনে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আইনানুগ অধিকার; ঘটনাবলী হিসাবে এ-সমস্তই 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'বিষবৃক্ষ' নামীয় রচনাবলীর মুখ্য উপাদান। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে[২৬]; যদিচ পরবর্তীকালে এই সামাজিকতা তাঁকে আর যথেষ্ট উৎসাহ যোগায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবেশ ও যুগচেতনা থেকে তাঁকে কখনও সম্পূর্ণত বিবর্জিত হতে দেখি না, এমন কি চূড়ান্ত রোমান্টিক উপন্যাস সমূহেও। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে যদিচ তাঁর পঠন-পাঠনের সীমা ছিল বহুবিস্তৃত, তথাপি সমাজের উদ্ভব বা সমাজ-সম্পর্কের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না এবং হার্বার্ট স্পেন্সারকে স্বীকৃতি দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন আর সেই সঙ্গে 'সাম্য' বিষয়ক চিন্তাভাবনায় তিনি পেয়েছিলেন রুশোর নিশ্চিন্ত আশ্রয়। দুর্ভাগ্য যে ততদিনেও মার্কসের 'ক্যাপিটল' গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। রুশোর প্রতি আনুগত্যেই তিনি স্বভাবতই পেয়েছিলেন প্রধোঁ, লুই ব্লাঁ, প্রভৃতির চিন্তাচর্চার উত্তরাধিকার। এবং এ-কারণেই 'বিষবৃক্ষ'র নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের মধ্যে যে ফিউডাল দ্বন্দ্ব বা একজন ব্রাহ্ম ও হিন্দুর মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক তাকে যথাযথ চিত্রিত করতে তাঁর সামাজিক চৈতন্যই সহায়ক হয়; কিন্তু প্রথমাবধি তাঁর চৈতন্যে যে নীতিবোধ কার্যকরী এবং যাকে তিনি সমস্ত জীবন বহন করেছেন, তা সর্বত্রই তাঁর রচনার মূলমন্ত্ররূপে বিরাজ করেছে। উক্ত উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই নীতিবোধ ও তাঁর ভাষার 'সৌন্দর্যচেতনা' ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতকীয় জাগতিক কার্যকারণপরম্পরা বোধের অভিব্যক্তি[২৭] কিনা এ-বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই যে এই সৌন্দর্যচেতনাকে তিনি কখনও বস্তুনিরপেক্ষ জ্ঞান করেন নি। 'উত্তরচরিত'-এর শেষাংশে তাঁর মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এখানে তিনি বলছেন "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য. "কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎ-

কর্ষক সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না।…তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র কথিত এই 'নীতি' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচকের ভাষ্য নেওয়া যাক : "নীতি শব্দটি যদি চাণক্যশ্লোক ও পঞ্চতন্ত্রের নির্দেশিতভাবে গ্রহণ করা হয় তবে অবশ্যই দূষনীয় এবং সাহিত্যে সর্বথা বর্জনীয়। কিন্তু নীতি শব্দটি যদি জীবনের সমব্যাপকভাবে গ্রাহ্য হয় তবে তাকে বর্জন করা মানে জীবনকে অস্বীকার করা, তার বিরুদ্ধাচারণ মানে জীবনের বিরুদ্ধাচারণ।" [২৮] এই ব্যাখ্যার তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দিলে আর বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে না। সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদ বৃহত্তর অর্থে উক্ত নীতিবোধকেই আদর্শজ্ঞানে মেনেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যেহেতু কেবলমাত্র সাহিত্যের সমস্যা নয় এবং যোগাযোগে সমকালীন জাতীয়তাবাদেরই অঙ্গীভূত, সেহেতু গুরুত্বেই বিষয়টি বিবেচ্য। এই নীতিবোধ, যার প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকর্মে বিধৃত, তা যে কেবল সমকালীন নবউদ্বোধিত জাতীয়তাবাদের অন্যতম মন্ত্র বিশেষ তাই নয়, সেই সঙ্গে তার অস্তিত্ব সমকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর একান্ত আশ্রয়। ব্যাপকতর অর্থে এই নীতিবোধের দায়েই তাঁরা সমাজের অবহেলিত অংশের প্রতি মমত্ববোধ করেছিলেন কিন্তু একাত্ম হতে পারেন নি, এই নীতিবোধের কারণেই তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন সমাজের সুস্থ সম্পর্কের জন্যে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ পরিত্যাগে; কিন্তু স্বীকার করা অসম্ভব ছিল সমাজের নিম্ন অংশের যথার্থ অধিকারবোধকে। এই বুর্জোয়া নীতিবোধের দ্বারা সামাজিকভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘোচাবার অপচেষ্টা এদেশের উনিশ শতকীয় ইতিহাসেরই অঙ্গ। কোমারভ-এর ভাষায়, "This striving to reconcile class contradictions for the sake of national unity found expression also in the anti-feudal programme of the Bengal democrats at that time. They sided with the peasants against feudal oppression, but only a few of them went so far as to demand abolition of landlordism, to recognise the irreconcilability of the interests of the peasants and the feudal landlords. Bankim Chandra, who, as we have seen, pointed out the injustice of the Zamindari system and upheld the rights of the peasants, still did not venture to call for

the abolition of that system in Bengal." [২৯] বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' এই নীতিবোধ রক্ষা করে চলেছে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত। ব্যাখ্যার প্রয়োজনে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বঙ্কিম-কৃত সমালোচনার অংশবিশেষ উল্লেখ্য : "নীলদর্পণ-কার প্রভৃতি যাহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রনয়ণ করেন তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি সমাজ সংস্কার নহে।" [৩০] আপাতদৃষ্টিতে এই সমালোচনা বঙ্কিমের নিতান্ত দীনবন্ধু-বিরোধিতা হিসাবে চিহ্নিত করা চলে এবং দীনবন্ধু প্রণীত 'জামাইবারিক' নাটক প্রসঙ্গে উভয়ের বিবাদ প্রসঙ্গও উপস্থাপিত করা চলে ; কিন্তু সমস্যাটা এত সহজে সমাধানের প্রয়াস যথার্থ নয়। বিশেষ করে অন্যত্র যখন বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন, "যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল করিতে পারেন…তবে অবশ্য লিখিবেন।"[৩১] প্রকৃত প্রস্তাবে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গিতে তাঁর সায় ছিল না ; যেমন ছিল না সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একাংশের, যাঁরা তখনও আস্থা রেখেছিলেন বিদেশী শাসকশ্রেণীর হৃদয় পরিবর্তনে। এইপ্রকার বহু উদাহরণে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের দ্বন্দ্ব উল্লিখিত হতে পারে, যা সমকালের জাতীয় আন্দোলনেরই মানসিকতার প্রশ্রয় ও পরিণাম।

অন্য যে সমস্যার বিষয়টি 'বঙ্গদর্শন'-পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাবিত করেছিল তা এদেশীয় বর্ণগত পার্থক্য। যার ফলে সামাজিক ঐক্যবোধ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ "প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণে এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই।" [৩২] সমস্যার চেহারাটা যদিচ তাঁর মন্তব্যে যথাযথই উপস্থাপিত, তত্রাচ স্বীকার্য যে এর গুরুত্ব ও গভীরতা বিষয়ে তাঁর মানসিকতা যথেষ্ট ভাবিত ছিল না ; কারণ ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবগত যে গ্রাম বাঙলায় সমকালের সমাজে উক্ত প্রথা কতদূর গভীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং নানা সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও তার প্রভাব একালেও বিস্তৃত। [৩৩] অন্যপক্ষে তিনি দেখেছেন, "এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্য প্রকার বিশেষ পার্থক্য

জন্মিতেছে ”[৩৪] এবং এই পার্থক্যের কারণ তাঁর বিবেচনায় ‘ভাষাভেদ’। “সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদের অভিপ্রায়-সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংশ্রবে আসে না।”[৩৫] এই প্রকারে সম্মিলন ঘটাবার প্রয়াস আধুনিক বিচারে অবশ্য অবৈজ্ঞানিক এবং কল্পনাবিলাসমাত্র কিন্তু সমকালের জাতীয়তাবাদীদের বিবেচনায় এর গুরুত্ব অসাধারণ হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে। ১৮৯২ সালে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন : "Bankim's influence has been far-reaching and everyday enlarges its bounds. What is its result? Perhaps it may very roughly be summed up thus. When a Maratha or Gujerati has anything important to say, he says it in English; When a Bengali, he says it in Bengali. That is, I think, the fact which is most full of meaning for us in Bengal. It means, besides other things less germane to literature, that execpt in politics and journalism which in the handmade of politics, English is being steadily driven out of the field. Soon it will remain to weed of out of our conversation."[৩৬] বিশেষত লক্ষণীয় যে এই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এদেশে তখন একটি বিশেষ শ্রেণীরূপেই নিজেদের সংগঠিত করেছিল এবং তাঁদেরই প্রয়াসে পরবর্তীকালে গঠিত জাতীয় কংগ্রেসও ছিল উক্ত শ্রেণীরই মুখপাত্র; জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রকৃত অর্থে ছিলই না। বঙ্কিমচন্দ্র যে গণতান্ত্রিক আগ্রহে উভয় শ্রেণীর মধ্যে আত্মিক সম্মিলনের ক্ষেত্র খুঁজতে চেয়েছিলেন বাঙলাভাষার মাধ্যমে,[৩৭] তাও কার্যত শিক্ষিতশ্রেণীর বক্তব্যকে জনসাধারণ্যে পরিচিত করার প্রয়াসেই পর্যবসিত হয়েছে; উভয়ের দেওয়া-নেওয়ার কোনো যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি। এবং ঐতিহাসিক কারণেই তা ছিল অসম্ভব।

১৮৭৫ সালে (চৈত্র ১২৮২) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’-এর সমাপ্তি। এই সম্পাদনা পরিত্যাগের কারণ এ নয় যে পত্রিকা সম্পাদনার দুরূহকর্মে ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং পত্রিকা-সম্পাদনা অপেক্ষা লেখায় অধিক মনোনিবেশে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রমশ সরে আসছিলেন নিতান্ত জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে এবং তাঁর কাছে আত্মসমীক্ষাই তখন যথার্থ মূল্যবান বোধ হয়েছিল। পরবর্তীকালের একটি রচনা থেকে

এ-প্রসঙ্গে সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে : "অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।"[৩৮]

তিন

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দশ। ১২৭৯ থেকে ১২৯০-এর মধ্য প্রকাশিত এই উপন্যাসগুলি হল, (১) বিষবৃক্ষ, (২) ইন্দিরা, (৩) যুগলাঙ্গুরীয়, (৪) চন্দ্রশেখর, (৫) রজনী, (৬) রাধারাণী, (৭) কৃষ্ণকান্তের উইল, (৮) রাজসিংহ, (৯) আনন্দমঠ, ও (১০) দেবী চৌধুরাণী (অসম্পূর্ণ)। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী' প্রভৃতি উপন্যাস। স্বীকার করতে সম্ভবত দ্বিধা নেই যে পরবর্তীকালের রচনাবলীর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'র মতো সার্থক উপন্যাস ক্বচিৎ মেলে, তথাপি এ-তথ্য অনিবার্যভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে যে প্রাক্-'বঙ্গদর্শন'-পর্বে বঙ্কিমী চিন্তায় কোনো সুসংবদ্ধ দার্শনিকতা জন্ম নেয় নি। 'বঙ্গদর্শন'-পর্বে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের সঙ্গে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশে রেনেসাঁসের সংহত আত্মা আশ্রিত হল, তেমনি মানুষ প্রতিষ্ঠা পেল তার ব্যক্তিত্বে ও স্বাধিকারে; যেমন একদা হেলেনিক ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারে পশ্চিমী চিন্তাবিদেরা খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষকে তারই স্বভূমিতে। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ: "বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষ-বৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃনালিনী লেখা হয়ে ছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা।...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের

অভিজ্ঞতার মধ্যে।"[৩৯] কিন্তু এ-সমস্তই বাহ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিষবৃক্ষ'র ঘটনাসংস্থান বা পরিণতির অন্তত কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক নেই এবং গ্রীক ট্রাজেডির সমধর্মাই তার চরিত্র, অন্তত উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভের স্বপ্নবৃত্তান্ত থেকে তাই প্রমাণিত। কিন্তু যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং যার জন্ম রেনেসাঁসের গর্ভে, তা হল —এই কাহিনীর ট্রাজেডির মূল নিহিত আছে তার চরিত্রাবলীতে এবং নায়কের সামান্য আত্মনিয়ন্ত্রণেই এই বিয়োগান্তের বেদনাকে এড়ানো যেত। তেমনি 'চন্দ্রশেখর'-এ নবাবের বিচক্ষণতায় রক্ষা পেত দলনী বেগমের জীবন; কিন্তু শৈবলিনীর প্রেম সর্বাংশে প্রতাপের প্রতি ধাবিত তৎসত্ত্বেও সে স্বামী চন্দ্রশেখরকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসায় অভিষিক্ত করে কেবলমাত্র রামানন্দ স্বামীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে। 'রজনী'তেও আমরা এমন এক সন্ন্যাসীর দেখা পাই, কিন্তু'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই প্রকার চরিত্র অনুপস্থিত। কিন্তু মৌলিক অর্থে উভয় উপন্যাসেই মানুষের প্রতি আস্থারই প্রকাশ; মানুষ যদি তাকে যথার্থ বিকশিত করতে পারে, যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে, তবে পরিণামে সে অপরাজেয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কোনো অলৌকিকত্ব নেই কিন্তু আছে ভ্রমরের মতো দৃঢ়চেতা নারী, যার আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চিত আকাঙ্ক্ষায় অসাধ্যসাধন সম্ভব এবং এর মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের প্রকৃত প্রকাশ। 'বিষবৃক্ষ'র সূর্যমুখীচরিত্র অনেক ম্লান, যার না আছে দৃঢ়তা না আছে ভবিষ্যতে বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক এবং আধা-ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির পটভূমির বিরাটত্ব ছেড়ে যদি আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'রজনী'-র মতো সামাজিক উপন্যাসগুলির দিকেও তাকাই তাহলেও দেখতে পাব সর্বত্রই আছে ভ্রমর, রোহিনী, সন্ন্যাসী, অমরনাথ ও লবঙ্গলতার মতো অসাধারণ চরিত্রগুলি এবং সবত্রই লক্ষণীয়ভাবে বিরাজমান কোনো না কোনো অলৌকিক শক্তি, যা সাধারণভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বঙ্কিমী চেতনার বিচারে এই অলৌকিক শক্তির ব্যাখ্যা অনিবার্য। অনস্বীকার্য বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর কাহিনীগুলিতে ঈশ্বর ক্বচিৎ উল্লিখিত তথাপি অলৌকিকত্বের প্রয়োগে তিনি যে নিয়তিবাদীতে পরিণত হন, তাকে কোনোমতেই যেমন তুলনা করা চলে না শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডিগুলির নিয়তিবাদের সঙ্গে তেমনি তুলনা চলে না গ্রীক নিয়তিবাদের চলিত ধারণার সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষের মধ্যেই নিহিত থাকে এই অলৌকিক শক্তি এবং মানুষের প্রচেষ্টায়ই এর উজ্জীবন সম্ভব। এবং এ-কার্যে বৃত্তির অনুশীলনের

ওপরই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরবর্তীকালে 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বিষয়টি দার্শনিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এই অতিমানবের কল্পনাসূত্রে, যার পরিণতি 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত হিন্দু আদর্শেই লালিত। বাঙলার রেনেঁসাসের দ্বিতীয় পর্বে যে নব্য-হিন্দুবাদের উত্থানের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রধানত জ্ঞানমার্গকেই আশ্রয় করে বিকশিত; অবশ্য এর অর্থ এ-নয় যে জ্ঞানমার্গের প্রতি আস্থায় সমকালীন চিন্তাবিদেরা নস্যাৎ করেছিলেন ভক্তি ও কর্মের অন্যদুটি পথ; বরং তাঁরা বহুক্ষেত্রেই ছিলেন সমন্বয় প্রয়াসী। "Bankimchandra seems to lay stress on *Jnana* or Knowledge, although he also asserted that spiritual illumination leads to selfless action, and such action aims at and inspired by faith in God (*Bhakti*)",[৪০] প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ্য 'দেবীচৌধুরাণী'-র নায়িকা প্রফুল্লকে, যার মধ্যে ঘটেছে উক্ত মার্গগুলির সমন্বয় অথবা 'আনন্দমঠ'-এর মূল বক্তব্য, যেখানে লৌকিক অর্থে দেবতার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যমান পায় জ্ঞানচর্চা বা 'অনুশীলন'। এবং যার উৎস সন্ধানে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সমকালীন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার প্রতি; এর প্রত্যক্ষ ফললাভেই নব্য হিন্দুবাদের জন্ম। এই মতবাদের প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত সামাজিক জীবনবোধেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। এরই ব্যাখ্যানে কোমারভ লেখেন "Utopian dreams of finding a way out of the class contradictions through lessening them and thus establishing national unity for struggle against colonial rule, explain in large measure the peculiar fact in the development of Indian democratic thought in the late 19th and early 20th centuries that many Indian radical nationalists turned to religion, or rather to the religious morality of ancient India. This turn to religion became known as. 'Hindu nationalism' or 'Hindu Revival'. It was due to a certain awareness that establishment of the bourgeois way of life would not suffice to deliver the masses from oppression, and at the same time it reflected the inability of the nationalists to find effective ways of attaining this historic goal which was then still a remote

one for India."[৪১] এই সামাজিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত চিন্তার উপস্থাপনায় স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি কি প্রকারে সমাজ-মানসের চিন্তাকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। এবং এই সূত্রের ধারাপথেই উদীয়মান বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকেরা ধর্মকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাহকরূপে পরিণত করলন ; কারণ তাঁদের ধারণা অনুযায়ী ধর্মই ছিল একমাত্র বাহন যার সাহায্যে জাতীয়তাবোধের অনায়াস উদ্বোধন সম্ভবপর। তাঁদের ধারণা ঐতিহাসিক ভাবেই ক্ষণকালের জন্যে হলেও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চিন্তা থেকে যথাসম্ভব দূরত্বে থেকে ক্রমশ তাঁরা আচ্ছন্ন হয়েছেন হিন্দু পৌত্তলিকতায় ; আর সে পৌত্তলিকতার মূলমন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'বন্দেমাতরম' ; ফলে দেশ পরিণত হয়েছে জাতীয়তাবাদের দেবীতে। আর এই "Nationalism cannot die, because it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to gaol".[৪২] কালান্তরের ইতিহাসের সাক্ষ্য অবশ্যই ভিন্নপ্রকার।

নির্দেশিকা

(১) দ্র: 'শিক্ষার হেরফের' ('শিক্ষা'), 'পথে ও পথের প্রান্তে,' ইত্যাদি

(২) *Memoirs* : B. C. Pal

(৩) 'The Future Results of British Rule in India.' (*Marx & Engels on India* : Ed. Mulk Raj Anand)

(৪) 'বঙ্গদেশের কৃষক'

(৫) 'The Future Results of British Rule in India.'

(৬) "When you will know our real wishes I have not the least doubt that you would do justice."*Essays* : Dadabhai Naoriji

(৭) *Report from the Indian Famine Commission*, London, 1882

(৮) Editorial : *Amrita Ba ar Patrika*, January 20, 1871

(৯) 'চতুষ্কোণ' : বৈশাখ, ১৩৭৯

(১০) 'The Maharshi and the Tattvabodhini' : Dilipkumar Biswas (*Studies in Bengal Renaissance*)

(১১) 'বাংলা সাময়িক পত্র' (১ম খণ্ড) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২) বঙ্কিমচন্দ্র : 'আধুনিক সাহিত্য'

(১৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকা

(১৪) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী গ্রন্থের সমালোচনা

(১৫) 'আত্মচরিত' : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬) 'Social Thought of Bengal,' E. N. Komarov (*Tilak and the Struggle for Indian Freedom*)

(১৭) *History of France* : Michelet

(১৮) *The Philosophy of Ernst Cassires*, Ed. P. A. Schitpp

(১৯) 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(২০) *Transactions of the Bengal Social Science Association*. 1870

(২১) *Bengal : Past & Present*, April-June, 1914

(২২) 'বঙ্গদেশের কৃষক'

(২৩) *Social Thought ol Bengal* : E. N. Komarov

(২৪) *Bengal Past & Present* : April-June, 1914

(২৫) Ibid

(২৬) 'বাংলা উপন্যাস' : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৭) 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' : ডঃ ভবতোষ দত্ত

(২৮) প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাহিত্য-চিন্তা'

(২৯) *Social Thought of Bengal*

(৩০) 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র, ১২৮০

(৩১) 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় খণ্ড

(৩২) 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা'

(৩৩) *Politics and Caste Conflict in West Bengal* : Nirmal Ghose (In the press)

(৩৪) 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা'।

(৩৫) ঐ

(৩৬) *Indu Prakash*, 20. 8. 1894

(৩৭) 'লোকশিক্ষা' 'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১২৮৫

(৩৮) 'ধর্ম্মতত্ত্ব', একাদশ অধ্যায়

(৩৯) 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩৮

(৪০) 'Bankimchandra Chatterji' : Dr. Subodhchandra Sen Gupta (*Studies in the Bengal Renaissance*)

(৪১) 'Social Thought of Bengal' : E. N. Komarov

(৪২) Aurobindo Ghosh; Quoted by N. Nevinson in *The New Spirit in India*

উদয়পুরের উপকথা

ভবানী সেন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অবনীদের বাড়ির বৈঠকখানায় উদয়পুর যুব সমিতির সাহিত্য বিভাগের সভা চলছে, প্রধান বক্তা ভোলানাথ। সে সাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেবে। অবনীও তৈরি হয়ে আছে ভোলানাথের বিপক্ষতা করার জন্য। গ্রামের ছেলেরা এই দুই মহারথীর দ্বন্দ্ব দেখার জন্য উৎসুক হয়ে বসে আছে।

কিন্তু ভোলানাথ প্রথম কথাতেই অবনীকে একেবারে হকচকিয়ে দিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলল—

"সাহিত্যের লক্ষ্য লোকশিক্ষা। লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাদ দিলে সাহিত্য হয় লক্ষ্যহীন।"

অবনী জানত যে ভোলানাথ সাহিত্যকে দুর্বোধ্য করার পক্ষপাতী, অর্থাৎ সে আর্টের জন্য আর্ট এই মন্ত্রের উপাসক। কিন্তু এখন সে যা বলল তাতে অবনীর বিপক্ষতা করবার সুযোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। সে শুধু এইটুকু যোগ করল—

"মানুষের অন্তরে কোনো একটা দিক আছে যেখানে বিজ্ঞানের আবেদন পৌঁছয় না, কিন্তু সাহিত্যের আবেদন সেখানটাতেই সহজে নাড়া দিতে পারে। এ দিক থেকে লোকশিক্ষায় সাহিত্য অপরিহার্য।"

সভায় আর কোনো বাকবিতণ্ডা হল না, সুতরাং সভা তেমন জমল না।

সভার শেষে দুই বন্ধু নদীর দিকে বেড়াতে গেল। প্রথম কথা শুরু করল অবনী—

"তুমি সাহিত্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা হঠাৎ বদলালে কেন?"

ভোলানাথ: "মেনকা আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে আমি এই কথাটা ভেবেছি। মেনকার মতো মেয়ে যা বুঝল না তা নিরর্থক, যে সাহিত্যে মেনকার মতো মেয়ের কোনো উপকার হবে না, সে সাহিত্য নিষ্ফল।"

দুই বন্ধুতে কথা বলছে এমন সময় দেখতে পেল দূর থেকে মাঠ ভেঙে মহেশখুড়ো আসছে। মহেশখুড়োর পুরো নাম মহেশচন্দ্র সরকার। তিনি

উদয়পুরের একজন ছোটখাটো জোতদার। গ্রামের লোক তাঁকে অনেক সময় গেজেট বলে থাকে ; কারণ তাঁর কাছে নানা দিকের নানা খবর পাওয়া যায়। গ্রামের পাঁচজনের ভালোয়-মন্দয় সবের বেলায় মহেশখুড়োকে পাওয়া যায়। দশজনের বিপদে আপদে তিনি বুক দিয়ে পড়েন। তাছাড়া তিনি রসিকতায়ও অদ্বিতীয়। সেই জন্য লোকে তাঁকে রসরাজও বলে ডাকে। মহেশখুড়োর বয়েস চল্লিশের উপর। মাথায় প্রকাণ্ড একটা টাক, নাকের ডগাটা শকুনের ঠোঁটের মতো। ধুতি পরা, পাঞ্জাবী গায়, কাঁধে একখানা চাদর, ডান হাতে লাঠি, ঘোড়ার মতো টগোতে টগোতে মহেশখুড়ো আসছেন।

অবনী আর ভোলানাথকে দেখতে পেয়ে তিনি তাদের দিকে ঘেঁষলেন, পেটে অনেক কথা জমেছে।

মহেশখুড়ো কাছে আসতেই অবনী জিজ্ঞাসা করল, "কি খুড়ো খবর কি ?"

"আরে সে এক রগড়ের ব্যাপার। গিয়েছিলাম খালপাড় ভট্টাচার্যদের বাড়ি, ক্যাবলা ভট্টাচার্যের বাপের শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে। ভট্টাচার্য শ্রাদ্ধবাসরে বলে বাপের নাম ভুলে গেছি। বউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ গো তোমার শ্বশুরের নামটা যেন কি ছিল ?"

অবনী আর ভোলানাথ হো হো করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ গম্ভীর আলাপের পর মহেশখুড়োর চুটকিটা চাটনির মতো লাগছিল বেশ। মহেশখুড়ো বলে চলল—

"তারপর হয়েছে কি—খালপাড়ে এসেছি, দেখি জগাই সেখানে বসে, চরসে কষে দম দিচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে, খুড়ো খালের পাড়ে কেন বসে আছি তা ভুলে গেছি ; বলো তো খুড়ো এটা খালের এপাড় না ওপাড়।"

এ রকম আরও দু-একটা ছেড়ে মহেশখুড়ো উঠলেন, বলে গেলেন— "তোমাদের একটা কথা বলি, একটু সাবধানে থেকো, তোমাদের ওপর কর্তাদের একটু নজর পড়েছে মনে হল। থানার বক্সীটা জিজ্ঞেস করছিল যে তোমাদের কমিটিতে কি হয়, বাইরের লোক কে কে আসে, এই সব।"

এই কথা বলে মহেশখুড়ো আবার ঘোড়ার মতো টগোতে টগোতে চলে গেলেন।

৬

ব্রজনাথ রায়ের ছেলের নাম নিশানাথ। নিশানাথ ভোলানাথের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। বি-এ পাশ করেছে।

ব্রজনাথবাবুর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এখন বড় ছেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। প্রতিভার সঙ্গে নিশানাথের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করা অবধি এই চিন্তাটাই ব্রজনাথকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিশানাথ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা চাই।

পৈতৃক জমিদারী যা দশাপন্ন তাতে সংসার চলে না। ওটাকে এখন জমিদারী না বলে জমিদারীর অপভ্রংশ বলাই ভালো।

জমিদারী ছিল তারকেশ্বরের আমলে। ১৪ খানা গ্রামের ওপর রাজত্ব করেছেন বললেই হয়। আজ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

সরকারী প্রজাস্বত্ব আইনে চাষীর যত সুবিধা হোক বা না হোক মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারকুল ছারেখারে গোল্লায় গেছে। সাড়ে ষোলআনা সুবিধে হয়েছে জোতদারদের—যারা জমির প্রজাস্বত্ব কিনে অমানুষিক উৎপীড়নদ্বারা কৃষক প্রজাদের ভিটেছাড়া করে চাষীর দখলের জমি খাস করে নিয়েছে এবং সেই জমিতে আধি ফসলের বখরায় আধিয়ার নিযুক্ত করেছে। আর সুবিধা হয়েছে বড় বড় জমিদারদের। তাঁদের এখন আর অসংখ্য ছোট ছোট প্রজার কাছ থেকে দু-এক টাকা করে খাজনা কুড়িয়ে বেড়াতে হয় না। এক একজন ১০০০ কিংবা ৫০০০ বিঘার মালিক। জোতদার প্রজার কাছ থেকে থোকে থোকে খাজনার টাকা পান।

তারকেশ্বরের মতো মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের ছেলেরা এখন সমাজের নানা দিকে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁদের প্রজাদের অবস্থা হয়েছে মালিনীর মতো।

ব্রজনাথ স্থির করলেন নিশানাথকে একটা দর্জির দোকান করিয়ে দেবেন। তাঁর দ্বারা অফিসের কেরানীগিরি সম্ভব হবে না; কারণ যে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্য তিনি ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন তাতে তিনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে লাভ করেছেন অস্থিরতা এবং অসহিষ্ণুতা। অফিসে ভেড়ার মতো হুকুম তামিল করে যাওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

ব্রজনাথ রেলের চাকরি করতে করতে কিছু টাকা জমিয়েছেন। রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মাইনের চেয়ে উপরি পাওনা অনেক বেশি।

লোকটিও মিতব্যয়ী এবং হিসেবী লোক। তাই কিছু জমিয়েছেন। নিশানাথকে মূলধন দিয়ে কলকাতায় একটা দর্জির দোকানে লাগিয়ে দিলেন মাইনে করা দর্জি থাকবে; নিশানাথ হবেন প্রোপ্রাইটর-ম্যানেজার। দোকানটা

একটু জমে উঠলে পরে বিয়েটা হবে; একথা প্রতিভার মা-বাবার সঙ্গে পাকাপাকি হয়ে আছে।

নিশানাথ দর্জির দোকানের ম্যানেজার হয়ে বসলেন। দর্জির কাজ নিজে কিছুই জানেন না। কিন্তু তাঁর দিল-দরিয়া মেজাজ। রোজ এক টিন করে সিগারেট কেনেন আর বন্ধুবান্ধব ডেকে এনে আড্ডা জমিয়ে খুব ওড়ান।

দর্জির জন্য কাজের ঘণ্টা ঠিক আছে। সেটা ঠিক ঠিক আদায় করে নেন। অর্ডার নেওয়া এবং সাপ্লাই করার জন্যও একটা কেরানী রেখেছেন। নিজে জমিদারী চালে তদারক করেন। এমনি করে নিশানাথের দর্জিখানা বেশ সরগরমে চলতে থাকল। বাপের টাকা ব্যাঙ্কে আছে, প্রতি মাসে টাকা ওঠান, কেরানী ও দর্জির মাইনে দেন আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে সিগারেট খান। ব্যাঙ্ক একাউন্ট যে এদিকে ক্ষীণকলেবর হয়ে উঠছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

৭

ভোলানাথ ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞানের প্রথম বার্ষিকে ভর্তি হয়েছে। অবনী আরও এক বছর উদয়পুরের স্কুলে থাকবে। ভোলানাথ চলে আসার পর গ্রামের যুবক সমিতি অর্ধমৃত অবস্থায় আছে। ইতিমধ্যে অবনীর কাছ থেকে ভোলানাথ আবার একটু দূরে সরে গিয়েছিল। যদিও তাদের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয় নি।

উদয়পুরের যুবক সমিতির নাম দু মাসের মধ্যেই আশপাশের অনেক গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবনী ও ভোলানাথ আদর্শ কর্মী ও দেশাত্মবোধ সম্পন্ন যুবক হিসেবে চারিদিকে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

একদিন ভিন্ন গ্রাম থেকে মৃণাল মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক উদয়পুরের যুবক সমিতি দেখতে এলেন। সেই সময় অবনী ও ভোলানাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মৃণাল ভোলানাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনার জীবনের লক্ষ্য কি? আজ না হয় গ্রামে একটা যুবক সমিতি গঠন করে দশজনের ভালো করলেন, কিন্তু দেশটা তো আপনার গাঁয়ের চেয়ে অনেক বড়। জীবনের ভবিষ্যৎ বৃহত্তর ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভেবেছেন কিছু?"

ভোলানাথ উত্তর দিয়েছিল—"আমি 'পথের দাবী' পড়েছি। 'পথের দাবী'ই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। কিন্তু অপূর্বর রাস্তা ধরব না সব্যসাচীর তা এখনও ভেবে স্থির করতে পারি নি। অবনীর সঙ্গে আমার বনে না এই জন্যে—সে

ঘোরতর গান্ধীবাদী অহিংসপন্থী। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে অহিংসপন্থায় স্বাধীনতা হবে আর স্বাধীনতা পাবার আগে দেশের স্থায়ী ভালো কিছু করা যাবে।"

ভোলানাথের সঙ্গে আলাপ করে মৃণাল বুঝতে পারেন যে এই ছেলেকে দলে নেওয়া যায়। ধীরে ধীরে তিনি ভোলানাথকে দলের আদর্শ শেখালেন। প্রথম কিছুদিন চলল শুধু বন্ধুত্ব, অর্থাৎ দেখা-সাক্ষাৎ আর আলাপ-আলোচনা। সহজে তিনি ধরা ছোঁওয়া দিলেন না—সেটা দলের নিয়ম বিরুদ্ধ। যাচাই করে যখন ভোলানাথের মনুষ্যত্ব, সাহস এবং লক্ষ্য আঁকড়ে থাকার দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন তখন একদিন প্রস্তাব করলেন—

"তুমি এসো আমাদের দলে। আমাদের দলটা একটা বিপ্লবী দল। দলের নাম ক্রান্তিচক্র। আমাদের উদ্দেশ্য বিপ্লবদ্বারা স্বাধীনতা লাভ।"

ভোলানাথ একদিন মৃণাল মজুমদারের সঙ্গে একটা কালীমন্দিরে গিয়ে বুক ফেড়ে রক্ত বের করে সেই রক্ত একটা জবাফুলে মেখে মা কালীর পায়ে অর্ঘ নিবেদন করে বিপ্লবী দলের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

অবনীকে এসব কথা সে প্রথম দিকে বলে নি কিছুই।

বিপ্লবী দলে ঢোকার আগে ঐ দলের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ভোলানাথের মনে যে রোমাঞ্চকর ধারণা হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যই তা কেটে গেল। কোনো কাজ নেই, শুধু আড্ডা মারা, আর রাজামারি বাদশামারি করা। ভোলানাথের জীবনে তখন বন্যার বেগ, সে বাধাবন্ধহীনভাবে ছুটে যেতে চায় মহাজগতের বৃহত্তর রণক্ষেত্রে। ভারত মুক্তি সমিতির গতানুগতিক আড্ডাবাজি তার বেশিদিন ভালো লাগে নি। কিন্তু দলের প্রতি বিশ্বস্ততার যে শপথ সে নিয়েছিল একদিন কালীমন্দিরে বসে তার অসম্মানও সে করে নি।

বাঙলাদেশে সব বিপ্লবীদলেরই যে ক্রান্তিচক্রের মতো অবস্থা ছিল তা নয়। অনুশীলন এবং যুগান্তর—এই দুটোই ছিল বৃহত্তর বিপ্লবী দল। এই দুটো দল থেকে তরুণ যুবকেরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিল।

কিন্তু ভোলানাথের সঙ্গে তাদের কখনও যোগাযোগ ঘটে নি।

৮

ভোলানাথ কলকাতায় চলে গেলে অবনী একা পড়ল। এতদিন ভোলানাথের

সঙ্গে সে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আসছিল। ভোলানাথ যে পথ নিয়েছে সে পথের প্রেরণা একরকম অবনীর কাছ থেকেই সে পেয়েছিল। অবনীই প্রথম 'পথের দাবী' পড়ে ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিল এবং সেজন্য গ্রামের অভিভাবকদের গঞ্জনাও সহ্য করেছিল যথেষ্ট। অবনীই ভোলানাথকে টেনে টেনে এনেছে একটা সংগঠিত প্রচেষ্টার মধ্যে। যুবক সমিতি গঠনের ইনিসিয়েটিভও অবনীর।

কিন্তু ভোলানাথ এই সবের মধ্যে এসে বলগাবিহীন ঘোড়ার মতো ছুটে এগিয়ে গিয়েছিল। অবনী তার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে।

ভোলানাথ ছিল যেন একটা গতি, অবনী ছিল যেন একটি স্থিতি।

কিন্তু অবনী যে একেবারে গতিশীল হয় নি তা নয়। ভোলানাথের সংস্রবে এসে তার গতিশীলতার একটু আবেগ সেও পেয়েছিল।

ভোলানাথ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় অবনীকে দিয়ে গিয়েছিল তার নূতন পথের খানিকটা আভাস।

বন্ধুর অবর্তমানে অবনী সে কথা অনেক ভেবেছে। নিজেই মনে মনে হিংসা-অহিংসার মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে।

হিংসা-অহিংসার ঘোরপ্যাঁচ খানিকটা কাটিয়ে উঠলেও এটা কিছুতেই অবনীর ভালো লাগে নি যে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনতার অনুসারে রূপ দিতে হবে।

মৃণাল মজুমদার মাঝে মাঝে আসতেন অবনীর সঙ্গে আলাপ করতে।

উদয়পুরে একটা নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। চারিদিকে ইঁটের দেওয়ালে পরিবেষ্টিত একখণ্ড জমি। জায়গাটা এখন জঙ্গলাকীর্ণ। জঙ্গলের মধ্যে এখনও বড় বড় কড়াইয়ের মরচে ধরা ভাঙা টুকরো ১০০ বছর আগেকার এক পৈশাচিক অত্যাচারের স্মৃতি বহন করছে। দেয়ালটা ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েকখানা ইঁটের গাঁথুনি এখনও আস্ত আছে। ভিতরের কুঠিটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

কুঠির সামনে একটি রাস্তা, রাস্তা পেরোলেই চড়া এবং চড়া থেকে কিছু দূরে একটা হাজা নদী। এই নদী একসময় খুব বড় ছিল। নীলকুঠির ঘাটে স্টীমার এসে লাগত।

মহেশখুড়োর কাছে অবনী সেদিন শুনেছিল যে এই নীলকুঠির সঙ্গে মালিনী-মেনকাদের পরিবারের অতীত ইতিহাস জড়িত আছে।

অবনী একদিন মহেশখুড়োকে ধরে বলল—"খুড়ো, তুমি তো উদয়পুরের গেজেট। নীলকুঠির কাহিনী কিছু শোনাও। আমাদের গ্রামের অতীত ইতিহাসটা জেনে রাখি।"

গেজেটগিরির পরীক্ষা দেবার একটা সুযোগ পেয়ে মহেশখুড়ো খুব খুশী। তিনি বলে চললেন—

"ব্রজনাথ রায়ের বাড়ির পাশে ঐ যে রাইচরণের বাড়ি আছে (রাইচরণ মালিনীর স্বামী) ঐ রাইচরণের দাদামশাই শশীকান্তর ছিল বড় বড় দাড়ি। নীলসাহেবের এক পিয়াদা একদিন তার দাড়ি ধরে তাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুঠির দিকে। তার বউটা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার দাদামশাইয়ের কাছে হাজির। আমার দাদামশাই ছিলেন একজন ডাকসাইটে লাঠিয়াল। তিনি খবর শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন শশীকান্তকে নীলসাহেবের কুঠিতে ঢুকিয়ে বেদম মারছে। আমার দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে কুঠি সাহেবের কাছে আর্জি জানালেন, হুজুর শশীকান্তর জমিটা চাকরান জমি, তাতে আবার অল্প জমি—ওকে ছেড়ে দিন দয়া করে। আমাদের গাঁয়ে আরও পাঁচজনের জমিতে আমরা নীল করছি। নীলসাহেব এই কথা শুনে পিয়াদাদের হুকুম করলেন—ঐ ব্যাটার বড় তেজ দেখছি—এর বিবিটাকে ধরে নিয়ে আয়।

"তাই না শুনে দাদামশাই একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালেন না। ছুটে বেরিয়ে গেলেন নমোদের পাড়ায়। নমো পাড়ায় তখন ভূপতির ঠাকুর্দা বেঁচে। লাঠি চালনায় সে ছিল আমার ঠাকুর্দার পরেই। তারা দুজন তখন নমো পাড়ার লাঠিয়ালদের একত্র করে ছুটলেন শশীকান্তকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। নীল কুঠির সামনে গিয়ে যখন তারা হোই ছাড়ল তখন সেখানে বেধে গেল এক বিরাট হাঙ্গামা। একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেল জায়গাটা। নীলসাহেবের বন্দুকের গুলিতে ভূপতির ঠাকুর্দা মারা যান। কিন্তু শশীকান্তকে অপর সবাই ছাড়িয়ে এনেছিল সেদিন।"

সেই শশীকান্তর পৌত্রবধূ মালিনী আজ ধান ভেনে রুটি বানায়। তার মেয়ে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে বিক্রীত। অবনী জানে এসব।

অবনী আর মৃণাল মজুমদার একদিন নীলকুঠি দেখতে গেল।

কথায় কথায় অবনী বলল—"আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাই জলধরবাবু একদিন বলেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে নীলচাষীদের বিদ্রোহই বাঙলায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ইতিহাসের প্রথম স্তম্ভ নির্মাণ

করেছিল। আমরা এমনই অপদার্থ সেই স্তম্ভের ওপর এখনও ইমারত গড়তে শুরু করি নি।"

মৃণাল বলল—"কেন করেন নি তা ভেবে দেখেছেন কি? আপনি মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। অপরাধ নেবেন না, গান্ধীবাদই কি আপনাদের হাত ধরে রাখে নি?" অবনী উত্তর দিল—"কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের আগে কে হাত ধরে রেখেছিল? মহাত্মা গান্ধী বরং একটা নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন।"

মৃণাল—"ইতিহাসের গতি একটানা চলে না। একটা গণ-বিদ্রোহের পর দেশ যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন দরকার ছিল জাগার আহ্বানের। এমন সময় গান্ধী এসে কিসের আহ্বান দিলেন? সে কি দেশের ঘুমন্ত বিপ্লবী শক্তির প্রতি জাগার আহ্বান, না সে যারা জাগি জাগি করছিল তাদের প্রতি বাকি সবাইর ঘুম ভাঙানোর নিষেধাজ্ঞা?"

অবনী আগে এমন করে ভেবে দেখে নি। কথাটা তার মনের তন্ত্রীতে ঘা দিল। সে চুপ করে ভাবতে লাগল। মৃণাল মজুমদার বলে চলল—

"আজ আপনাদের মতো প্রতিভাশালী যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। নীলবিদ্রোহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার ভার তো আপনাদের ওপরই।" অবনী বলল—"কিন্তু আপনাদের কর্মপন্থার সঙ্গে নীলবিদ্রোহের সম্পর্ক কি? আপনারা তো দেশের অগণিত জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকজন যুবক নিয়ে গুপ্তচক্র গঠন করেছেন। তাতে হবে কি?"

মৃণাল—"যেখানে আছি সেখান থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই আমরা আগে এগিয়ে চলার দল সংগঠিত করছি। আইরিশ বিপ্লবী ম্যাকস্থইনি একসময় বলেছিলেন—'আরম্ভ তো কোনো একসময় করতেই হবে আর প্রথম আরম্ভটা হয়তো ঢিলপাটকেল দিয়েই হবে, তবু আরম্ভ এক জায়গায় করাই চাই।' আসুন না আমাদের দলে, আরম্ভ তো করুন, তারপর এগিয়ে যাবেন।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে অবনী মৃণাল মজুমদারের বিপ্লবী দলে নাম লেখাল। ভাবল, ভোলানাথের সঙ্গে তার ব্যবধানটা এবার কেটে যাবে, আবার দুই বন্ধু জীবন-সংগ্রামে খুব কাছাকাছি দাঁড়াতে পারবে।

[ক্রমশ]

পুস্তক-পরিচয়

এশিয়ার সাহিত্য। নিখিল সেন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা। আঠাশ টাকা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর-একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুইয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।"

অন্যত্র বলেছেন, "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে-আকার ধারণ করিতেছে, যে-সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

এখানে মানুষকে নির্বিশেষ ভাবে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ তাকে দেশকালের গণ্ডিভুক্ত করা হয় নি। কিন্তু মানুষকে দেশকালের গণ্ডিভুক্ত করে দেখলেও উপরের উদ্ধৃতি-নিহিত বক্তব্যের যাথাতথ্যের ব্যত্যয় হয় না, সাহিত্যে দেশকাল গণ্ডিভুক্ত সেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ইংরেজি সাহিত্যে আছে ইংরেজ জাতির আত্মপ্রকাশ। কিম্বা, ধরা যাক বাঙলাসাহিত্যের কথা, এতেও ওতপ্রোত হয়ে আছে বাঙালি জাতির পরিচয়। এবং ভাষাগত পার্থক্য ও অসুবিধার জন্যে সাধারণত সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে থাকে ব্যষ্টিগত, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভাষার সাহিত্যকে কালপ্রবাহের দর্পণে প্রতিভাসিত করা হয়। অথচ সেই বিশেষ সাহিত্যর ইতিহাসে যে মানুষের পরিচয় পাই, সেই মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে অন্যান্য দেশের যে-সব মানুষ জীবনধারণ করেছে, সেই সব মানুষের পরিচয় যদি পাই তাহলে আমাদের জানাটা ব্যাপকতর, বৃহত্তর হয়। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য দেশের সাহিত্যের পরিচয় একটা নতুন স্বাদ দেয়—তা হল বৃহতের স্বাদ, বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র থাকে তা দেখতে পাবার আনন্দ।

কেবলমাত্র ভৌগোলিক যোগসূত্রেই যে মহাদেশের গণ্ডি নির্দিষ্ট, তা নয়; দেখা যাবে এই যোগসূত্রের অলক্ষ্য প্রভাব সেই মহাদেশের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন

দেশের মানুষের মধ্যেও একটা ঐক্যবন্ধনের সূত্র বেঁধে দেয়। এই সূত্র ধরা পড়ে যদি সেই মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাস লেখা যায়।

এমনই এক ইতিহাস লিখেছেন শ্রীনিখিল সেন তাঁর 'এশিয়ার সাহিত্য' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে। সাতশ পৃষ্ঠার অধিক এই গ্রন্থের কলেবর। এশিয়া নামে যে মহাদেশ, যার আকার-আয়তন অন্য সব মহাদেশের তুলনায় বৃহত্তম, যার সভ্যতার ঐতিহ্য প্রাচীনতম, তার সব দেশেরই সাহিত্য ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। বাদ পড়েছে কেবল সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার পাঁচটি প্রজাতান্ত্রিক গণরাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া, কাজাখাস্তান ও তুর্কমেনিস্তান, এবং আধুনিক ভারতের সাহিত্য। যে ছাব্বিশটি এশীয় দেশ ও জাতির সাহিত্য-ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত করে জিপসী ও ভারতের আদিবাসী সাহিত্যের কথা।

আলোচনা যদিও বিশেষ বিশেষ সাহিত্য ধরে বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এই আপাত বিচ্ছিন্ন ইতিহাসগুলি পড়লে একদিকে যেমন তাদের আপন আপন চরিত্রবৈশিষ্ট্য জানতে পারি, অন্যদিকে তেমনি তাদের পারস্পরিক প্রভাব, যোগাযোগ ও সম্পর্কের সূক্ষ্ম বন্ধনগুলিও ধরতে পারি। যেমন, মোঙ্গোল সাহিত্যে 'জাদু মৃতদেহ' নামে গল্পগুচ্ছ আমাদের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র সঙ্গে রীতিমতো মিল রাখে। ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য তো আমাদের রামায়ণ মহাভারতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যখন জয়প্রাণের গল্পে পড়ি (ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য), জয়প্রাণের স্ত্রী লায়ন সারি স্বামীর চিতায় সহমৃতা হবে, তখন মনে হয় এ যেন আমাদের দেশের গল্প পড়ছি।

আসলে কথা হল, এবং এই গ্রন্থ পড়লে সে কথা প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতীয়গণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করাতে, এবং পরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটাতে, এশিয়ার বহুদেশের প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব প্রকটিত হয়েছে। তেমনি মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম অনুপ্রাণিত আরব, ইরান ও মধ্যএশিয়ার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থাৎ ইয়োরোপীয় শক্তি এবং তারই সঙ্গে তার সভ্যতা-সংস্কৃতি যবে থেকে এশিয়ার ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে শুরু করল, তখন থেকে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সংস্কৃতির আদান-প্রদানে যতি পড়ল। সক্রিয় হল পাশ্চাত্য প্রভাব। সেই জন্যেই দেখতে পাই

আধুনিক এশিয়ার প্রায় সব সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব ও রূপের অনুকরণে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যকৃতি গড়ে উঠেছে ও তার তীব্র অনুশীলন চলেছে। কিন্তু এই সব পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যের মধ্যে যে মানুষগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা বা জীবনযাত্রার চিত্র রয়েছে সে মানুষগুলির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র পাশ্চাত্য মানুষের চেয়ে অধিকতর গভীর ও আন্তরিক। আমরা যতটা আগ্রহে পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়ে থাকি তার একাংশ নিয়েও যদি চীনের লেখক লু স্যুন কিম্বা জাপানের শিমাজাকি তোসন-এর মতো লেখকের লেখা (নোবেল প্রাইজ পাবার দরুণ কায়কাবাতার উপন্যাস হয়ত কিঞ্চিৎ পরিচিত) পড়ি তাহলে এশিয়ার সং আমাদের আত্মীয়তা খানিকটা অনুভব করতে পারি—তাতে আমাদের নিজেদের পরিচয়ই আরো বিস্তৃত ও গাঢ় হয়। তাছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহিত্যের কিছু কিছু নিজস্ব রূপ বা প্রকাশভঙ্গি অনুধাবন করে আমরা আমাদের সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি। জাপানী ছোট কবিতা হোক্কু, হয়কু, নো (Noh) নাটক (ইয়েট্স এই নাট্যরূপ অনুশীলন করেছিলেন এবং বালোচ লোকগীতি দেহী তথা লীকোর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্রীনিখিল সেন তাঁর 'এশিয়ার সাহিত্য' গ্রন্থে যা করেছেন, অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্লোকের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ঘাটন, এমন কাজ ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষায় তো বটেই, ভারতীয় অন্য কোনো ভাষাতেও হয় নি। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় করা হয়েছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র শিপ্‌লে সাহেবের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ লিটেরেচার' নামে বইটির কথা মনে পড়ে। তবে শিপ্‌লে সাহেব ও বই নিজে লেখেন নি, বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লিখিয়ে সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু নিখিল সেন এক হাতে কাজ করেছেন। এই চমৎকারিত্ব ছাড়াও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায়, তথ্যাদির অতি-পরিশ্রম-নির্ভর সমাহরণে, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়, এবং মনোহরণ প্রকাশভঙ্গিতে। বিশেষ করে লক্ষণীয়, তিনি সাহিত্যের ইতিহাস বা পরিচয় দিতে গিয়ে নিছক লেখক ও লেখার পরিচয় এবং তৎসংক্রান্ত সনতারিখে তাঁর বিবরণ সীমিত রাখেন নি। দেশ ও জাতির জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস যে সূক্ষ্মভাবে জড়িত থাকে, সেই সূক্ষ্ম বন্ধন, সেই আন্তর রহস্যের সন্ধানও দিতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন এবং সক্ষমও হয়েছেন। গ্রন্থটির মর্যাদা এই কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখক সবিনয়ে জানিয়েছেন যে এ গ্রন্থের উপাদানগুলি মৌলিক নয়, 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' সূত্র থেকে নেওয়া। অর্থাৎ মূল ভাষার মাধ্যমে তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য পাঠ করে তাঁর আলোচনা লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানত ইংরেজি ভাষায় লিখিত বইপত্রের উপর। কিন্তু একলা হাতে লিখতে গিয়ে এ ছাড়া তাঁর আর করবার কী ছিল। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে এশিয়ার অতগুলি ভাষায় পারঙ্গম হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। তারপর, তিনি বলেছেন যে তিনি পেশায় সাংবাদিক এবং সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তিনি এশিয়ার সাহিত্য-সংবাদ পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। আমার তো মনে হয় এ গ্রন্থ তথাকথিত গবেষণাগ্রন্থ হলে (বাঙলা গবেষণাগ্রন্থের কথা মনে করতে হবে) তা এমন সুখপাঠ্য কখনোই হত না। সাংবাদিকের কলমই তাঁর লেখাকে এমন প্রাঞ্জল এবং তথ্যাদির পরিবেশন এমন সৌষ্ঠবমণ্ডিত করতে পেরেছে। গ্রন্থটি সব রকম পাঠকের কাছেই সে কারণে আবেদনপুর্ণ হবে।

বইটি পড়ে আমার মনে পড়ল বিশেষ করে দুটি ইংরেজি বইয়ের কথা। বইদুটির একটি হল লরি ম্যাগ্‌নাসের 'এ হিস্ট্রি অফ ইয়োরোপীয়ান লিটেরেচার,' অপরটি হল জে.বি. প্রিস্টলের 'লিটেরেচার অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন ম্যান'। ম্যাগ্‌নাস সমগ্র দৃষ্টিতে দেখে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছেন। প্রিস্টলে সাহেবের বইও সাহিত্যের ইতিহাস, তবে তিনি দেখিয়েছেন সাহিত্যের মুকুরে পাশ্চাত্য মানবের স্বরূপ কীভাবে ফুটে উঠেছে। এবং তিনি বলেছেন ওয়েস্টার্ন ম্যান বা পাশ্চাত্য মানবের গণ্ডি হল এশিয়াকে বাদ দিলে যা থাকে। প্রিস্টলে ও ম্যাগ্‌নাস সাহেবের বইয়ের ধরনে এশিয়ার সাহিত্য নিয়েও বই লেখার অবকাশ আছে। শ্রীনিখিল সেন নিজেই এমন কাজে হাত দিতে পারেন। সে যাই হোক তাঁর বর্তমান বইটি বাঙলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন এবং আকর-গ্রন্থ স্বরূপ হয়ে থাকবে।

আদিত্য ওহদেদার

অতুলপ্রসাদ [অতুলপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে] বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বাগর্থ, কলকাতা। ছয় টাকা

আমাদের ছেলেবেলায় অতুলপ্রসাদের গানের চল ছিল, গাইবার লোকও কিছু ছিলেন। কিন্তু তারপর অতুলপ্রসাদের গানের চল কমে গিয়েছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চাপে। ইদানীং অতুলপ্রসাদের গান ফিরে এসেছে সগৌরবে এবং

জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অতুলপ্রসাদের জীবন কথাও কয়েকখানি প্রকাশিত হয়েছে। যে বই সম্পর্কে এখানে লিখছি তার মূল্য আলাদা। কেননা, অতুল-প্রসাদের কর্মীজীবন ও কবি-গীতিকারের গায়ক জীবন কেটেছে উত্তর প্রদেশে লখনউ শহরে আর এই বইটির লেখক বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯২৪ সাল থেকে অতুলপ্রসাদের মতবন্ধন ছিন্ন হওয়া অবধি অতুলপ্রসাদের সহচর ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। কাজেই তাঁর বইটির মূল্য অন্যান্য বইগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; গায়ক ও চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল অতুলপ্রসাদের কথা লিখছিলেন 'দেশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিন্তু তার মধ্যে নিজের কথাই বেশি ছিল। কাছের মানুষ অতুলপ্রসাদ ফুটে উঠেছেন বিনয়েন্দ্রবাবুর সুখপাঠ্য বইটিতে। অতুলপ্রসাদের গান গাইতে গাইতে অনেকের চোখে জল দেখেছি, এখন তন্ময়তা রবীন্দ্রনাথের গানেও বেশি দেখি নি। এবং তখন থেকেই ভেবেছি, হৃদয়ের কোনো না ভুলতে-পারা বেদনা, কোনো না ভরতে পারা শূন্যতা অতুলপ্রসাদের এই করুণ-মধুর গানগুলির উৎস। সেই বেদনার নিগূঢ় উৎসটিকে নিশ্চিত, বিশ্বাস্য তথ্য দিয়ে, অতুলপ্রসাদের নিজের মুখের কথা দিয়ে গান দিয়ে বিনয়েন্দ্রবাবু উদ্‌ঘাটিত করেছেন—যা পড়ে যে-কোনো সহৃদয় পাঠক অতুলপ্রসাদের ট্রাজিক জীবনটিকে সহানুভূতির হাতে ছুঁয়ে রাখবেন। একদা যে মাতুলকন্যাকে জীবনে সহধর্মিণী-রূপে গ্রহণ করেছিলেন বিলেতে গিয়ে, তারই সঙ্গে মিল হল না। কেননা, হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের মাতৃদেবীকে বা ভগ্নীদের সহ্য করতে পারেন নি। মাতা ও পত্নী উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিন-দিন ক্ষতবিক্ষত হলেন অতুলপ্রসাদ—মনোজগতের সেই রক্তাক্ত মানচিত্র কেউ ঠিক দেখাতে পারেন না। বিনয়েন্দ্রবাবু স্বল্পকথায়, সরু রেখায় তার অনেকটাই আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সম্পর্কে বলেছেন, রাজসভার ঈর্ষা-নিন্দার মধ্যে থেকেও আনন্দের সোনার পদ্ম তিনি ফুটিয়ে গেছেন। অতুলপ্রসাদের কোনা কোনো গান একান্তই ব্যক্তিজীবনের স্পর্শজাত, কিন্তু সংগীতের স্বর্ণকমলের অধিকাংশই তাঁর প্রশান্ত সমাহিত চিত্তের সৃষ্টি।

বিনয়েন্দ্রবাবুর বইটি অতুলপ্রসাদের জীবনী নয়, অতুলপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনাকালে তিনি স্বভাবতই অতুলপ্রসাদের ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পেশ করেছেন। বইটির শেষে অতুলপ্রসাদের গানের কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদ, অতুলপ্রসাদের দানপত্র, ঘটনাপঞ্জী সন্নি-

বেশিত হওয়ায় বইটির মর্যাদা বেড়েছে। তবু বলতে হয় বইটিতে উনবিংশ শতকের বাঙলার রেনেশাঁস বা নবজাগরণ, বা ওয়াজিদ আলি শাহের প্রসঙ্গ না থাকলেও ক্ষতি ছিল না এবং শ্রীকালীপদ দেবশর্মার রচিত 'অতুল প্রণাম' কবিতাটিকে সংযুক্ত না করলে বইটির সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকত। প্রকাশক কি অতুলপ্রসাদের একখানি ভালো ছবি পরিচ্ছন্ন ভাবে ছাপাতে পারলেন না?

দেবীপদ ভট্টাচার্য

ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে। আজীজুল হক। সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা। দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা

কথাগুলি যখন সোজাসুজি বলা সম্ভব নয়, তখন বাধ্য হয়েই আবরণের আড়াল দিতে হয়। কবির পক্ষে এ কাজ অতি সোজা। তাই, নানা অলঙ্কারের আড়ালে কবি তাঁর বক্তব্যকে সহজেই হাজির করেন। তাতে সুবিধা এই—প্রয়োজনে 'সে জন যেমন দেখে' তেমন দেখার একটা সহজ অবকাশ থাকে। কবি-অধ্যাপক আজীজুল হক 'ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে' কাব্যগ্রন্থে এ দেখার সুযোগ আমাদের দরাজ হাতেই তুলে দিয়েছেন।

এই সেদিন পর্যন্ত যাঁরা স্বদেশে প্রবাসী ছিলেন, তাঁদের পক্ষে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ কতটুকুই বা ছিল? আর বিশেষ করে যখন কোনো কবি বা সাহিত্যিক পাক-সরকারের পরিচালনাধীন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন তখন বাক্-স্বাধীনতা তাঁর কতটুকুই বা ছিল? এমন অবস্থায় একজন কবির তো নিঃসঙ্গতার শিকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কবি আজীজুল হক তাঁর নিজের ভাষায় নিজে যেন "...নক্ষত্র এক দূরত্বের নিঃসঙ্গ শিকার।"

অথচ কবি-স্বভাব তো মোলেও যাবার নয়! বন্ধন কঠিন হলে প্রকাশের পথ তিনি সহজ করে নেবেনই। কবিতা নির্মাণ, তা কবি স্বভাবের কাজ। মিথ্যা যেমন তাঁর স্বভাবে সয় না, বন্ধনও তিনি মানেন না। আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আর যাই হোক, শিল্প-সাহিত্য হয় না। আত্ম-প্রবঞ্চনা করা সৎ ও মহৎ কবির কর্ম বা চরিত্র নয়। কবিতার ব্যাপারীদের কথা বলছি না, বলছি কবির কথা। এমন নোংরামী হয়ত ব্যাপারীদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু কবির পক্ষে নয়। যাঁরা চরিত্রহনন আর আত্ম-উন্মোচনের মধ্যে প্রাচীর তুলতে পারেন না, তাঁরা কখনোই প্রবঞ্চক হতে পারেন না এবং ব্যাপারীর ব্যবসাতেও নামতে পারেন

না। কবি আজীজুল হকের কবিস্বভাব ও কবিতার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। নিঃসঙ্গ শান্ত স্বভাবের মানুষটির ছাপ তাঁর কবিতার মধ্যেও রয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে কবিকে জানি বলেই একথা দৃঢ় ভাবে বলতে পারছি।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানের, আজকের বাঙলাদেশের, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কি ছিল তা আর পশ্চিম বাঙলার মানুষের কাছে বলার বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সকলের কাছেই তা আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেদিন পর্যন্ত সমগ্র দেশের জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তা যেমন দুরন্ত হতাশায় অন্ধকারের ছায়ায় অনেককে অন্তর্মুখীন করে তুলেছিল, তেমনই যাঁদের দেখার চোখ ছিল তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন দেশের জনমানসের বিপুল পরিবর্তন, নূতনতর রূপ এবং সম্ভাবিত উজ্জ্বল ভবিষ্যত। কবি আজীজুল হক এই হতাশার অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন 'ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে।' হতাশায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বোধ নিঃসন্দেহে যেমন তাঁর অন্তর্মুখীন চিন্তায়—"প্রত্যেক নক্ষত্র এক দূরত্বের নিঃসঙ্গ শিকার"—এই উপলব্ধি দিয়েছে, তেমনই তিনি বুঝতে পেরেছেন,

> "সোনালী কাঁকড়া দাঁতে, হলুদ পতঙ্গে খাবে
> ছিঁড়ে ছিঁড়ে উদ্বৃত আমাকে।"

আর যখন তিনি বলেন,

> "ঘৃণার বুদবুদ আর ক্ষোভের তরঙ্গ আর স্রোতের আবর্ত দিয়ে যাকে
> সমুদ্র লুকিয়ে রাখে অতল গভীরে
> তাকে প্রেম দেবে বলে ঝিনুকের ঠোঁটে
> ঠোঁট রাখে সূর্যের হৃদয় ;"

তখন 'যাকে' কি চিনতে আমাদের ভুল হয়? এই ভাবেই কবি আবরণের আড়ালে নিজেকে রেখেছেন। নিজের অবস্থান সম্পর্কে অপর একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

> "হে হৃদয় সূর্যের নিকট তোমাকে,
> আত্মাকে রেখেছি ভরে শামুকের খোলে ;"
>
> [বিষণ্ণ সে]

আর এই শামুকের খোল থেকেই কবি দেখেছেন,

> "একটি যন্ত্রণা পড়ে আছে। যেন এক মানুষ শুয়ে আছে
> শয্যায়। যেন এক প্রবীণ সমাজ

আর সব সেকালের সমাজের মতো
ছাড়বে খোলস,”

এবং এই খোলস ছাড়তে গিয়ে তার অবস্থা কি হয়েছে ? কবির ভাষায় ঃ

“……এখন কেবল
শব থেকে শবের সিঁড়িতে একটি আকাঙ্খা হেঁটে যায়
জীবনের নামে, এখন সে জীবনের নাম
স্বপ্ন আর রক্ত আর ঘাম।”

[যন্ত্রণা]

কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জেনে কি থেমে থাকা যায় ? কবি তাঁর নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন,

“কী করে পারবে তবে রক্ত মাংস বুদ্ধি জ্ঞান নিয়ে
মহান কঙ্কাল থেকে দূরে সরে যেতে ?
যেমন পারে না যেতে বালুকার তৃষ্ণা থেকে মরুভূমি সরে
আগুনের শিখা থেকে সূর্যের শরীর,
গতি থেকে ধাবমান তীর,
জ্ঞান থেকে জ্ঞানের যন্ত্রণা।”

[হাড়]

আর উদ্ধৃতি না দিয়ে কাব্যখানি পাঠকের সাক্ষাৎ আস্বাদনের জন্য রাখলাম। এই কাব্যগ্রন্থে এমন বহু স্তবক আছে যা কাব্য-পাঠকের মন আলোড়িত করবে। অবশ্য দু-একটি কবিতায় স্বাভাবিক ভাবে অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশের প্রভাব আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কাব্যে কবির স্বতন্ত্র সত্তা বিশেষ ভাবে উপস্থিত। কোনো কোনো কবিতায় আলো-আঁধারির খেলা আছে যা কবির নিঃসঙ্গ একাকীত্ব বোধের ফলশ্রুতি। এই সব কবিতার এক একটি পংক্তি মাঝে মাঝে যেন অন্ধকার আকাশের কোলে বিদ্যুতের চমক দেয়। কবি আজীজুল হকের অনেক কবিতা তাই পাঠককে চমৎকৃত করবে, অনেক খানি পথ চলার আলো আর আনন্দ দেবে—এ ভরসা পাঠকেরা অবশ্যই রাখতে পারেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থে এমন কতকগুলি কবিতা রয়েছে যা সাধারণ ভাবে বলা হয় ‘শুদ্ধ শিল্পের’ কবিতা, যেগুলি ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে ‘সহজাত বৃত্তি’ নির্ভর, ‘প্রবৃত্তি’ নয়।

দুটি কবিতা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে—'নামতা' ও 'ভেড়ামঙ্গল কাব্য'। এই কবিতা দুটিতে কবি বাক্‌সংযম দেখিয়েছেন, স্বল্প কথায় যে কি অমোঘ শব্দের বাণ নিক্ষেপ করা সম্ভব তার নিদর্শন এই কবিতা দুটি। বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও যিনি বিদ্রূপ করতে পারেন তিনিই তো যথার্থ জীবন রসিক। আমরা কবির পরবর্তী কাব্যের প্রত্যাশায় রইলাম।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কল্যাণী প্রকাশন, কলকাতা। ছ-টাকা

লোকসংগীত মাত্রেরই কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে। কেবল গ্রামে প্রচলিত অথবা উদ্ভূত হলেই সেই সংগীত লোকসংগীত হয়ে ওঠে না। কোনো একটি অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীত নিঃসন্দেহে সেই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বার্তাবহ। তাছাড়া নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংগীত না হলেও কোনো গানকে আঞ্চলিক লোকসংগীত বলা চলবে না। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে লোকসংগীতের প্রাথমিক রূপটিকে চিনে নিতে হয়। এই লক্ষণগুলি হল আদিমতা, অকৃত্রিমতা, গোষ্ঠীবদ্ধতা, প্রথানির্ভরতা ইত্যাদি। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে। আঞ্চলিক লোক-চরিত্র, লোক-ভাষা, লোক-ভাব এবং লোক-সুরের প্রতিফলন না ঘটলে কিছুতেই আঞ্চলিক লোকসংগীত সৃষ্ট হয় না।

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত' গ্রন্থটি আলোচনা করতে বসে স্বভাবতই উপরের কথাগুলি বলে নিতে হল। উত্তররাঢ় হিসেবে তিনি সমগ্র বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা বেষ্টিত অঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এই অঞ্চলের পূর্বদিকের সীমা হল ভগীরথী নদী এবং দক্ষিণদিকের সীমা হল অজয় নদ। গ্রন্থের ভৌগোলিক সীমায় কোনো গোলযোগ নেই, কিন্তু ছিদ্রসন্ধানী পাঠকেরই হঠাৎ মনে হতে পারে যে বীরভূম জেলার অধিবাসী লেখক প্রধানত বীরভূম জেলার প্রতিই দুর্বলতা দেখিয়েছেন বেশি। তবে তাতে বিশেষ কিছু বোধ-হয় আসে যায় না। কারণ বীরভূম জেলা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে উত্তররাঢ়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত।

লেখক তিনটি পর্বে গ্রন্থটি ভাগ করেছেন এবং পরিশিষ্ট অংশে লোকসংগীতের

কিছু আকর্ষণীয় উদাহরণও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমপর্বে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, আঞ্চলিক চেতনা, জনজীবনের কামনা বাসনা এবং লোকসাংগীতের উৎসভূমি, সংগীতের বৈশিষ্ট্য এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের আলেচনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। উত্তররাঢ় অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ ও ঐতিহ্যই যে গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও সামাজিক উৎসবে সংগীতের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে লেখকের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে ধর্মের সঙ্গে লোকসংগীতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের বক্তব্য মূল্যবান। তবে এই পর্বেই লোকসংগীতের সুর ও তালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা থাকা উচিত ছিল। অন্যান্য ধরণের পল্লীসংগীতের সংগে লোকসংগীতের পার্থক্য কোথায় এ ব্যাপারেও দিলীপবাবু নীরব থেকে গেছেন। এর ফলে অসুবিধা হয়েছে এই যে উত্তররাঢ়ে প্রচলিত যে কোনো পল্লীসংগীতকেই লেখক লোকসংগীত আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু বোধহয় তা হওয়া উচিত নয়। যেমন দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখিত লোকসংগীত-গুলির মধ্যে পটুয়া, বেদের গান, আলকাল, হাপু, লেটো, বিজয়ার গান বা মনসা পূজার গান বোধহয় লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। এদের মধ্যে কোনোটি ছড়া, কোনোটি বা ব্যক্তিবিশেষের রচনা। মোট কথা এদের জাত আলাদা। ভাদু গান নিঃসন্দেহে লোকসংগীত। তবে যতদূর জানি এর বিশেষ প্রচলন উত্তররাঢ়ে নয়, পুরুলিয়া—বাঁকুড়া—মেদিনীপুর অঞ্চলে।

উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। তৃতীয় পর্বে বাউল, কবিগান ও কীর্তনকে উত্তররাঢ়ের লোকসংগীত বলা হয়েছে। প্রথম কথা এই তিনটি গান কোনোমতেই লোকসংগীত নয়। দ্বিতীয়ত এগুলি বাঙলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ, কেবল উত্তররাঢ়ের মধ্যেই এদের প্রচার সীমিত নয়। তাছাড়া সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংগীতকেও উত্তররাঢ়ের বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতিকে উত্তররাঢ়ী বলা চলে না। এবং আদিবাসী সম্প্রদায় যেহেতু এতদঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই কারণে তাদের মধ্যে প্রচলিত সংগীত আঞ্চলিক লোকসংগীত হয়ে উঠতে পারে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

কিন্তু এ সমস্ত প্রশ্নের কোনোটিই নিছক ছিদ্রান্বেষণের জন্য উপস্থিত করা হয় নি। সমালোচক আলোচ্য গ্রন্থটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলেই অত্যন্ত বিনীত ভাবে এই কথাগুলি তাকে বলতে হয়েছে। যে শ্রম, নিষ্ঠা

বৈজ্ঞানিক চেতনা ও সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখক উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতের এই ইতিবৃত্তটি প্রস্তুত করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষ করে এই জনপদের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কথা লেখক এখানে অভিজ্ঞ আন্তরিকতার সঙ্গেই চিত্রিত করতে পেরেছেন। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উত্তররাঢ়ের সামাজিক ইতিহাস উপলব্ধিও অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন এবং তারই ফল এই গ্রন্থ। ফলে এই গ্রন্থটি কেবল উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতের সংকলন গ্রন্থ নয়, এটি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলের লোকজীবনের ইতিহাসও বটে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

Bangla Desh Economy—Problems and Prospects, Edited by V K R V Rao, Institute of Economic Growth, Delhi. PP 199 Rs 24

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পূর্ববাঙলা অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে এ দেশের পত্র-পত্রিকায় খুব কম প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে আরও কম। পাকিস্তানের অর্থনৈতিকগবেষণা বিষয়ক পত্রিকা Pakistan Development Review-তে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে মাঝে মাঝে কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আর যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ। দুঃখের বিষয়, প্রতিবেশী পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌রা খুব বেশী চর্চা করেন নি। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সাধারণভাবে পাকিস্তানের, এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ভারতে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ ভি, কে, আর ভি. রাও সম্পাদিত এই পুস্তকটি বাংলাদেশের অর্থনীতি-সম্পর্কীয় আলোচনার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কিছুকাল পূর্বে ডাঃ রাও-এর উদ্যোগে দিল্লীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌ যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন আলোচ্য বইটিতে

তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ডাঃ পি, সি, যোশী এবং ডাঃ বি, এন, গাঙ্গুলী রচিত প্রবন্ধ দুটি এই বই-এর জন্য বিশেষভাবে লিখিত। আলোচনাচক্রে ডাঃ রাও যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাও বইটিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়া বইটির পরিশিষ্টে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান পরিসংখ্যান সংযোজিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুর বিচারে, এই বইটির প্রবন্ধগুলিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমভাগে, গত পঁচিশ বছরে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাবলী ও সে সম্পর্কে ভারতের ভূমিকার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পাকিস্তানের কাঠামোয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং তার ফলে একই দেশের দুই অঙ্গের অর্থনৈতিক কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে, অধ্যাপক অর্জুন সেনগুপ্ত ও শ্রী পি, সি, ভার্মার প্রবন্ধ দুটিতে তার বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক সেনগুপ্তর প্রবন্ধটি যখন গত বছর 'Economic and Political weekly' ও 'Main Stream' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখনই সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ডাঃ যোশী, ডা গাঙ্গুলী ও ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁদের প্রবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাবলী ও তা সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় আলোচনা করেছেন। ডাঃ যোশী জোর দিয়েছেন ভূমি সংস্কারের উপর কারণ তাঁর মতে অবিলম্বে জমির মালিকানা সম্পর্কের আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটালে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হতে পারে। ডাঃ গাঙ্গুলী এক বৃহত্তর পটভূমিকায় বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা আলোচনা করেছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক এ,এম,খুসরো ও অধ্যাপক বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের প্রবন্ধে,ভারত ও বাঙলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে কিরূপ ধারণ করবে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক খুসরো, বাংলাদেশকে ভারতের পুঁজি-লগ্নীর ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার কোনরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে দু'দেশের মধ্যে বেসরকারী লেনদেনের পরিবর্তে সরকারী

পর্যায়েই অর্থনৈতিক লেনদেন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাবলী আলোচনা করেছেন। তিনি দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় কখনই প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের তথাকথিত 'পরিপূরক অর্থনৈতিক সম্পর্ক' পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, সে যুগের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল মূলতঃ শোষণের সম্পর্ক। তিনি পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন।

ডাঃ রাও তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে, শোষণ-মুক্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার উল্লেখ ক'রে বলেন যে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ভারতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্যের ধারা সম্পর্কে তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব রেখেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও সমস্যা পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সব প্রবন্ধের খণ্ডিত চিত্রগুলি একত্র করলে এর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার এক সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই এই সময়োপযোগী বইটি যে বুদ্ধিজীবীমহলে সমাদৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়

আচার্য আলাউদ্দিন

বছর দুয়েক আগে আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ যখন পদ্মভূষিত থেকে বিভূষিত হয়েছিলেন তখন আমরা এই পত্রিকায় তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছি।

তখনই আমরা লিখেছিলাম —আচার্য খাঁ-সাহেব এতোই বৃদ্ধ হয়েছেন যে, বিভূষিত কেন রত্ন লাভ করলেও সেটা তাঁর কাছে বিভূতি মাত্র। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বয়স নিয়ে বেশ একটু তর্ক উঠেছে, তর্কটা এতোদূর গড়িয়েছে যাতে সামান্য কিছু বলতে হয়। কিন্তু তথাপি প্রশ্নট আমাদের কাছে বেশ খানিকটা অবান্তর বলেই মনে হয়।

'পরিচয়'-এর উক্ত প্রবন্ধে আমরা তখনই তাঁর জীবনভর বিচিত্র ও কঠোর তপস্যার কথা বলেছি যার খানিকটা পুনরুক্তি এখানে করতেই হবে। ১৯৫৭ সালের অকটোবর মাসের এক শরৎ সন্ধ্যায় নিখিল ভারত শান্তি সংসদ একটি ঘরোয়া সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। সভায় তিনি নিজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সেটি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়। সেই বছরের নবেম্বর কি ডিসেম্বর সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক'-এ শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ তার সরস বর্ণনা দিয়েছেন। পরে দেখেছি ত্রিশ দশকে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন বাসকালে আচার্য খাঁ-সাহেব নিজ মুখে তাঁর যে বিচিত্র জীবনকাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন, তার সঙ্গে সেদিনের বর্ণনা মিলে যায়।

বারো-তেরো বছর বয়সে কুমিল্লার শিবপুর গ্রামের ছোট ছেলেটি বাড়ি থেকে পালিয়ে সঙ্গীত শিক্ষালাভের জন্য ও প্রকৃত গুরুর সন্ধানে কলকাতা এসে পথে পথে ঘুরে শেষ অবধি পাথুরিয়া ঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে এক নাগাড় সাত থেকে আট বছর স্বরসাধনার একেবারে গোড়াকার তালিম পান। গুরু গোপালচন্দ্রের, ওরফে নুলো গোপালের, মায়া পড়ে যায় ছেলেটির পরে। ছেলেটিকে ধ্রুপদী স্বরসাধনার গোড়াকার তালিম তিনি ভালো করেই দিয়েছিলেন।

সাত-আট বছর এই শিক্ষা চলবার পর ছেদ পড়ে যখন নুলো গোপাল মারা যান কলকাতার প্লেগে যেটা ঘটেছিল ১৮৯৮ সালে। ১৮৯৮ সালে তাহলে আলাউদ্দিনের বয়স ছিল ২০ থেকে ২২-এর মধ্যে, তাহলে তাঁর জন্ম ১৮৭৮ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে। তাঁর বয়স সম্পর্কে জল্পনা এতো চলেছে যে, এই সামান্য তথ্যটুকু পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই অবান্তর আলোচনার এখানেই ছেদ টানছি।

নুলো গোপাল থেকে হাবু দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের খুড়তুতো ভাই), পরে আহমেদ আলীর কাছে স্বরোদের তালিম, সর্বশেষে রামপুর-ওয়াজির খাঁর কাছে বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের পরে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু আসল শিক্ষা এতো কষ্ট করেও লাভ হল না।

আসলে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্য সম্পর্কের ভালো দিক যেমন ছিল, মন্দ দিকও তেমনি কম ছিল না। আলাউদ্দিনের মতো গরীব অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রের অবস্থা খানিকটা মধ্যযুগের ভূমিদাসের মতো। গুরুকে সেবা করতে হবে সারাদিন, আর তার বদলে যদি পারো তো নিজস্ব সময়ে কিছু কিছু শিখে নাও। শেখানোর পদ্ধতিটা বেশির ভাগই মুখে মুখে। আলাউদ্দিন শ্রুতিধর ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শিক্ষা লাভ করা।

আজকাল অবশ্য স্কুল-কলেজের ধরনে খানিকটা ক্লাস করে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। জানি অনেকেই বলবেন যে, আমাদের সঙ্গীতে ব্যক্তিগত তালিম না পেলে সঙ্গীতের আসল শিক্ষা হয় না। আমাদের মতে যখন গোড়ার দিকে ছাত্রের হাত বা গলা তৈরি করা হচ্ছে এবং রাগরাগিনীর কাঠামো, তাল-লয় ছন্দ ইত্যাদির গোড়াকার জিনিসগুলি বেঁধে দেওয়া হচ্ছে তখন আগেকার মতন খানিকটা গুরুর খেয়াল-খুশি মাফিক তালিমের বদলে স্কুল-কলেজের ধরনের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিই ভালো। পরে অবশ্য যখন রাগের ভেতরে ঢুকছে, এবং রাগের রূপরসের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে, তখনই গুরুর কাছে ব্যক্তিগত তালিমের প্রয়োজন। সেখানেও অবশ্য আধুনিক যুগের টেপ রেকর্ড ইত্যাদির কল্যাণে ঘরানার গোঁড়ামি ক্রমশই ভাঙছে, যদিও ভাতখণ্ডে থেকে অনেকের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতকে এখনও পুরো নিয়মতন্ত্রের মধ্যে (codification) বাঁধা সম্ভব হয় নি।

যাই হোক আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব পুরাতন গুরু-শিষ্য প্রথায় শিক্ষা

দেওয়ার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল উদাহরণ। উত্তর জীবনে তিনি নিজে ও গুরুকুল প্রথায় তিমিরবরণ, নিখিল ব্যানার্জি এবং সর্বশেষ তিমিরবরণের ছেলে ইন্দ্রনীলকে তৈরি করে গেছেন। অবশ্য তাঁর নিজের ছেলে আলি আকবর, কন্যা অন্নপূর্ণা ও পরে জামাতা রবিশঙ্করকে তালিম দিয়েছেন একসঙ্গে।

মাইহারে গিয়ে দেখেছি জীবনের শেষ কুড়ি বছরে তিনি বেশ কিছু জায়গা-জমি এবং ছোট বাড়ি করে গেছেন। ইচ্ছা ছিল তাঁর অবর্তমানে মাইহারে তাঁর বাড়ি ও সংলগ্ন জমিতে বড়ো সঙ্গীত-বিদ্যালয় ও সঙ্গীত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। আশা করি সেটা একদিন সম্ভব হবে।

আলাউদ্দিন ঘরানা

আলাউদ্দিনের গুরু ওয়াজির খাঁ মিয়া তানসেনের দৌহিত্র বংশ, বড়ো ধ্রুপদী ও বীণকার। ইচ্ছা ছিল বড়ো ছেলে সগীর খাঁকে সেইভাবে তৈরি করবেন। অপরিসীম সাধনার বলে এবং খানিকটা ভাগ্যক্রমে (সগীর খাঁ অকালে মারা যান) আলাউদ্দিন সেই ঘরের উত্তরাধিকার পেলেন। কিন্তু মেধাবী ছাত্রের যা বৈশিষ্ট্য, আলাউদ্দিন কেবলমাত্র গুরুর শিক্ষাকে আত্মস্থ করেন নি। তাকে আরো অনেক বাড়িয়েছেন। শ্যামল বাঙলার লোক সঙ্গীতের জলে-ভেজা যে মিষ্টি রস জন্মগতকারণে তাঁর মজ্জায় মজ্জায় রয়েছে, সেটা এমনভাবে তাঁর হাতে দরবারী ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাজে মিশেছে যে বিস্মিত হতে হয়। ধ্রুপদী তন্ত্রবাদের কাঠামো ভাঙে নি, রাগ রূপায়ণে কোথাও এতোটুকু বিচ্যুতি নেই—অথচ এতো জনপ্রিয়তা কারণ আলাউদ্দিন, বিশেষ করে তাঁর ছেলে আলি আকবরের হাতে, রাগসঙ্গীতের প্রাণ যে সুস্বর (melody) তা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি, virtuosity বা কেরদানির স্থান সেখানে গৌণ।

জীবনভর কঠোর সাধনা ও তপশ্চর্যা করে পঞ্চাশোর্ধ্বে আলাউদ্দিন তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ছেলে বয়সে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দ্বার থেকে দ্বারে বঞ্চিত হয়েছেন। এমন কি বহু কষ্টের পর যখন ওয়াজির খাঁর কাছে প্রথম শেখবার অনুমতি পেলেন, তখনও বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েছেন। ওয়াজির খাঁর বড়ো ছেলে সগীর খাঁর মৃত্যুর পরে গুরু ওয়াজির খাঁ ভেঙে পড়লেন এবং আলাউদ্দিনের মেধা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদানে তাঁকে আসল শিক্ষা দিলেন।

এই কঠোর তপশ্চর্যার ও নিদারুণ বঞ্চনার প্রভাব আলাউদ্দিনের সঙ্গীতে এমনভাবে পড়েছে যাতে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর বাদন যেন খানিকটা নিষ্করুণ, যেন বৈরাগ্যের সুষমায় মণ্ডিত; অথচ বাঙলার লোক-সঙ্গীতের বহু ছোঁয়ায় একাধারে মিষ্টি অন্যদিকে ব্যাকরণ-শুদ্ধ। এমন কঠোর-কোমলে মিলন খুব কম পাওয়া যায়।

পুত্র আলি আকবর এখানে একটু আলাদা। তাঁরও প্রথম জীবনে কেটেছে কঠোর সাধনায়, যার মধ্যে পিতার কাছে প্রহারও বাদ ছিল না। কিন্তু পিতার মতো দ্বার থেকে দ্বারে বঞ্চিত হয়ে তাঁকে ঘুরতে হয় নি। মাইহারের পাহাড়ে ঘেরা ধূসর দিগন্তের শান্তিময় পরিবেশে একাগ্রচিত্তে সাধনার যে সুযোগ আলি আকবর পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর বাদন কোমল-মধুর, কখনো বা ভক্তিরসে আপ্লুত, কখনো বা শৃঙ্গার রসে একটু চপল, একটু লাস্যময়; কেবল একবার তাঁর হাতে রৌদ্ররসের বাজনা শুনেছি। সঙ্গীতে বীররস পরিবেশন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু রৌদ্র বোধহয় বিরল। পিতার তৈরি ঘরের উপর যে ইমারত আলি আকবর গড়ে তুলেছেন, সেখানে অবশ্য তিনি একক। দরবারী সাজে শ্যামল বাঙলার এমন কবিত্বময় রূপ আর দেখা যায় না। এখানে তিনি আবার তাঁর গুরু আলাউদ্দিনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

সঙ্গীত জগতে আলাউদ্দিন মহর্ষি, দার্শনিক; পুত্র আলি আকবর এক কথায় কবি। রবিশঙ্কর এখানে একটু আলাদা। প্রজাপতির চঞ্চলতা এসেছে ধ্রুপদী অতলস্পর্শী গভীরতাতে প্রধানত তাঁর নানা রঙের বোলের মাধ্যমে। আর জুড়িতে দুই মহারথীর দুজনেই বিশ্বজয় করেছেন) মিল যেন প্রয়াগ-সঙ্গম, যদিও অদৃশ্য সরস্বতীর ধারাটি এসেছে কন্যা অন্নপূর্ণার সুরবাহারে—অতি অল্প ভাগ্যবানেরই সেটা শোনবার সুযোগ হয়েছে।

আলাউদ্দিনের সৃষ্ট এই সঙ্গীতকে স্বর্গীয় বলব না, জনজীবনের মর্মমূল থেকে উঠে এসে ধ্রুপদী অতলস্পর্শী গভীরতাতে দরবারী সাজে এই সঙ্গীত অপরূপ সুষমামণ্ডিত।

আচার্য আলাউদ্দিনের অমর স্মৃতির প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধা জানিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলব তিনি বা তাঁর সঙ্গীত বেঁচে আছে, থাকবে আরো সমৃদ্ধতর হয়ে তাঁর পুত্র আলি আকবর প্রমুখ অগণিত শিষ্য ও গুণগ্রাহীর মধ্যে।

দিলীপ বসু

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু একটি প্রখ্যাত নাম। কেন তাঁর এই খ্যাতি প্রশ্ন করলে নানা উত্তর আসবে। নৃবিদ্যাবিদ ও গান্ধীবিদ হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বিশেষ ভাবে পরিচিত। অধ্যাপক হিসেবে নৃবিজ্ঞান ছাড়াও বহু বিষয়েরই তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং গবেষণা পরিচালনা করেছেন। ভূবিজ্ঞান, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, নন্দন তত্ত্ব, ইতিহাস, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, মন্দির তত্ত্ব নিয়ে তাঁর অধীনে গবেষণা করেছেন বা তাঁর সাহায্য নিয়েছেন দেশ বিদেশের বহু ছাত্র। সাধারণের কাছে তিনি গান্ধীবাদী এবং গান্ধীজীর একান্ত সচিব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই পরিচয় অসম্পূর্ণ। তিনি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতেন এবং আজীবন বিজ্ঞান সাধনাই করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনের কৃতিই হল শিক্ষকতা এবং বিজ্ঞান সাধনা।

ভারতবর্ষের গুটি কয়েক নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীদের মধ্যে নির্মলবাবু নিঃসংশয়ে একজন। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও গান্ধীভক্ত হন নি। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। যা তিনি যুক্তি তর্ক দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি তা সহজেই বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন। গান্ধীজীর রচনা সংকলন করেছেন। গান্ধীজীর মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন, ১৯৪৬-৪৭ সালে গান্ধীজীর একান্তসচিবও ছিলেন; তবুও নির্মলবাবুকে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় দেখা যেত না। গান্ধীজী জানতেন নির্মলবাবু আজীবন সত্যাগ্রহী, তাই ঈশ্বর সম্পর্কে নির্মলবাবুর অনীহা জেনেও তাঁকে একান্তসচিব নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগদান না করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কাজেই নির্মলবাবু ছিলেন প্রকৃত পক্ষে গান্ধী-তত্ত্ববিদ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োগ পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করলেন সত্যাগ্রহ অনুশীলনে। সত্যগ্রহের সামাজিক প্রভাব, মূল্যবোধ, কার্যকারীতা সম্পর্কে তিনি গবেষণা স্বরু করলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্র ছাত্রীদেরও এ কাজে উৎসাহিত করলেন। গান্ধীজীর প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা। কিন্তু তবুও সব কিছু মেনে নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বহু বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে। তিনি যেমন তাঁর ছাত্রদের তর্ক করতে উৎসাহিত করতেন তেমনি নিজেও তাঁর গুরু গান্ধীজীর

সঙ্গে তর্ক করতেন নির্ভয়ে। গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি তাঁর চিন্তা রেখে গিয়েছেন 'মাই ডেজ উইথ গান্ধীজী' বইতে।

নির্মলবাবুর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে। এই পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। পুঁথিপড়া জ্ঞান ত ছিলই, উপরন্তু সে জ্ঞান ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশ্রণে দ্যুতিমান। অসাধারণ ভালো ছাত্র হয়েও পড়া ছেড়ে মানবসেবার কাজে লেগে গিয়েছিলেন। মানুষকে জানা, মানুষকে বোঝার জন্য তিনি বলতে গেলে সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে ঘুরেছেন। নগরবাসী, গ্রামবাসী, অরণ্যবাসী মানুষের মধ্যে অনবরত পরিভ্রমণ করেছেন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য। কখনো সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো মন্দিরশিল্প ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে সমাজ সংগঠিত হয়েছে তা জানার জন্য ঘুরেছেন, কখনো প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন, কখনো বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কারণ অনুসন্ধানে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের সন্ধানে ঘুরেছেন। মানুষের প্রতি এই গভীর প্রেম তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও রাজনীতিকে এক করে ছিল। এই জন্য নির্মলবাবুর জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলখানা বার বার ঘুরে এসেছিল। মানুষের প্রতি এই গভীর প্রেমের জন্যই বিদগ্ধ জন থেকে আরম্ভ করে বস্তির সাধারণ মানুষ, ফুটপাথের বইওয়ালা সবাই ছিল আপন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস বুদ্ধিমান ছাত্র থেকে দূর পল্লীর একজন সাধারণ অনুসন্ধিৎসু মানুষ তাঁর কাছে সমান সাহায্য পেয়ে এসেছেন। কর্মক্ষেত্রে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বহু সময়েই মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু কখনো কোনো মানুষ—তা তিনি যত মূর্খ বা পণ্ডিত, যত ধনী বা দরিদ্র হোন না কেন—নিজেকে অবহেলিত বা অশ্রদ্ধেয় বোধ করেন নি। মতবিরোধ সত্ত্বেও তিনি পূর্বসূরীদের প্রতি যেমন ছিলেন শ্রদ্ধাশীল উত্তরসূরীদের প্রতি ছিলেন তেমনি স্নেহপরায়ণ। মতবিরোধ কখনো তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মার্কসবাদী ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারেও কখনো রাজনৈতিক মতামত তাঁর কাছে বিচার্য ছিল না।

গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি রাজনৈতিক মতবাদ নিরপেক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথার বিশ্লেষণে তিনি মার্কসীয় ব্যাখার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। জাতিভেদ

প্রথা ভারতবর্ষের বুকে কেন হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি শাস্ত্রীয় ব্যাখা এবং ভাববাদী ব্যাখ্যা নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি দেখালেন ভারতবর্ষের ভৌমিক ব্যাপ্তি এবং বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখার মূল কারণ। কেবল মাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এ ব্যবস্থা এত দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। বক্তৃতা বা তথাকথিত আন্দোলন করেও এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। শুধু অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করেই এই প্রথার পরিবর্তন সম্ভব। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সময় বহু বার তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতিভেদ নতুন করে দেখা দিয়েছে তা ঠিক নয়। ভোটের জন্য নানা গোষ্ঠী সংকীর্ণতাকে অনেকে কাজে লাগায়। কখনো বাঙালি, কখনো মুসলমান, কখনো বর্ণ জাত ইত্যাদি সংকীর্ণ বোধ উস্কানি দিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করে। জাতিভেদ প্রথা দীর্ঘ কাল থেকে একটি গোষ্ঠী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। কাজেই আধুনিক নির্বাচনে ভোটের জন্য তাকেও কাজে লাগানো হয়। তাঁর অভিমত : ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি পর্যন্ত এই সহজ উপায়ে ভোট সংগ্রহের রাস্তা এড়াতে পারে নি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই নির্মলবাবু গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম-সূচীকে গ্রহণ করেছিলেন। সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি এবং সাংগঠনিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার নেবার পর থেকে নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পত্রিকাটিকে তিনি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের ভার নিয়ে তারও প্রভূত উন্নতি করেন। 'ভারতকোষ'-এর তিনি ছিলেন অন্যতম স্রষ্টা। এনথ পলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়ে তিনি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবন-বিষয়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক খুলে দেন। দর্শনে, কাব্যে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলা হয়েছে বহুবার। নির্মলবাবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সন্ধান করবার চেষ্টা করলেন সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দিক থেকে। সারা ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনের সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করে, বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতের 'পেজেন্ট লাইফ এ স্টাডি অন ইউনিটি ইন দি ডাইভার্সিটি' সম্পাদনা করলেন।

বক্তৃতা এবং বৈঠকী গল্পে নির্মলবাবু ছিলেন অন্য সাধারণ। বাঙলা, ওড়িয়া, হিন্দি, ইংরাজিতে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য সব সময়ই আগ্রহী লোকের সংখ্যা

কম হত না। ইউনেস্কো থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয় (১৯৫৭)। তৎকালীন ডাইরেক্টর ডঃ ভার্সলুই জিজ্ঞেস করলেন নির্মল বসুর বক্তৃতা থাকলে এত লোক সমাগম হয় কেন? বলা বাহুল্য সেই সময় বহু খ্যাতিমান বিদগ্ধ ব্যক্তিই বক্তৃতা করেছেন। তবে পরিসংখ্যান অনুসারে নির্মলবাবুর বক্তৃতাতেই লোক সমাগম হত বেশি।

সব কিছুর ঊর্ধ্বে নির্মলবাবু মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষের ভালোবাসাও তিনি পেয়েছেন। নার্সিং হোমে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নানা দেশের সর্বস্তরের মানুষ ভীড় করেছেন তাঁর কছে।

তাঁর মতো একজন সমাজসচেতন শিক্ষক, বিজ্ঞানী, মানবতাবাদী মানুষের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

বিনয় ভট্টাচার্য

শিল্পী কালীকিংকর

শিল্পী কালীকিংকরের জীবনাবসানে শিল্পী ও শিল্পরসিক মাত্রেই আন্তরিক দুঃখিত। স্রষ্টা শিল্পী হিসেবে কালীকিংকরের বৈশিষ্ট্য এবং বহুমুখিতার সত্যিই তুলনা ছিল না। প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য, স্থির জীবন, জীবজন্তু ও পাখি সমীক্ষণ, মুখাকৃতির রেখাঙ্কন, কৌতুকচিত্র…কি না তিনি এঁকেছেন! আর জল রঙা ও তেল রঙা বনিয়াদী রীতির অঙ্কন থেকে শুরু করে কাঠখোদাই, এচিং (তাম্রফলকে খোদাই), কালিকলমের কারিকুরি, ত্রৈরেখ অঙ্কন, বিমূর্ত অঙ্কন পর্যন্ত কোন আঙ্গিকের না পরীক্ষা করেছেন তিনি! তার মানে ধ্রুপদী ও লৌকিক অঙ্কনকলার যত রকম বিভাগ সেকাল-একালে স্রষ্টাদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোতেই নানা সময়ে হস্তক্ষেপ করেছেন তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। এমন সর্বতোমুখী সৃজনী প্রতিভার অধিকার কমই দেখা যায় কলাকৃতির মুল্লুকে।

কিন্তু এই অসীম সৃজনী শক্তিকে কি কালীকিংকর পুর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে? এ প্রশ্নের জবাব নেতিমূলক। ফেলে ছড়ে অবলীলায় তিনি সব কিছু তৈরি করতেন বলেই নিজের কৃতি সম্বন্ধে ছিল না তাঁর অণুমাত্র দরদ। স্থিতিশীল কোনো কিছু গড়ে তোলা, স্রষ্টা হিসেবে আপন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে যাব বা নিজস্ব একটা ঐতিহ্য স্থাপন করব,তা তিনি একদিনও মনে করতেন না। বকুল গাছের মতো অজস্র সৃষ্টির ঐশ্বর্য তিনি নির্দ্বিধায় চার দিকে

ছড়িয়ে দিতেন, ফিরেও তাকাতেন না কি পরিণাম হল তাদের সেটা দেখার জন্য। আপন সৃষ্টি সম্বন্ধে এই যে নির্লিপ্ততা, এ কি তাঁর স্বভাবগত বিনয় না বৈরাগ্য, না অন্তশ্চেতনার গভীরে কোথাও ছিল তাঁর এমন একটা কোনো জটিল গ্রন্থি, যাকে তিনি প্রসন্ন হাসির সহজতা দিয়ে আড়াল করে রাখতেন ?

ঠিক জানিনে তা। তবে রোজ দেখেছি টেবিলে বসে গল্প করতে করতেই কোন ফাঁকে কলম দিয়ে আশেপাশের ছোটবড় সমস্ত মানুষের মুখ এঁকে ফেলেছেন তিনি, নয়তো উদ্ভট আশ্চর্য বা অবাক হবার মতো এমন একটা কিছুকে রূপ দিয়েছেন যা অতিখ্যাত স্রষ্টা শিল্পীর হাতেও দুর্লভ মুহূর্তে জন্ম নেবার যোগ্য! গিরিমাটি, খড়ি, হলুদ, পোড়া কাগজের ছাই, দোয়াতের কালি যা হাতে পেতেন তা দিয়েই ছবি বানাতেন তিনি। ভক্তেরা যেমন বলেন—হাতে করো কাম, মুখে করো নাম, কালীকিংকর তেমনি যা কিছু করতেন, যা কিছু বলতেন, তারই সঙ্গে ছবি তৈরির কাজ চলত তাঁর এবং তা চলত অনেকটাই যেন কিছু না ভেবেচিন্তে নিছক ভিতরকার একটা তাগিদে আদিষ্ট হয়ে চলার মতো নির্বিবাদে। অনেকটা এই ধরন দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে কাটুম কুটুম বানানোর খেলায়।

কিন্তু এই খেয়াল খেলার মনকে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দিয়ে বাঁধতে চান নি তিনি কোনো দিন। জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে অবশ্য তিনি রাশীকৃত কাজ করে দিতেন এবং যেহেতু সে সবই ফরমায়েসী বা চলতি বাজারের কাজ, তাই তা তাঁর সাংসারিক প্রয়োজনকে সাহায্য করত, কিন্তু কলালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কোনো শ্রেয় সম্পদের অধিকার নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করত না। এই অলভ্য শ্রমেই প্রতিনিয়ত অপচিত হত তাঁর মহৎ প্রতিভা। চলতি চাহিদার মুখে আহার জোগাতে হয় হয়তো কমবেশি সব স্রষ্টাকেই, কিন্তু প্রাত্যহিকের আড়ালে চিরন্তনের তপস্যাকেও যাঁরা জীইয়ে রাখতে পারেন জোর করে তাঁরাই পারেন সময়ের সমুদ্রবেলায় পদচিহ্ন এঁকে যেতে। তা পারার শক্তি পূর্ণ মাত্রায় নিয়েও কালীকিংকর কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করেন নি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতস্তত যা বিতরণ করে দিতেন তিনি, তার মধ্যেই ফুটত তাঁর শিল্পী পরিচয়।

তিরিশ বৎসরেরও বেশি অন্তরঙ্গতা ছিল আমার তাঁর সঙ্গে। ভালোবেসে বহু বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন তিনি আমার। এঁকেছেন কালিকলমে অসংখ্য রেখাচিত্র, দিয়েছেন ফুল পাখি গাছ শিশু অনেক কিছুর হিজিবিজি

নক্সা। দু-একটা মাটির মূর্তি, রুমালের ওপরে করা কারুকর্ম এবং বড় আকারের ত্রিবর্ণ চিত্রও একদা পেয়েছি তাঁর কাছে উপহার হিসাবে। হয়তো পেয়েছেন এই রকম অন্যান্য বন্ধুরাও। কিন্তু সাময়িক পত্রের মুদ্রিত পৃষ্ঠার আড়ালেই থেকে গেছে তাঁর শিল্পী জীবনের সমস্ত কাজ। কেন এমনটা হল? শুনেছি ধনী পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন, চাকরি করেন নি, পেশাও করে তোলেন নি শিল্পচর্চাকে। তাই ওটা ছিল তাঁর চিরদিনই খেয়ালী মনের খেলা, ওর জন্যে ছিল না কোনো উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা প্রত্যাশা। ফুলের মতো অনায়াস প্রকাশ ছিল তাঁর এই কলাবিলাসের।

তাঁর এই শিল্পীসত্তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তারও ছিল আশ্চর্য মিল। কোনো ক্লেশ, কোনো বেদনা, কোনো নৈরাশ্যই যেন তাঁকে স্পর্শ করত না কোনো দিন। অশালীন অসুন্দর আজকের পঙ্কস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই শুভ পঙ্কজের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। সেই স্বপ্নই যখন তখন মূর্তি ধরত তাঁর হাতের কাজে, যা বৈচিত্র্যে প্রাণশক্তিতে আঙ্গিকেরঅভিনবতায় অসামান্য হলেও আসলে কিন্তু অসম্পূর্ণ এবং আত্মকৃত। এই জন্যেই বারবার মনে হত স্রষ্টা হিসাবে তিনি যত বড়, হাতের কাজে ততটা ফুটলেন না, কেন না আপন প্রতিভার স্বাধিকারকে তিনি সমুচিত মমতায় গ্রহণই করেন নি। তবু কীর্তির যে ভগ্নাংশগুলি রেখে গেছেন তিনি, তা কুড়িয়েও একটি সংগ্রহ যদি করা হয় কোনোদিন, তাহলে দেখা যাবে, তা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো। তা কারো নকল নয়, কোনো প্রসিদ্ধির অনুসরণ নয়।

শেষ জীবনে তিনি ধর্মনিষ্ঠারআবর্তে পড়েছিলেন বলে শুনেছি। দীর্ঘ সময় ধরে নাকি পুজো করতেন। বয়সে আমরা প্রায় সমান ছিলাম, পথে ছিলাম সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর এই ধর্মীয় রূপান্তর নিয়ে কোনোদিন তাই কোনো কথাই তুলি নি আমি। তবে মনে হয়েছে সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র বা অভিনয়ের উপাসক যদি অন্য কোনো দেবতার দোরে ধর্ণা দেন, তাহলে শিল্পদেবতা বিমুখ হন অনিবার্য ভাবেই। সেই বিমুখিতাই কি মহান শিল্পী কালীকিংকরের জীবনে অমন ট্র্যাজেডির আকারে প্রকাশ পেয়েছিল?

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এজরা পাউণ্ড : কবিতার কিম্বদন্তী

এজরা ওয়েস্টর্ন লুমিস পাউণ্ডের মৃত্যুতে এক কাব্য-কিম্বদন্তীর অবসান। ভদ্রলোক নিশ্চিতই একজন জাতকবি। বলা চলে তিনি ছিলেন কবিদের কবি। আধুনিক ইংরেজি কবিতার জগতে অর্জুন টমাস স্ট্যার্নস এলিয়ট তাঁকে গুরু বলে মেনেছিলেন অকারণে নয়। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি পাউণ্ডকে বলেছিলেন মাস্টার ক্র্যাফটসম্যান।

পাউণ্ডের কবিতার জগতে প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। স্বীকার করি, তাঁর অনেক কবিতাই বিশেষত পিসান সর্গগুলো, একমাত্র দীক্ষিত পাঠক ছাড়া অন্যদের কাছে দুর্গম। এলিয়টের জবানিতে জানি, 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর পাণ্ডুলিপি তিনি সর্বপ্রথম পাউণ্ডকে দেন পড়বার জন্য। কবিতায় তিনি প্রতিটি শব্দ ওজন করে যাচাই করতেন। শব্দের বিস্ফোরক শক্তির উৎস ছিল তাঁর নখাগ্রে। অযথা কোনো বাক্য বা শব্দ তিনি তূণীরে স্থান দিতেন না। শব্দের শরসন্ধান অব্যর্থ করার জন্যই তিনি ছিলেন এমন সংযমী। লক্ষ্যভেদই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই সত্য দ্রোণাচার্যের মতো তিনি এলিয়টকে শেখান।

এলিয়ট যখন সেই পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পেলেন তখন তার ক্ষতবিক্ষত চেহারা। অতিরিক্ত মেদ ও রক্ত শুষে নিয়ে পাউণ্ড তাকে দিয়েছিলেন মসৃণ চিক্কণ শরীর। এলিয়ট জানিয়েছিলেন, এক তৃতীয়াংশেরও বেশি পংক্তি পাউণ্ড ছাঁটাই করেন। অন্যত্র সুপারিশ করেন শব্দের অদলবদল। এলিয়ট তা গুরুবাক্য বলে মান্য করেন। দেখতে ইচ্ছে হয়, মূল পাণ্ডুলিপিটি কেমন ছিল! শুনেছি তা নাকি কোনো মার্কিন সাহিত্য-সংগ্রাহকের জিম্মায়।

এমনতরো বহুবিধ কর্মে পাউণ্ড ছিলেন নিপুণ। জেমস জয়েসকে তিনিই প্রকাশক পাইয়ে দেন 'ইউলিসিস' উপন্যাসের। তিনি সেই দুরূহতম উপন্যাসটি নিজের থলেতে বয়ে বেড়াতেন, তার সৌন্দর্য আবিষ্কার করতেন নিরন্তর পঠনে।

বাঙলাভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনিই প্রতীচীর আধুনিক কাব্য-জগতে পরিচিত করেন। 'পোয়েট্রি' কবিতাপত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছের প্রাক-প্রকাশের নির্বাচন পাউণ্ডের। কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থে পাউণ্ড বিশ্লেষণ করেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। প্রতীচীর পাঠকদের একথাও তিনি জানান—ইংরেজি নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার আসল সৌন্দর্য, তার শব্দের ধ্বনি মাধুর্য উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে বাঙলাভাষা।

বাঙলা ধ্বনির কান ও বাঙলার সাংস্কৃতিক মানসিকতায় মন তৈরি না করলে তাঁকে সহজ ও সত্যরূপে জানা যাবে না।

পরবর্তীকালে ইয়েটসের মতোই পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে রুচি বদল করেছিলেন। আমরা বলব, বাঙলাভাষা না জানাই তার কারণ। ইংরেজি ভাষায় যা তিনি পেয়েছিলেন তাতে কি সত্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার সম্ভব ?

পাউণ্ডের মৃত্যু হয়েছে তাঁর নির্বাচিত দেশ ইতালিতে, ভেনিসের হাসপাতালে ৮৭ বছর বয়সে। ফাসিস্তের প্রশস্তি তিনি করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। কেন করেছিলেন তার সঠিক কারণ কখনোই জানা যাবে না। কারণ, যুদ্ধের পর তাঁকে আর সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় নি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল, আমি কারু প্ররোচনায় একাজ করি নি। একজন বিবেকবান আমেরিকানরূপেই আমার এই প্রচার।

ফাঁসি তাঁর হত। হল না তাঁর বিকৃত মানসিকতার কারণেই। বদলে তেরো বছরের কারাবাস, পাগলা গারদে। কারামুক্তির পরও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন বলা চলে না। কিন্তু কবিতা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

ভিক্টোরীয় পরিতৃপ্তির জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে যে পঞ্চপাণ্ডব ইংরেজি ও মার্কিন সাহিত্যকে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার নিরিখে পুনর্বিচার করেন, পাউণ্ড তাঁদের অন্যতম! সহযাত্রী ছিলেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, জেমস জয়েস, টি. এস. এলিয়ট ও ডি এইচ. লরেন্স।

পাউণ্ড তাঁর ধারালো কবিতাতেই শুধু নয়, সাহিত্য বিষয়ক রচনাতেও ছিলেন একক। ১৯৫৪ সালে এলিয়টের সম্পাদনায় বেরোয় 'লিটারেরি এসেস অব এজরা পাউণ্ড'। আধুনিক কবিতার ধরন কি হওয়া উচিত, তার বিবর্তনের চেহারাই বা কি হবে এ বিষয়ে বহু আগেই তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখে গেছেন। তখন এসব বিষয়ে কোনো স্পষ্ট চিন্তাই দানা বাঁধে নি অতলান্তিকের এপারে কিংবা ওপারে। তা বলে আধুনিকতার নামে নৈরাজ্যবিলাসী ছিলেন না তিনি। কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রতিটি কবিতায়, শব্দ নির্বাচনে ও ছন্দব্যবহারে। পাউণ্ডকে গুরু মানলে আজকের অনেক আধুনিক কবিতাই নতুন করে লিখতে হবে। কজনই বা তা করছেন ?

পাউণ্ড বলতেন, কবিতাকে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে তথাকথিত মন-ভোলানো রচনার বিরুদ্ধে যাতে এক সময়ে তাঁরাই আধুনিক কবিতায় আকৃষ্ট

হবেন যাঁরা গদ্যে হেনরী জেমস বা আনাতোল ফ্রাঁস এবং সঙ্গীতে ডেবুসি-তে আসক্ত। এসব কথা তিনি লিখে গেছেন এই শতাব্দীর গোড়ায়। মনে প্রাণে তিনিই ছিলেন প্রথম আধুনিক।

আজ তাঁর দেহাবসানের পর হয়তো বা পাউণ্ডের পুনর্বিচার হবে। তাঁর অতিপাত সর্গগুলোর কবিত্বমূল্য যাই থাক, তাঁর দুরূহতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পাঠক ও কবির মধ্যে একটা দুরতিক্রম্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত 'হোমেজ টু সেক্টাস প্রপার্টিয়াস'-এই খুঁজতে হবে আমাদের।

কবিতায় আধুনিকতার চেহারা কি রকম তা পাউণ্ডের হাতেই প্রথম আমরা দেখি। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কোলাহল এখন স্তব্ধ। তিনি স্মরণীয় তাঁর অসাধারণ মননশীলতা ও অসামান্য কবিতার জন্যই।

কৃষ্ণ ধর

বন্ধু চিত্তরঞ্জন পাল

'পরিচয়'-এর দীর্ঘকালের সুহৃদ ও লেখক চিত্তরঞ্জন পাল অকালে আমাদের কাছ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করেছেন। এবার শারদীয় অবকাশের মধ্যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটি যখন প্রথম শুনি তখনও বিশ্বাস করতে চায় নি মন। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বন্ধুবর চিত্তরঞ্জন এখন সত্যিই আমাদের সকল বিশ্বাস-অবিশ্বাসেরই ঊর্ধ্বে।

আমার বিষাদভরা মন এই মুহূর্তে ফিরে যেতে চাইছে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কৈশোর-স্মৃতিতে। চল্লিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে একটা ছোট্ট মফঃস্বল শহরে আমরা যারা কৈশোরের নিষ্পাপ অনুভূতি দিয়ে দেশকে ভালোবেসে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিতে চেষ্টা করছিলাম, প্রয়াত বন্ধু চিত্তরঞ্জন পালের সঙ্গে আমাদের সেই সময় ঘটে প্রথম পরিচয়।

চিত্তরঞ্জনের বাড়ি ছিল খুলনা শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, দেবীপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন নৈহাটি স্কুলের সেরা ছাত্র। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পর তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী উত্তাল কুৎসার মুখে দাঁড়িয়ে যেসব সেরা এবং মেধাবী ছাত্র মার্কসবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

তাঁর মতো ছাত্রকে কর্মী হিসেবে পেয়ে ছাত্রফেডারেশন সেদিন অনেক লাভবান হয়েছিল, এ-কথা আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি। সমগ্র খুলনা জেলার মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্টার-মার্ক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১৯৪৫ সালে চিত্তরঞ্জন আমাদের গৌরব বাড়িয়েছিলেন।

এই সময় মফঃস্বল শহরের প্রগতি-সংস্কৃতির আন্দোলনেও তাঁর ছিল এক মুখ্য ভূমিকা। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, 'অরণি' আর 'পরিচয়' পত্রিকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপনের কথা। মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনার প্রসারের দশকরূপে যদি আমরা চল্লিশের দশককে চিহ্নিত করি তবে এই কালে খুলনা জেলায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই চিন্তা-ভাবনাকে যাঁরা সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন, চিত্তরঞ্জন পাল তাঁদেরই মধ্যে একটি গণনীয় নাম। এই সময়ে 'রমঁ্যা রোলঁ্যা' ও 'বিবেকানন্দ' সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের কথা আমার এখনও স্মরণে আছে। কবি সুকান্ত যখন খুব একটা পরিচিত নাম নয় তখনও দেখেছি চিত্তরঞ্জন সুকান্তর কবি-কৃতিত্ব সম্পর্কে কত উচ্ছ্বসিত। ১৯৪৭ সালে সুকান্তর অকাল-মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাই তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে সুকান্ত-প্রতিভার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে সুজিত নাগ সম্পাদিত 'সুকান্ত-স্মৃতি' গ্রন্থে সেই প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে।

ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরূপে চিত্তরঞ্জন ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত বেশ সক্রিয় ছিলেন। এই সময়কার অনেক উজ্জ্বল স্মৃতি এখনও আমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত আছে। মনে পড়ছে ১৯৪৫ সালে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে মৌভোগ অঞ্চলে দীর্ঘ তিন মাইল ব্যাপী খাল-খননের সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতি। এই খাল-কাটার সময় কৃষক ভাইদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্য আমরা প্রায় প্রতি রবিবার শহর থেকে শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক-উকিল-মোক্তার-ডাক্তার আর মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা যেতাম সেই খাল-কাটার কাজে অংশ গ্রহণ করতে। শহর থেকে ৮/৯ মাইল দূরে এই মৌভোগ অঞ্চল। চিত্তরঞ্জনের গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে হত সেখানে। এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বর্ষীয়ান নেতাদের পাশাপাশি লালঝাণ্ডা উড়িয়ে "চাষী দে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশান রে" গানে গলা মেলাতে মেলাতে বন্ধু আনোয়ার, কেষ্ট, পরম,

পরিতোষ, সত্যেন্দু, গীতা, বীণার সঙ্গে হেঁটে চলেছি আমরা। চিত্তরঞ্জন তাঁর নৈহাটি-দেবীপুরের সাথীদের নিয়ে মিলিত হচ্ছেন আমাদের সেই দঙ্গলে। তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমাদের মধ্যে চলত কোদাল চালিয়ে ঝুড়ি ভর্তি মাটি কাটার এক আশ্চর্য প্রতিযোগিতা। বন্ধু আনোয়ার আজ নেই। বন্দী অবস্থায় রাজশাহী জেলে পাকিস্তান সরকারের গুলিতে ১৯৫০ সালে অন্যান্য কয়েকজন সহবন্দীর সঙ্গে শহীদ হয়েছেন তিনি। কেষ্ট ব্যানার্জিও প্রয়াত। তিনি বে-আইনী যুগে আত্মগোপন করে কাজ করার সময় যক্ষ্মায় মৃত্যুবরণ করেছেন। চিত্তরঞ্জনও পঞ্চাশ না পেরুতে চলে গেলেন। এ-এক অসহ্য স্মৃতি— ভয়ঙ্কর, বেদনাময়!

চিত্তরঞ্জন 'স্টার' নিয়ে আই. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ-বিভাগের পরে চলে আসেন কলকাতায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় চিত্তরঞ্জন ছিলেন সিটি কলেজের এক উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে কবি সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, কথাসাহিত্যিক মিহির সেন, চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ অনেকেই জানেন তাঁর কৃতিত্বময় ছাত্রজীবনের কথা। সিটি কলেজ থেকেই চিত্তরঞ্জন বাঙলায় অনার্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় নানা কারণে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। এই সময় আমার সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চিত্তরঞ্জন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির গোবরডাঙা শাখার সভাপতি। তাঁর মতো কৃতী ও পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীর কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল তা কেন জানি না তিনি পূর্ণ না করেই চলে গেলেন। তিনি পড়েছেন অনেক কিন্তু লিখেছেন খুবই কম। স্বরচিত স্বেচ্ছানির্বাসনেই যেন তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

ধনঞ্জয় দাশ

ভ্রম সংশোধন

শারদীয় সংখ্যার ২৯৮ পৃষ্ঠায় 'টাইরেসিঅস'কবিতা থেকে উদ্ধৃতাংশের শেষ পংক্তিটি হবে "বোজানো ডোবার জল।" ৩০১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারায় আছে "... শ্রীবিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্রে'র তৃতীয় খণ্ডে..." ইত্যাদি। তৃতীয় নয়, হবে "চতুর্থ খণ্ডে"। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ২৯ অকটোবর একটি চিঠি দিয়ে তাঁর প্রবন্ধের ভুল দুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শারদীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা আছে ৩৪৭, হবে ৩৫৫

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইতিহাসের সত্য : সত্যের জয়

গত বছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বলেছিলাম : সত্যের জয় হয়েছে। এই বছর এই দিনে বলছি : সত্য অপরাজেয়। বহু বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বয়েস এক বছর পূর্ণ হল।

এই নবজাতকের কাছে আমাদের ঋণ কম নয়।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে-পাপ, যে-সীমাবদ্ধতা …অভূতপূর্ব মূল্যে বাঙলাদেশ তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

একদিন 'স্বাধীনতা'র জন্য এই উপমহাদেশের দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থীগণ নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করে দেশবিভাগকে অনিবার্য আর ত্বরান্বিত করেছিল। একাত্তর সালে সেই দুই সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমীরাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙলাদেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন। আর গণপ্রজাতন্ত্রের বীর মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে শহীদ হয়েছেন বন্ধু ভারতের জওয়ানরা। ইতিহাসের দেনা এইভাবেই শোধ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠছে, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব তখন টেবিলে বসে ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা গ্রহণ করলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা সেদিন এড়ানো গেল। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে 'সিয়াটো' সদস্য, আমেরিকার সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টার সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে বাঙলাদেশকে স্বাধীন হতে হল। ত্রিশ, কারোর বা মতে ছত্রিশ লক্ষ বাঙলাদেশবাসী পাকফৌজের হাতে জীবন দিলেন। আমেরিকা সেই সময়ই ভারতরাষ্ট্রকেও রীতিমতো হুমকি দিচ্ছিল। গরীব দেশ ভারত নানা ভুলে আজ পর্যন্ত নিজের আর্থনীতিক সমস্যারই সমাধান করতে পারে নি। তার ওপর বাঙলাদেশের এক কোটি শরণার্থীর দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ওদিকে পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি, সীমান্ত সংঘর্ষ। অমোঘ এই মুহূর্তে আমেরিকা ভারতের প্রতিরক্ষা, খাদ্য সরবরাহ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য কত না চাপ দিতে লাগল। শেষে বঙ্গোপসাগরে পাঠাল

সপ্তম নৌবহর! কিন্তু ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির রাখি হাতে বেঁধে সাম্রাজ্যবাদীশিবিরাধিপতির রক্তচক্ষুকে ভারত উপেক্ষা করল। একটি বন্ধু রাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে বারো হাজার ভারতীয় জওয়ান বাঙলাদেশের রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করলেন। ইতিহাসের দেনা এইভাবেই মেটে।

ইম্পেরিয়ালিজম চেয়েছিল এই উপমহাদেশে অবিশ্বাস বিরোধ পরিণামে যুদ্ধের সম্ভাবনা বা পরিস্থিতি বজায় থাকুক। রক্তের অক্ষরে লেখা ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী যুদ্ধের পুরোহিতদের সেই ষড়যন্ত্রের মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান চুক্তিও মৈত্রীসম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলেছে। অবশ্য পাকিস্তানের রাজনীতিতে জটিলতার অন্ত নেই। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বাইশটি একচেটিয়া পরিবারের শাসনে আজ অস্থিরতার তরঙ্গাঘাত। চীনের রহস্যময় সহযোগিতাও 'স্থিরতা' অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না। ধর্ম যে কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না—বাঙলাদেশ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিও নতুন উদ্যমে স্বাধিকারের সংগ্রাম শুরু করেছে। বর্তমান পাকিস্তান থাকবে না কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে, 'পাকিস্তান' শব্দটি এক রক্তাক্ত ভ্রান্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে কিনা—ঐ রাষ্ট্রের জনগণই তা স্থির করবেন। হয়তো এই উপমহাদেশে ইতিহাসের ঋণমুক্তির পালা এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু অন্তত এক মহান সম্ভাবনার সৃষ্টি যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। হয়েছে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব, ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী। উপমহাদেশের নিয়তি নির্ধারণে এই ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আমরা, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা, হয়তো অনিবার্যভাবেই বাঙলাদেশ সম্পর্কে এক ধরনের বিশেষ আবেগ বোধ করি। কিন্তু আমরা কখনো ভুলি না আমরা ভারতীয়। ভুলি না বহুভাষী এই ভারত—এমনকি উর্দু হিন্দি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী ভারতীয়রাও—বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কিছু কম উদ্বোধিত হয় নি। যে-পার্লামেন্টে বাঙলাদেশের সমর্থনে শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল—তার কজন বাঙলাভাষী? যে-বারো হাজার ভারতীয় জওয়ান শহীদ হয়েছেন—কজন তার বাঙলায় কথা বলেন? বাঙলাদেশের কোনো কোনো মহলের পর-ভাষা অসহিষ্ণুতা যেমন সেখানকার প্রাজ্ঞ নাগরিকদের লজ্জার কারণ হয়, তেমনই ভারতের কোনো

কোনো বাঙলাভাষীর বাঙলাদেশকে নিজ মাতৃভূমি মনে করার আবেগ-বিহ্বলতা আমাদের বিড়ম্বনার কারণ হয়। আমরা মনে রাখি ভারত আর বাঙলাদেশ সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিবেশী দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।

আমরা জানি সাম্রাজ্যশক্তির অনুচররা নানা ছদ্মবেশে উভয় রাষ্ট্রের সমমর্যাদার এই আসনটিকে দুর্বল করার জন্য এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক উচ্চম্মন্যতা ও হীনম্মন্যতার বোধ সৃষ্টি করছে। সেই সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, বৈষয়িক স্বার্থ, ভাষা ও ধর্মের প্রশ্ন তুলে ভারত-বাঙলাদেশের ঐক্যে চাইছে ফাটল ধরাতে। চূড়ান্ত বাম ও চরম দক্ষিণপন্থী রণধ্বনির আড়ালে তারা সীমান্তের দুই পারে বিচ্ছিন্নতাবাদী অন্ধকারের শক্তিগুলিকে ফণা তুলতে বলছে। এ-ক্ষেত্রেও চীনের ভূমিকা দুঃখজনক।

ভারতের সমস্যাগুলির মোকাবেলা আমাদেরই করতে হবে। এই রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি ও সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধির লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাঙলাদেশের আনন্দে দুঃখে ভরা এক বছরের জটিল ইতিহাস আমরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। বিচলিত হবার মতো নানা খবর মাঝে মাঝেই শোনা যায়। সমস্যা তাঁদের বিপুল ও বহুমুখী। সমাধানের পথ বা পদ্ধতি বাঙলাদেশের জনগণই স্থির করবেন। ধ্রুব জানি মুক্তিযুদ্ধের মতোই সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ গড়ার অগ্নিপরীক্ষায়ও তাঁরা একদিন সফল হবেন। তবে, কে না বোঝে সমাজতন্ত্রের রাস্তা নিতান্ত সহজ সরল নয়।

শেখ মুজিব, মণি সিং প্রমুখ বাঙলাদেশের জননেতারা প্রায়ই বলেন: বাঙলাদেশের এক কোটি নাগরিককে ভারত বুকে করে রেখেছে, মুক্তিযুদ্ধে বারো হাজার ভারতীয় প্রাণ দিয়েছে। এ-ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়।

শুনে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। কারণ, তাঁরা তো শুধু আমাদের সমবেত অতীত ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তই করেন নি। তদুপরি আমাদের দিয়েছেন এক দুর্লভ গৌরব। একটি জাতির মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী হিসেবে এই প্রথম ভারতবাসী রূপে আমরা এক পরম গরিমার অধিকারী হয়েছি। ঋণ তো আমাদেরও কম নয়।

হয়তো এই পারস্পরিক কৃতজ্ঞতাই আমাদের মৈত্রীর রক্ষাকবচ। সমৃদ্ধতর ভারত আর বাঙলাদেশই উভয় রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের গ্যারান্টি। দুঃখ আর রক্তের মূল্যে যে রাখিবন্ধন—তাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আরো দুঃখ আরো রক্তের মূল্য দিতে সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত।

সর্বোপরি রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারত ও বাঙলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা যে তিনিই—এ কোনো আকস্মিকতা নয়। কল্যাণ প্রগতি ও শান্তির সেই মহৎ ভাবমূর্তিই তো আজ আমাদের সেতুবন্ধের কাজ করবে।

আর সেই সঙ্গে এই উপমহাদেশে ইতিহাসের অভিপ্রায় দিনে দিনে আরো সত্য হয়ে উঠবে, হবে অপরাজেয়।

১৬.১২.৭২ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী

উনিশ শো সতেরো সালের পৃথিবী কাঁপানো দশটি দিন রুশিয়ার জারতন্ত্রী রাষ্ট্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। কিন্তু বিপ্লব মানে শুধু ভাঙা নয়। মার্কসীয় সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লব হল পুরনো সমাজব্যবস্থার স্থলে নতুন এবং আরও অগ্রসর এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই অর্থে বিপ্লব একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া।

আজকে যে রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিচিত সেখানে এই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার বিকাশ হতে ১৯১৭র পর আরও ছ-বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিলম্বের কারণ গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ। রুশ বিপ্লব যদিও প্রায় বিনা রক্তপাতেই সম্পাদিত হয়েছিল, স্বদেশী এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা তা প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারে নি। "ডিম ফোটার আগেই বলশেভিক মুরগীর বাচ্চাদের পিষে মারার" চেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি। ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরানো যায় না।

১৯২০ সাল নাগাদ প্রতিবিপ্লবীরা নির্মূল হয়, ১৯২১-২২ সাল নাগাদ মুক্ত হয় বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি। তারপর শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের বিপুল কর্মযজ্ঞ।

গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে রুশিয়ায় চারটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এবং বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন বিচ্ছিন্ন একক প্রয়াস নিষ্ফল, প্রয়োজন সমবেত এবং সমন্বিত প্রয়াস। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে তাই বলা হয়ঃ "পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের দিক থেকে বিপদ থাকায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সুস্থির এবং নিরাপদ নয়।"

এই সিদ্ধান্তেরই ফলশ্রুতি ১৯২২ সালে সোভিয়েত জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা।

শান্তি এবং দ্রুত সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য আগ্রহ বিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্র-গুলিকে একরাষ্ট্রসূত্রে গাঁথার পক্ষে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

এই মিলনের তত্ত্বগত বনিয়াদ রচনা করেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আর তা বাস্তবে রূপদানের মৌলিক পথ ও পদ্ধতিও নির্দেশ করেন তিনিই। তাঁর নির্দেশে রচিত খসড়াটি অনুমোদিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে। একই সঙ্গে এই মিলনের এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২ সালে প্রত্যেকটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি সম্মেলনেই সমানাধিকার এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে স্বেচ্ছামূলকভাবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডের যুগে দেশের জাতি এবং অধিজাতিগুলি যখন অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে তখন এই ইউনিয়নের পরিধি বাড়তে শুরু করে।

জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় সীমা নির্ধারণের পর মধ্য এশিয়ায় কয়েকটি নতুন অঙ্গপ্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ১৯২৫ সালে তুর্কমেন এবং উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সীমানা নির্ধারিত হয়। কিছু পরে ১৯২৯ সালে তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। ১৯৩৬ সালে যখন নতুন সংবিধান গৃহীত হয় তখন কাজাখ এবং কিরঘিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ট্রান্স-ককেশীয় ফেডারেশনের আঞ্চলিক ভূ-সীমায় গঠিত হয় তিনটি অঙ্গপ্রজাতন্ত্র : জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। ১৯৪০ সালে মোলদাভিয়া সোভিয়েত জাতিসংঘে যোগ দেয়। এই তিনটি প্রজাতন্ত্রে ইতিমধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সোভিয়েত জাতিসংঘে এখন আছে ১৫টি অঙ্গপ্রজাতন্ত্র, ২০টি স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র, ৮টি স্বশাসিত প্রান্ত এবং ১০টি জাতীয় এলাকা।

সোভিয়েত জাতিসংঘ গঠনের অর্ধশতাব্দী পূর্তির প্রাক্কালে খুব সঙ্গতভাবেই মনে পড়ছে বহু জাতি-অধিজাতি অধ্যুষিত আমাদের দেশের কথা। সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত দেশের প্রতিটি অঙ্গ রাজ্য এই পঞ্চাশ বছরে যেভাবে আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে শান্তি ও

সৌহার্দ্যের পরিবেশে সুসম অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে, ভারতের মতো বহু জাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে তার তাৎপর্য অবশ্যই অনুধাবনীয়। আমরা আশা করতে পারি আমাদের দেশের জননায়কেরা সোভিয়েত জাতিসংঘ গঠনের এই শিক্ষাকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়ে ভারত রাষ্ট্রের সমগ্র অঙ্গরাজ্যগুলির বৈষম্যহীন আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে অতঃপর তৎপর হবেন।

শচীন বসু

সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে

বাঙলা মঞ্চের আয়ু একশো বছরের অনেক বেশি, যদিও শতবার্ষিকী পালনের হাওয়াটা এই বছরেই উঠল। উঠুক ক্ষতি নেই। কিন্তু থিয়েটারের জন্যে এই বছরটায় কী করলাম আমরা? রবীন্দ্রসদন, শোভাবাজারের ঘড়ি-ওয়ালা বাড়ি, স্টার থিয়েটার, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট প্রভৃতি জায়গায় অনুষ্ঠান হয়েছে; একশো প্রদীপ জলেছে; তুষারকান্তি ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়···এঁরা বক্তৃতা করেছেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে মস্ত বড় কমিটি ময়দানে নাট্যোৎসব করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের অনুষ্ঠান পিছিয়েছে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তাঁদের কমিটি থেকেও নাকি কেউ কেউ পদত্যাগ করেছেন। এই কমিটির চিঠি, খাম বা লেটারহেডে 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ'র শতবর্ষ কথাটা ছাপা হয়েছে। 'সাধারণ' রঙ্গালয়ের শতবর্ষ বললে খানিকটা মানে হত, যদিও টিকিট বেচে থিয়েটার ১৮৭২-এর আগেও হয়েছে লেবেদেফের কল্যাণে।

পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় রঙ্গালয়ে সাধারণে স্থান পায়, এবং নিয়মিত নাট্যকর্মের সুযোগ ঘটে। এই দুই কারণের জন্য ঘটনাটির নিঃসন্দেহে গুরুত্ব আছে। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারের স্বভাবও এর গায়ে শতবর্ষ ধরেই ফুটে বেরিয়েছে। মালিকদের মুনাফার লোভ মেটাবার জন্য যেনতেন প্রকারেন দর্শক বেশি করে টানবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু দর্শককে শিক্ষিত বা তৈরি করার তেমন চেষ্টা হয় নি। বরং অশিক্ষিত রুচিকে বহু ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। শিল্পহীনতা কুরুচি ও ভাঁড়ামির গিলটি গয়না অঙ্গে তুলে মনোহরণের উৎকট চেষ্টা করেছে পাবলিক থিয়েটার—এর মধ্যেও এমন শিল্পী অবশ্যই অনেক ছিলেন যাঁরা ঐ স্রোতে ডুবতে ডুবতেও কিছু সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শস্তা প্রমোদের

ভীড়ে দাঁড়িয়েও হাত বাড়িয়েছেন ঊর্ধ্ব দিকে। জন্ম থেকেই সাধারণ রঙ্গশালা এই দুই উলটো স্রোতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে একই লোকের মধ্যে দুটি স্রোত থাকত। আমাদের আজকে স্মরণ করা দরকার প্রধানত ঐ উর্ধ্ব-মুখী শিল্পপ্রাণ স্রোতটিকে। তাকে আরো জোরালো করা যায় কী করে সেই চেষ্টাই থাকা উচিত আমাদের। চারদিকে তেমন সাড়া কতটুকু মেলে!

তিনটি পেশাদারী মঞ্চ রঙমহল, স্টার ও বিশ্বরূপার বেসাতি যথাক্রমে ভাঁড়ামি, অপরিণত অতি-সেন্টিমেণ্টাল অশ্রুতারল্য এবং যৌনতা। আগেই বলেছি, এই মুনাফাখোর রুচিবিকৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বভাবলক্ষণ। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে কোনোক্রমেই যেন আমরা এই 'সাধারণ' রঙ্গালয়ের গৌরববর্ধন' করে না বসি।

কিন্তু আসল দুর্ভাগ্য, নতুন নাট্য-আন্দোলনও বিভ্রান্ত। শস্তা তারল্য, আলোর খেল, ধরতাই বুলি, বা সৌখিন মজদুরির চোখ ভোলানো ভঙ্গি যথেষ্ট চোখে পড়ে। কোনো বিপ্লবী হয়তো সরকারের কাছে মুচলেকা দেয়, কেউ ইউসিসের মদের ভাঁড়ারে নিরম্বু মোক্ষ লাভ করে।

বিশ্বরূপার 'চৌরঙ্গী' অনেক নতুন নাট্যওয়ালার চোখ খুলে দিয়েছে। তাঁরাও ব্লো-হটের উপাসনা শুরু করেছেন। 'বারবধূ' 'মতিবিবি'র সঙ্গে শীশমহল সন্ধ্যার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমনকি যাত্রাও পেছিয়ে নেই। 'জানোয়ার'ও নাকি হট্—বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

জাতীয় রঙ্গালয় আজও হয় নি। খেউরের আসর কিন্তু সরগরম। জাতীয় রঙ্গালয় দূর অস্তু, কিন্তু কে সেটা পাবে এবং কার সেটা কিছুতেই পাওয়া উচিত নয়, তা নিয়ে নিদ্রাহীন মাথাব্যথার অন্ত নেই।

গত দু-বছর রাজনৈতিক হানাহানি অপরের মতকে টুঁটি টিপে হত্যা করছিল—এবং অন্যমতের নাটককেও। এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় পাবলিক থিয়েটারের দুটো গুণগান করলেই সব ব্যামোর উপশম হয়ে যাবে না। ঐ রুদ্ধশ্বাস আকাশে খোলা বাতাস আনবার জন্য আমরা কতটুকু চেষ্টা করছি? মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, শ্বাসঘাতী শাণিত ছুরিটা সাময়িক স্তব্ধতায় অন্তরালে ফুঁসছে, মরে নি। স্ববেশে বা ছদ্মবেশে আবার যে কোনো মুহূর্তে ছোবল তুলতে পারে।

নাট্যসাহিত্যের চত্বরে তো খরার অজন্মা। কটা মৌলিক নাটক সম্প্রতিকালে লিখিত ও প্রযোজিত হল? বিদেশী নাটক ছুঁলেই জাত যায়

তা নয়, কিন্তু নবনাট্য তো মাটির সঙ্গে যোগ রাখতে চায়, আর মাটির দিশী ছাড়া অন্য ব্র্যাণ্ড কোথায়!

শিল্পের ক্ষেত্র থেকে যদি নিতান্ত সৌজন্যের ক্ষেত্রেও আসি, সেখানেও নতুন নাট্যওয়ালারা কি সর্বত্র রুচির পরিচয় দিতে পারছেন?

কয়েক বছর আগে একটি দল 'চাঁদবণিকের পালা' নিজেরা সম্পূর্ণ করে অভিনয় করেছেন, তার জন্যে নাট্যকারের অনুমতি নেওয়া বাহুল্য বিবেচনা করেছেন।

গঙ্গাপদ বসুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীস্বদেশ বসু (একটি নাট্যদলের অধিনায়ক) একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে অনেক নামী লোক লিখেছেন। কয়েকটি খুব ভালো লেখাও আছে; যেমন, শঙ্খ ঘোষ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রভৃতির লেখা। কিন্তু বেশ কয়েকটি লেখায় মিথ্যা কুৎসা, তথ্যবিকৃতি ও কুটিল ঈর্ষার কালিমা গঙ্গাপদবাবুর স্মৃতিকেই মলিন করেছে।'

গঙ্গাপদবাবুর রচনা সংকলনও বার করেছেন স্বদেশবাবু। তিনি বয়সে নবীন ও নাট্যজগতের অনেকেরই অত্যন্ত স্নেহভাজন, তবুও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তাঁর সম্পাদনায় প্রত্যাশিত দায়িত্ববোধের অভাব আছে। 'বহুরূপী' পত্রিকার একাধিক সম্পাদকীয় তিনি ছেপেছেন, এর কোনটিতে কোন লেখকের হাতের ছাপ কতখানি আছে তা তিনি জানেন না। ফলে কিছু অসঙ্গতি রয়ে গেল। আরো মারাত্মক, গঙ্গাপদবাবুর অনেক লেখা থেকে তিনি বহু পংক্তি বাদ দিয়েছেন, এবং কয়েক ক্ষেত্রে জুড়েছেনও। কোনো কারণ না দর্শিয়েই দু-এক ক্ষেত্রে একাধিক প্রবন্ধ যুক্ত করে একটি প্রবন্ধ গঠন করেছেন। এই অনুচিত সম্পাদনায় গঙ্গাপদবাবুর লেখাই পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়েছে।

সব থেকে বড় খেল্ দেখিয়েছেন নবনাট্য আন্দোলনের দীর্ঘকালের কর্মী, নাট্যকার, প্রকাশক শ্রীসুনীল দত্ত। গত তিরিশ বছরের নাট্য-আন্দোলনের ওপর তিনি একটা বই 'লিখেছেন'। তার শতকরা আশি-নব্বই ভাগ অন্যের লেখা। বহু নাট্যরথীর বহু সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হুবহু পুনর্মুদ্রিত করে দিয়েছেন তিনি। হ্যাঁ, তাঁদের নামেই দিয়েছেন। তিনি নবনাট্যের কর্মী, তিনি কি অন্যের নাম হজম করতে পারেন, ছিঃ! প্রতিটি রচনায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখকদের নাম আছে। অবশ্য বইটার 'লেখক' কিন্তু সুনীল দত্ত। প্রবন্ধকারেরা নবনাট্যের লোক, সুতরাং তাঁদের অনুমতি নেওয়া বা দক্ষিণা দেওয়া বাহুল্য বিবেচনা করেছেন সুনীলবাবু।

মহামতি শিবরাম চক্রবর্তী বলেছেন, "Nothing is unfair in লাভ।" শ্রীসুনীলের জীবনই ঐ বাণী।

অন্য সুস্থ ধারা কি একেবারেই নেই? হয়তো আছে। কিন্তু সে-কথা বারান্তরে আলোচ্য।

কিছুদিন আগে বোম্বাইর প্রখ্যাত এক পরিচালক-অভিনেতা কলকাতায় এক ঘরোয়া কথাবার্তায় বলেছিলেন, "আমাদের সব আছে, মডার্ন ইকুইপমেণ্ট, টাকা, আর্টিস্ট, এভরিথিং, এভরিথিং, বাট উই ডোণ্ট হ্যাভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথ মানে 'এখানে একটি মানুষ মাত্র নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির রুচি ও শিল্পবোধ - যা তাঁরই ব্যক্তিত্বের বিকীর্ণ আলোকে নিষিক্ত।

১৯৭২-এর পরে বোম্বাইর সেই প্রখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা কলকাতায় আবার এলে তাঁর কাছে মাথা নিচু করে হয়তো আমাদের বলতে হবে, "আমাদের কিছু নেই। মডার্ন ইকুইপমেণ্ট নেই, টাকা নেই—এ্যাণ্ড উই ডোণ্ট হ্যাভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বিনয় সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

অভিনন্দন

'পরিচয়'-এর প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমান উপদেশকমণ্ডলীর সদস্য জনাব গোলাম কুদ্দুস তাঁর জীবনব্যাপী প্রগতিশীল কবিকৃতির জন্য এবার 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' পেয়েছেন। কুদ্দুস সাহেব শুধু কবিই নন। তিনি একাধিক উপন্যাসের খ্যাতিমান স্রষ্টা। 'সম্বোধন' নামে একটি অসামান্য রিপোর্টাজধর্মী গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত। চল্লিশের দশক থেকেই প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের তিনি অগ্রগণ্য নেতা। ঐতিহাসিক 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ'র তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম বন্ধু ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর অক্লান্ত প্রবক্তা কুদ্দুস সাহেবের এই পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের সকলের গৌরব।

'পরিচয়'-এর দীর্ঘ দিনের বন্ধু ও লেখক অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও

এবার 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' পেয়েছেন। 'লোকায়ত'-এর মনস্বী স্রষ্টা নিজের অক্লান্ত রচনা এবং 'ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ: পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট' ত্রৈমাসিকের সম্পাদনা মারফৎ ভারতীয় দর্শন ও ভারতবিদ্যার প্রকৃত মর্মটি পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করছেন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'হোয়াট ইজ লিভিং এ্যাণ্ড ডেড ইন ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' প্রকাশিত হলে বিদ্বৎজনসভায় তাঁর আসনটি স্থায়ী গৌরবে অভিষিক্ত হবে এ সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চিত। তিনিও আমাদেরই একজন। তাঁর গৌরবও 'পরিচয়'-এরই গৌরব।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর অন্যতম স্থপতি 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' পত্রিকা আমাদের স্বাধীনতার সমান বয়সী। রজতজয়ন্তী বৎসরে আমরা 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' পত্রিকাকে আমাদের প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতার বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের সঙ্গে আমরা আবার গলা মেলাচ্ছি। আমাদের দাবি অবিলম্বে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হোক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়ুক। আমাদের দাবি—দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি জানানো হোক। আমরা আশা করি ভিয়েতনাম ও মনুষ্যত্বের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

বাঙলাদেশ

পত্রিকা প্রকাশের মুখে ঢাকা থেকে বেদনা ও উদ্বেগে ভরা সংবাদ এসেছে। যে-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাঙলাদেশের ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারীর নির্বিচার হত্যার জন্য দায়ী, চট্টগ্রাম বন্দরের অদূরে 'সপ্তম নৌবহর'-এর ফেলে যাওয়া সংখ্যাতীত মাইন যে-বাঙলাদেশ মিত্র ভারত এবং সোভিয়েত নৌবিভাগের সহায়তায় বৎসরাধিক কালেও অপসারণ করতে পারে নি—সেই বাঙলাদেশের দুটি ছাত্র ভিয়েতনামের পক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। ১৯৬৯ সালের শহীদ মতিউর। ১৯৭৩ সালের শহীদ মতিউল আর কাদিরুল। বেদনায় বিস্ময়ে আমরা চোখের জল মুছছি। বাঙলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। আমরা আশা করি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের এই সীমাহীন ভালোবাসা ও প্রত্যাশার মর্যাদা রাখবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

manAge
The man truly devoted to the pursuit of knowledge. Lives with books. Very knowledgeable on men, matters, materials. . .
Nevertheless, his studious choice in men's wear has fallen on a Man-Age Suiting. The spectacular range of runaway colours and designs in GWALIOR SUITING is your new way to manage !
GWALIOR SUITING
GR
look of the wear, pick of the year
NPS/GR-343 R

পরিচয়

বর্ষ ৪২। সংখ্যা ৯-১১

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

গল্প

উপন্যাস

কবিতাগুচ্ছ

পুস্তক পরিচয়

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

নবারুণ ভট্টাচার্য ৮৬১

বিবিধ প্রসঙ্গ

আ মরি বাংলা ভাষা ৮৬৭

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

প্রচ্ছদ : কমল সাহা

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪২। সংখ্যা ৯-১১
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

ব্যক্তিত্বের বিখণ্ডন

ম্যাকসিম গোর্কি

জনগণ শুধুই সমস্ত বৈষয়িক মূল্যমানের স্রষ্টা শক্তি নয়, তারা আত্মিক মূল্যমানেরও একমাত্র এবং অফুরন্ত উৎস ; সময়, সৌন্দর্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে তারাই যৌথভাবে প্রথম আর সবচেয়ে অগ্রণী দার্শনিক ও কবি, বিদ্যমান সমস্ত মহৎ কবিতার, পৃথিবীর সমস্ত ট্রাজেডির স্রষ্টা ; আর এই সব ট্রাজেডির মধ্যে মহত্তম হল বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাস।

শৈশবাবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সহজাত বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে যাকে তারা ভয় করত, সম্ভ্রম দেখাত ও শ্রদ্ধা করত সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে খালি-হাতে লড়াইয়ে লিপ্ত জনগণ সৃষ্টি করেছিল ধর্ম ; সেই ধর্মই ছিল তাদের কবিতা, তার মধ্যেই ছিল প্রকৃতির নানা শক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের যোগফল এবং তাদের চারপাশের বৈরি বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে সংঘর্ষে অর্জিত অভিজ্ঞতার সার। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অর্জিত প্রথম বিজয়গুলি জনগণকে দিয়েছিল একটা স্থিতিশীলতার চেতনা, নিজেদের সম্পর্কে গর্ববোধ, আরো বিজয় অর্জনের বাসনা এবং তাদের প্রবৃত্ত করিয়েছিল বীররসাত্মক মহাকাব্য সৃষ্টি করতে ; এই মহাকাব্যই হয়ে উঠেছিল তাদের সমস্ত আত্মজ্ঞানের ভাণ্ডার ও নিজেদের প্রতি উৎসর্জিত চাহিদার আধার। তারপর অতিকথা (myth) আর মহাকাব্য একদেহে লীন হয়ে গেল, কারণ যেকোনো মহাকাব্যধর্মী কবিতার নায়কের উপরেই জনগণ আরোপ করল তাদের যৌথ মানসিকতার সমস্ত ক্ষমতা এবং হয় তাকে দিয়ে দেবতাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করাল, না হয় তাকেই স্থান দিল দেবতাদের মধ্যে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত চিন্তা নয়, একটি জাতির যৌথ সৃষ্টি-শীলতাই অভিব্যক্তি লাভ করে অতিকথা (myth) আর মহাকাব্যের মধ্যে,

ঠিক যেমনটি অভিব্যক্ত হয় যুগের মুখ্য চালিকাশক্তি ভাষার মধ্যে। ফিওদোর বুসলায়েভ[১] বলেছেন: "ভাষা ছিল সেই অখণ্ড ক্রিয়াকর্মেরই এক আবশ্যিক অংশ, যে-ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তির অংশগ্রহণ সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষ সমগ্র জনগণের ভীড়ের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করেনি।"

ভাষার গঠন ও বিকাশ যে একটা যৌথ প্রক্রিয়া, একথা ভাষাবিদ্যা ও সংস্কৃতির ইতিহাস—দুটির দ্বারাই তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র সমষ্টির প্রচণ্ড শক্তির মধ্য দিয়েই অতিকথা (myth) আর মহাকাব্যের অতুলনীয় ও প্রগাঢ় সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্য ভাব ও প্রকরণের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। এই সামঞ্জস্য আবার জন্মলাভ করেছিল যৌথ মানসিকতার সমগ্রতার দ্বারা, যে-যৌথ মানসিকতার ভাবনা-প্রক্রিয়ার ফলে বহিরঙ্গ হয়ে উঠেছিল একটি মহাকাব্যিক ধ্যান-ধারণার অঙ্গাঙ্গী অংশ; ফলতঃ উচ্চারিত শব্দ সর্বদাই ছিল একটি প্রতীক। ভাষান্তরে, বাচন ক্রিয়াটি একটি জাতির মানস-কল্পনায় জাগ্রত করেছিল কতকগুলি জীবন্ত রূপকল্প ও ধারণা, যার মধ্যে তারা তাদের ধ্যান-ধারণাকে মূর্ত করেছিল। হাওয়াকে যখন পাখির ডানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল তখন সেটাই ছিল আদিম ভাবানুষঙ্গের একটি দৃষ্টান্ত; হাওয়ার অদৃশ্য গতিকে মূর্ত করা হয়েছিল পাখির উড়ে চলার দৃশ্যমান গতিবেগের মধ্যে। "তীর উড়ে চলে পাখির মতো"—একথাটা বলা হয়েছিল পরবর্তী ধাপে। স্লাভরা বায়ুকে বলত 'স্ত্রি' আর 'বায়ুদেবতা' হল 'স্ত্রিবোগ' ('বোগ' হল ভগবানের রুশ প্রতিশব্দ—অনুঃ)। ভাষার এই মূল থেকে আমরা পেলাম এই রুশ শব্দগুলি: 'স্ত্রেলা', 'স্ত্রেঝেন' (অর্থাৎ, তীর, নদীর মূল ধারা—অনুঃ) এবং গতির দ্যোতক আরো অনেকগুলি শব্দ: ভ্স্ত্রেচা, স্ত্রুগ, স্ত্রিমুত, রিসকাত প্রভৃতি (শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে: সাক্ষাৎ; এক ধরনের সেকেলে নৌকো; বয়ে চলা; শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো—অনুঃ)। একটা গোটা জাতি যখন একসঙ্গে একটি মানুষের মতো চিন্তা করতে পারল, একমাত্র তখনই প্রমিথিউস, শয়তান, হারকিউলিস, স্ভ্যা-তোগোর, ইলিয়া, মিকুলা[২] প্রভৃতির মতো ব্যাপ্তিময় ধারণা ও পরমোৎকৃষ্ট প্রতীক এবং একটি জাতির জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও শত শত বিরাট সামান্যীকরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হল। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতা 'ইলিয়াড' বা 'কালেবালার' সমকক্ষ কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি, এই ঘটনাই যৌথ সৃজনশীল ক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আরও

প্রমাণ মেলে এই ঘটনায় যে ব্যক্তিগত প্রতিভা এমন একটি ও প্রতীকধর্মী চরিত্রের জন্ম দেয় নি যার শিকড় লোক-সৃষ্টিশীলতার মধ্যে নেই ; কিম্বা এমন কোনো একক বিশ্বজনীন 'টাইপ' সৃষ্টি করেনি লোককাহিনীতে বা উপকথায় আগে যার অস্তিত্ব ছিল না।

সমষ্টির সৃষ্টিশীল প্রয়াস, যার মধ্য দিয়ে নায়ক সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই, তবে আমি মনে করি এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে সমাহৃত করে এবং কিছু অনুমানের সাহায্যে সেই জ্ঞানের অনুপূরণ ঘটিয়ে আমরা প্রক্রিয়াটির মোটামুটি একটি রূপরেখা গড়ে তুলতে পারব।

অস্তিত্ব রক্ষার অন্তহীন সংগ্রামে রত গোষ্ঠী-মানবের (clan) কথাই ধরা যাক। চতুর্দিকে অপরিজ্ঞেয় ও প্রায়শই বৈরিভাবাপন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপার-বেষ্টিত ছোট্ট একদল লোক পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে বসবাস করত। এই জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের আন্তর-জীবন ছিল সবাকার পরীক্ষা-বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত ; তার সমস্ত অনুভূতি, চিন্তা ও অনুমান হয়ে গিয়েছিল সাধারণ সম্পত্তি। গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য তার মধ্যে কোনো চিন্তার উদয় হলে নিজের মনের ভার হাল্কা করার একটা সহজাত ইচ্ছা বোধ করত। এটা ছিল তার চারপাশের জঙ্গলের ভীতি-উদ্রেককারী শক্তি ও তার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো জীবজন্তু, সমুদ্র এবং আকাশ, রাত্রি ও সূর্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার অসহায়তাবোধ-সঞ্জাত একটা কিছু। তার রাত্রির স্বপ্ন, দিনরাত্রির ছায়াময় বিচিত্র জীবন থেকেও এর উদ্ভব হত। এই ভাবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তৎক্ষণাৎ সমষ্টির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেল, এবং সমষ্টির সঞ্চিত সমগ্র অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ালো তার প্রতিটি সদস্যেরই সম্পদ।

ব্যক্তি ছিল বস্তুত গোষ্ঠীর কায়িক শক্তিগুলির একটি নির্দিষ্ট **ভগ্নাংশের,** এবং একই সঙ্গে তার মানসিক শক্তির **সমগ্রের** মূর্ত রূপ। ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, পশুর আহার হতে পারে অথবা বজ্রাঘাতে নিহত হতে পারে, উৎপাটিত বৃক্ষ বা গড়িয়ে পড়া পাথরের নিচে চাপা পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, কিংবা নদী বা জলাভূমি তাকে গ্রাস করেও নিতে পারে। এই সব কিছুকেই গোষ্ঠী দেখত সেই ভীষণ শক্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে, যে শক্তি-গুলি মানুষকে পদে পদে বিব্রত করছে ; এবং এটাই গোষ্ঠীর মধ্যে জাগ্রত করত তার কায়িক শক্তির একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশকে হারানোর জন্য দুঃখের মনোভাব,

আরও হারানোর ভয়ে এরূপ ক্ষতির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার প্রয়াস, মৃত্যুর বিপদকে প্রতিহত করতে সমষ্টির সাধ্যায়ত্ত প্রতিরোধের সমগ্র শক্তিকে সমবেত করার প্রচেষ্টা এবং সেই বিপদকে প্রতিরোধ করার ও তার উপরে প্রতিশোধ নেবার স্বাভাবিক বাসনা। তাদের কায়িক শক্তির একটি অংশকে হারানোর ফলে সমষ্টির মধ্যে যে-ভাবাবেগ সৃষ্টি হত তা থেকেই আত্মপ্রকাশ করল ক্ষতিপূরণ করার, লোকান্তরিতকে পুনরুজ্জীবিত করার ও তাকে তাদের মাঝে ধরে রাখার এক অভিন্ন, অ-সচেতন অথচ প্রয়োজনীয় ও তীব্র বাসনা। মৃতের সম্মানে আয়োজিত মরণোত্তর ভোজের আসরে গোষ্ঠী-মানব (clan) এই সর্বপ্রথম প্রকাশ করল বুদ্ধিবৃত্তির কথা, ব্যক্তির কথা ; নিজেকে উৎসাহিত করে, এবং যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে গোষ্ঠী (clan) সেই ব্যক্তিত্বের উপরে আরোপ করত তাদের নিজেদের সমস্ত দক্ষতা, শক্তি ও বুদ্ধি, আর ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী উভয়কেই দৃঢ়তর ও বলিষ্ঠতর করে তোলার মতো সমস্ত গুণাবলী। সেই মুহূর্তে হয়ত গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য খুব সম্ভবত সেই ব্যক্তির কোনো কীর্তির কথা স্মরণ করত, কিংবা তার কোনো সুখ-স্মৃতি বা চিন্তাভাবনার কথা স্মরণ করত ; সে অনুভব করেনি কোনোক্রমেই সমষ্টির বাইরে তার 'আমি-'র অস্তিত্ব আছে এবং সেই 'আমির' অন্তর্বস্তু ও তার সমস্ত শক্তিকে সে যুক্ত করত মৃতব্যক্তির ভাবরূপের সঙ্গে। এই ভাবে গোষ্ঠীর উপরে দেখা দিল নায়কের ধারণা, যে-নায়ক হল গোষ্ঠীর কর্মে রূপায়িত সমগ্র শক্তির মূর্ত রূপ ও বাহন এবং গোষ্ঠীর আত্মিক শক্তির প্রতিবিম্ব। এইরূপ মুহূর্তেই হয়তো দেখা দিল এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা এবং জাগ্রত হল মৃত্যুর মধ্যে জীবন সঞ্চারণের এক সৃষ্টিশীল ইচ্ছা। সমান শক্তি নিয়ে মৃতব্যক্তিকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যচালিত হয়ে সমস্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত হল তার ভাবরূপের মধ্যে যার ফলে সমষ্টি সম্ভবত তাদের মধ্যে সেই নায়কের উপস্থিতিও অনুভব করতে পেরেছিল, যে-নায়ককে তারা সদ্য সৃষ্টি করেছে। আমার মনে হয়, বিকাশের এই স্তরেই 'সে'-র ধারণা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু 'আমি'-র ধারণা তখনও পর্যন্ত রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি ; কারণ সমষ্টির পক্ষে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

গোষ্ঠীগুলি একত্র হয়ে গঠন করল উপজাতি, এবং গোষ্ঠী-নায়কেরা মিশে গেল উপজাতীয় নায়কের ভাবমূর্তির মধ্যে। এটা খুবই সম্ভব যে হারকিউলিসের দ্বাদশ শ্রমকীর্তি দ্বাদশটি গোষ্ঠীর মৈত্রীবন্ধনেরই স্মারক।

নায়ক যখন সৃষ্টি করা হল এবং তার শৌর্য ও সৌন্দর্য যখন হয়ে উঠল গর্ব ও

প্রশংসার বিষয়, তখন জনগণ তাকে দেবতাদেরই একজন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল, যাতে স্বতই বৈরি ও মানবজাতির প্রতি বৈরিভাবাপন্ন প্রকৃতির বহুবিধ শক্তির বিপ্রতীপে তাদের সংগঠিত শক্তিকে উপস্থিত করা যায়। মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে বিরোধের ফলে জন্ম নিল মানবজাতির প্রতিভাস্বরূপ প্রমিথিউসের প্রচণ্ড ভাবমূর্তি, আর এইখানেই জনগণের সৃষ্টিশীলতা উন্নীত হল বিশ্বাসের মহত্তম প্রতীকে, কারণ এই প্রতীকের মধ্যেই জনগণ প্রকাশ করলেন দেবতাদের সমীপবর্তী হবার কাঙ্ক্ষিত উচ্চ লক্ষ্য ও দেবতাদের সঙ্গে তাদের সমকক্ষতার চেতনাবোধ।

লোক সংখ্যা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংগ্রাম দেখা দিল, এবং 'আমরা'-র ধারণায় যে-সমষ্টিকে প্রতীকায়িত করা হয়েছিল, এখন এর কিছুটা কাছাকাছি এল 'তারা'-র সমষ্টি; 'আমি'-র ধারণা উদ্ভূত হল তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে। 'আমি'-র আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়াটি কাব্যিক নায়কের আবির্ভাবের প্রক্রিয়ার সমধর্মী; সমষ্টি অনুভব করল, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা অবশ্যকর্তব্য, কারণ 'তাদের' বিরুদ্ধে ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিভিন্ন কাজ ভাগাভাগি করে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বিশেষীকরণের, সদস্যদের মধ্যে যৌথ অভিজ্ঞতা বণ্টনের; এই মুহূর্তটিতেই হল সমষ্টির অখণ্ড শক্তি-বিভাজনের সূচনা। যাই হোক, তাদের মধ্য থেকে সমষ্টি যখন কোনো ব্যক্তিকে সর্দার বা পুরোহিতের পদে উন্নীত করল, তখন তারা তাকে বিভূষিত করল তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে, ঠিক যেমন ভাবে তারা নায়কের ভাবমূর্তিকে বিভূষিত করেছিল তাদের সমষ্টিগত মানসিকতা দিয়ে। সর্দার বা পুরোহিতকে যে-ভূমিকা পালন করতে হবে তার দীক্ষাদান পদ্ধতি নিশ্চয়ই অভিব্যক্তি লাভ করেছিল নেতৃত্ব পালনে নিয়তি-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির উপরে প্রযুক্ত এক ধরনের মানস-ভাবনা আরোপ বা সম্মোহক প্রভাবরূপে। যাই হোক, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে সমষ্টি তার শক্তিসমূহের ঐক্যের আন্তর-সচেতনতাকে লঙ্ঘন করে নি; সেই সচেতনতার বিনাশ ঘটেছিল ব্যক্তির মানসিকতায়। সমষ্টি যাকে তাদের মধ্য থেকে জন্ম দিয়েছিল সেই ব্যক্তিত্ব যখন কালক্রমে তার সামনে, পাশে কিংবা পরবর্তীকালে তার **উপরে** দাঁড়াতে শুরু করল, তখন সেই ব্যক্তিত্ব প্রথমে সমষ্টির মুখপাত্র রূপে তার উপরে ন্যস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিল; পরবর্তীকালে যখন সে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করল এবং যৌথ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুকে মিল-মিশ্ করার মতো উদ্যোগ

প্রদর্শন করল, তখন সে সমষ্টির আত্মিক শক্তিগুলির থেকে স্বতন্ত্র এক নতুন সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে নিজের সম্পর্কেও সচেতন হল। এটাই ছিল ব্যক্তিত্ব-প্রস্ফুটনের সূচনা-মুহূর্ত; এই নতুন আত্ম-সচেতনতা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ-নাটকের প্রস্তাবনা।

সমষ্টি যে ব্যক্তিকে তুলে ধরেছিল সে যখন নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রখর বোধ ও নিজের তাৎপর্য সম্পর্কে উপলব্ধি নিয়ে সমষ্টির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করল, তখন প্রথমে সে তার চারপাশে কোনপ্রকার শূন্যতা অনুভব করেনি। কারণ সে ছিল তার মধ্যে প্রবহমান সমষ্টির আত্মিক শক্তির স্রোত-ধারায় সুরক্ষিত। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মধ্যে সমষ্টি দেখতে পেল তাদের নিজেদের ক্ষমতার প্রমাণ এবং তারা এই 'আমির' মধ্যে তাদের শক্তিকে সঞ্চারিত করে চলল; এই 'আমি' তখনও পর্যন্ত তাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন ছিল না; নেতার হীরকদীপ্ত মন ও ঐশ্বর্যশালিনী প্রতিভার প্রতি সমষ্টির ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং তারাই তার মাথায় গৌরব-মুকুট পরিয়ে দিল। নেতার সামনে ছিল উপজাতির মহাকাব্যিক নায়কদের ভাবমূর্তি, তারা যেন তাদের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে চ্যালেঞ্জ করছে; এই সময় সমষ্টি মনে করল তাদের সর্দার ব্যক্তিটির মধ্যে অন্য এক নায়ক সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম। উপজাতির পক্ষে সে কাজ করার সম্ভাবনাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই সময়ে একটি উপজাতির শৌর্যকীর্তির খ্যাতি ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি বা প্রাচীরের মতোই একটা ভালো বর্ম।

'আমি' প্রথমে সমষ্টির সঙ্গে তার আত্মীয়তা-বন্ধন হারায়নি; নিজেকে সে মনে করত উপজাতির অভিজ্ঞতার আধার বলে; এবং যখন চিন্তাধারা রূপে সেই অভিজ্ঞতা বিন্যস্ত হল, তখন নতুন নতুন শক্তির সঞ্চয় ও বিকাশকে তা ত্বরান্বিত করল।

মনের মধ্যে উপজাতীয় নায়কদের ভাবমূর্তি নিয়ে এবং অন্যের উপরে নিজের ক্ষমতার আনন্দ-আস্বাদ উপভোগ করে ব্যক্তি চেষ্টা করতে লাগল, যে-অধিকারের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে তা নিজের ব্যবহারের জন্য জমিয়ে রাখতে। এটা সে করতে পারত একমাত্র সদ্য-রচিত ও পরিবর্তনসাপেক্ষ কোনো কিছুকে চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে এবং জীবনের যে-ধরনধারণ তাকে পাদপ্রদীপের সামনে এনেছে তাকে পরিবর্তনাতীত বিধানে রূপান্তরিত করে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না।

সেই জন্যই আমার মনে হয়, আত্মিক সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এক রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছিল। সে যখন তার ব্যক্তিগত অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করেছিল, তখন তাকে বাধ্য হয়েই সমষ্টির সৃষ্টিশীলতাকে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছিল, তার কাজকে সংকীর্ণ এবং তদ্দ্বারা বিকৃত করতেও হয়েছিল।

সমষ্টি অমরত্বের সন্ধান করে না, কারণ সে অমরত্বের অধিকারী ; ব্যক্তি যখন অপরের উপরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নিজের মনে অক্ষয় এক অস্তিত্বের তৃষ্ণাকে লালন করে।

সর্বদাই যেমনটি হয়ে থাকে, জনগণের সৃষ্টিশীলতাও ছিল তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ; সংশ্লেষণের আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে তা উৎসারিত। অন্যদিকে, ব্যক্তি তার প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকার সজোরে ঘোষণা করেছিল একটি মাত্র উপাস্যদেবতা চাপিয়ে দিয়ে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন অপরকে নির্যাতন করার অধিকার সহ শাসক শক্তিরূপে নিজেকে সংহত করল, তখন তা সৃষ্টি করল এক শাশ্বত ঈশ্বরকে, 'আমি'-র দেবসুলভ চরিত্র স্বীকার করতে জনসাধারণকে বাধ্য করল, এবং নিজের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা সম্পর্কে অবিচল আস্থাও গড়ে তুলল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আবশ্যিকভাবেই তারই নিজের প্রতিষ্ঠিত পরম্পরার সঙ্গে এবং তারই সৃষ্ট শাশ্বত ঈশ্বরের ভাবমূর্তির সঙ্গে, যে-ভাবমূর্তি ঐসব পরম্পরাকে পূত-পবিত্র করে তুলেছিল তার সঙ্গে, তীব্র সংঘাত বাধাল। যে-অমর ঈশ্বর ছিল তার অবলম্বন ও অস্তিত্বের যাথার্থ্যস্বরূপ, ক্ষমতা-লাভের তৃষ্ণায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার সেই অমর ঈশ্বরকে হত্যা করতে বাধ্য হল। সেই মুহূর্তটিই নিয়ে এল দেবসুলভ এবং নিঃসঙ্গ 'আমি'-র দ্রুত পতন ; কোনো বাহ্যিক শক্তির সমর্থন ছাড়া এই 'আমি' সৃষ্টিশীলতায় অক্ষম এবং সেইহেতু প্রাণধারণেও অক্ষম ছিল ; কারণ **বেঁচে থাকা আর সৃষ্টি করা অবিচ্ছেদ্য।**

আমাদের সমকালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবার নানাভাবে চেষ্টা করছে ঈশ্বরকে পুনরুজ্জীবিত করতে ; সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে-যাওয়া, সমস্ত জীবন্ত সৃষ্টিশীল শক্তির উৎস—সমষ্টির সঙ্গে চিরতরে সংস্পর্শ হারানো 'আমি'-র ব্যয়িত শক্তিগুলিকে পুনরায় সুদৃঢ় করে যাতে তার কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই উজ্জীবন-প্রচেষ্টা।

উপজাতির মধ্যে দেখা দিতে শুরু করল ব্যক্তির স্বৈরাচারের প্রতি ভীতি

এবং তার প্রতি বৈরিভাব। ভোলগা-বুলগারদের সম্পর্কে ইবন-ফাদলান প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন বেস্‌তুঝেভ-রিউমিন[৩] : "লোকে যদি এমন একজনের দেখা পায় যার মন অসাধারণ, নানা বিষয় সম্পর্কে যার গভীর জ্ঞান আছে, তাহলে তারা বলে, 'সে ঈশ্বরের সেবার উপযুক্ত', তারপর তারা তাকে ধরে গাছে ঝুলিয়ে দেয় এবং সেই শব না-পচা পর্যন্ত সেখানেই রেখে দেয়।" খাজারদের মধ্যে আরেকটি প্রথা প্রচলিত ছিল : একজন সর্দার নির্বাচন করার পর, তারা তার গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করত ক'বছর সে জনসাধারণের উপরে শাসন চালাতে চায়। সে যত বছর বলত তত বছরই শাসন করতে সে বাধ্য থাকত, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হত। এই প্রথা অন্যান্য তুর্কি উপজাতির মধ্যেও দেখা যেত, এবং এটা ছিল সমষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি উপজাতির অবিশ্বাসের চিহ্ন।

জনসাধারণের উপকথা, কাহিনী ও কুসংস্কারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির অসহায়তার অগণন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তার আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে পরিহাস, তার ক্ষমতাতৃষ্ণার প্রতি নির্দয় ধিক্কার এবং সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির প্রতি বৈরিতা প্রদর্শন। লোকগাথা এই প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ যে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম মানবজাতির যৌথ শক্তিকে দুর্বল ও ধ্বংস করে। এই কঠোর তত্ত্বে সমষ্টির সৃষ্টিশীল শক্তি সম্পর্কে কবিতার ভাষায় ব্যক্ত জনগণের প্রত্যয় ফলিত, পরিপূর্ণ ঐক্যের জন্য, প্রকৃতির অন্ধকার ও বৈরি শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য উচ্চকণ্ঠ, কখনো বা কর্কশ আহ্বান প্রতিফলিত। এই সংগ্রামে যে একাকী প্রবেশ করে সে হয় উপহসিত, তার ভাগ্যে আগে থেকেই পরাজয় নির্দিষ্ট করা হয়। জনগণের মধ্যে যেকোনো শত্রুতার মতোই এই যুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষ অবশ্যম্ভাবীরূপে অপর পক্ষের পাপগুলিকে অতিরঞ্জিত করত, আর এই অতিরঞ্জনের ফলে দুটি সৃষ্টিশীল নীতির মধ্যে—প্রাথমিক ও আহৃতের মধ্যে তিক্ততা আরো বাড়ত, ফাটল আরো ব্যাপক হত।

সংখ্যায় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যক্তিরা' নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে দিল ক্ষমতার প্রাচুর্যের জন্য, আরো বেশি খ্যাতি-লোলুপ এক 'আমি'-র স্বার্থরক্ষার জন্য ; সমষ্টি ভেঙে ভেঙে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল, ব্যক্তিতে তারা ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তি সরবরাহ করতে পেরেছিল। মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য খসে যাচ্ছিল এবং ব্যক্তি হয়ে উঠছিল আরো বিবর্ণ। তাকে তখন উপজাতির প্রচণ্ড বিরোধিতার সামনে নিজের প্রাপ্তিগুলিকে আঁকড়ে থাকতে হল ; আরো সজাগ

হয়ে তার ব্যক্তিগত পদমর্যাদা, সম্পত্তি, স্ত্রী ও সন্তানদের পাহারা দিতে হল। ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বের সমস্যাগুলি আরো বেশি জটিল হয়ে উঠল, দরকার হল প্রচুর প্রচেষ্টার। তার 'আমি'-র স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সমষ্টির সঙ্গে সংস্পর্শ হারালো, গিয়ে পড়ল এক ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যে, আর এই শূন্যতাই তার শক্তির ক্ষয় ঘটালো। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শুরু হল এক বিশৃঙ্খল সংগ্রাম—বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা আমাদের সামনে এই চিত্রই তুলে ধরেছে—যে-সংগ্রাম আজকের বিধ্বস্ত ও অক্ষম ব্যক্তির ক্ষমতার বাইরে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটল, মানুষের মধ্যে তা অনৈক্য আনল, তাদের সম্পর্ক তিক্ত করে তুলল এবং জন্ম দিল আপসহীন বিরোধের। দারিদ্র্যে যাতে নিমজ্জিত হতে না হয় তার হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হল। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তি সকল আত্মীয়তা-বন্ধন হারালো উপজাতির সঙ্গে, রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে; আজ সে অতি কষ্টে তার দলের চাপানো শৃঙ্খলা সহ্য করতে পারে, এমন কি পরিবারও তার শ্রান্তির কারণ হয়ে ওঠে।

সমষ্টিকে বিভক্ত করা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'আমি' সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কী ভূমিকা পালন করেছিল, সেকথা সবাই জানে ; এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অবশ্য, জনসাধারণের কায়িক ও নৈতিক দাসত্ব ছাড়াও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে জনসাধারণের কর্মশক্তির ক্ষয় এবং সমষ্টির যে মহৎ মানসিকতা, কাব্যিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টিশীল মানসিকতা পৃথিবীকে অজস্র সুন্দর শিল্পকৃতি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে সেই মানসিকতার ক্রমান্বিত বিনাশ।

বলা হয়েছে, "ক্রীতদাসদের কোনো ইতিহাস নেই" এবং গুণীব্যক্তিদের দ্বারা কথিত হলেও এই বক্তব্যের সামান্য কিছু সত্যতা আছে। গীর্জা ও রাষ্ট্র উভয়েই সমান অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেছিল জনগণের আত্মাকে নির্বাপিত করতে, যাতে তাদের পরিণত করা যায় কাঠ-কাটা আর জল-বওয়া মজুরে। অস্তিত্বের অর্থ কী সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুমান সৃষ্টি করার এবং উপকথা ও কাহিনীতে তাদের আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও আশাকে প্রতিফলিত করার অধিকার ও সুযোগ দুটিই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আত্মিক শৃঙ্খলের দরুণ কাব্যিক সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে আগেকার উচ্চ শীর্ষতা অর্জন করতে না পারলেও জনগণ গভীর আন্তর-জীবন যাপন করতে লাগল—সৃষ্টি করল হাজার হাজার কাহিনী, গীত ও প্রবাদ, কখনো কখনো ফাউস্ট প্রভৃতির

মতো ভাবমূর্তি রচনার সুউচ্চ স্তরেও উন্নীত হল। ফাউস্টের কাহিনী সৃষ্টি করে জনগণ যেন চাইল ব্যক্তির আত্মিক অক্ষমতার উপরে জোর দিতে, যে-ব্যক্তি বহুকাল আগেই তার প্রতিপক্ষ হয়েছে; তার সুখতৃষ্ণাকে, তার জ্ঞানের সীমার বাইরে কী আছে তা জানবার চেষ্টাকে উপহাস করার ইচ্ছাও তাদের চালিত করেছিল। সকল দেশের মহৎ কবিদের মহত্তম সৃষ্টিগুলি জনগণের যৌথ সৃষ্টিশীল কৃতিগুলির সম্পদভাণ্ডার থেকেই উপাদান আহরণ করেছে; এই উৎসই সুপ্রাচীন কাল থেকে খোরাক যুগিয়েছে সমস্ত কাব্যিক সামান্যীকরণের, সমস্ত বিখ্যাত ভাবরূপ ও টাইপের।

ঈর্ষাকাতর ওথেলো, দ্বিধাগ্রস্ত হ্যামলেট আর কামুক ডন জুয়ান হল শেকসপীয়র ও বায়রনের আগে জনগণের সৃষ্ট টাইপ; কালদেরোঁ বলার অনেক আগেই স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের গানে বলেছে "এ জীবন এক স্বপ্ন", আর স্প্যানিয়ার্ডরা বলারও আগে একথা বলেছে স্প্যানিশ মুরেরা; সেরভান্তেসের আগে এবং একই রকম শ্লেষাঘাতপূর্ণ ও বিষণ্ণ ভঙ্গিতে লোককাহিনীতে 'নাইট' প্রথাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

মিল্টন, দান্তে, মিকিউইকজ, গ্যয়টে ও শিলার মহনীয় উচ্চতার শিখরে পৌঁচেছিলেন তখনই, যখন তাঁরা সমষ্টির সৃষ্টিশীলতায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন এবং অনুপ্রেরণা আহরণ করেছিলেন লোক-কবিতা থেকে, সেই গভীর ও অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস থেকে, সেই বিজ্ঞতাপূর্ণ ও সম্পদশালী উৎস থেকে।

উল্লিখিত কবিদের খ্যাতির অধিকার আমি কোনোমতেই অস্বীকার করছি না, তাঁদের তাচ্ছিল্য করার অভিপ্রায়ও আমার নেই, কিন্তু আমি একথা জোর দিয়েই বলতে চাই, ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা যদি আমাদের এরকম চমৎকারভাবে কাটা আর পালিশ করা রত্ন উপহার দিয়ে থাকে, আ-কাট হীরাগুলির জন্ম হয়েছিল কিন্তু সমষ্টির মধ্যে, জনগণের মধ্যে। শিল্প নিহিত থাকে ব্যক্তির মধ্যে, কিন্তু একমাত্র সমষ্টিই সৃষ্টিশীলতায় সক্ষম। জিউসকে সৃষ্টি করেছিলেন জনগণই, ফিদিয়াস শুধু তাকে রূপ দিয়েছেন মর্মরে।

একান্ত নিজস্ব উৎসের উপরে নির্ভরশীল, সমষ্টির সঙ্গে সংস্পর্শহীন এবং জনগণকে যা ঐক্যবদ্ধ করে সেই ধ্যানধারণার অভিঘাত-বহির্ভূত ব্যক্তি হয়ে যায় কুঁড়ে, মন্থর, রক্ষণশীল ও জীবনের বিকাশের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির ইতিহাস বিচার করুন, স্রোতহীন বদ্ধাবস্থায়, এবং সমাজ যখন একটা প্রবাহের অবস্থায় থাকে, যেমন রেনেসাঁ বা রিফরমেশনের

সময়ে ব্যক্তির ভূমিকা কী ছিল সন্ধান করুন, প্রথম ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন ব্যক্তির রক্ষণশীলতা, দুঃখবাদ, অনাসক্ত ও প্রশান্ত মনে ভগবৎ চিন্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের মনোভাব এবং পৃথিবী সম্পর্কে অন্যান্য ধরনের অবিশ্বাসের মনোভাবের প্রবণতা। এই রকম সময়ে জনগণ ক্রমাগত তাঁদের অভিজ্ঞতাকে দানা বাঁধান, আর ব্যক্তি জনগণের কাছ থেকে সরে যায়, তাদের জীবনকে উপেক্ষা করে, নিজের জীবনের কার্যকারণ ও অর্থ সম্পর্কে সমস্ত বোধ হারায় এবং সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করে শোচনীয়ভাবে নীচ ও একঘেয়ে অস্তিত্ব টেনে চলে তার মহান সৃষ্টিশীল ব্রতকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ চিন্তা, প্রকল্প ও তত্ত্বরূপে যৌথ অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করার ব্রতপালন অস্বীকার করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চোখে পড়বে ব্যক্তির আত্মিক শক্তির দ্রুত উন্মেষ, যার ব্যাখ্যা করা যায় এধরনের সামাজিক আলোড়নের সময়ে ব্যক্তির এমন একটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে-ওঠা দিয়ে—যার মধ্যে অন্য হাজার হাজার ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত। এই ইচ্ছাগুলি তাকেই বেছে নেয় তাদের বাহন হিসেবে। এরূপ কালপর্বে ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয় ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিতে, তার জনগণ, তার শ্রেণী ও তার দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল-কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে।

এই বিশেষ ব্যক্তি কে—ভোলতেয়ার না আর্চপ্রিস্ট আভ্‌ভাকুম,[৪] হাইনে না ফ্রা দোলচিনো, কিংবা কোন শক্তি তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়—'রোতুরিয়ে'-রা না রুশ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীরা, জার্মান গণতন্ত্র না কৃষক সমাজ—সে কথা অনাবশ্যক; যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, এরূপ নায়কদের দেখা যায় সমষ্টির কর্মশক্তির বাহন রূপে, জনসাধারণের মুখপাত্র রূপে। মিকিউইকজ ও ক্রাসিনস্কি পুরোভাগে এসেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন তাঁদের জনগণকে নির্দয়ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি বিরাট শক্তিতে, কিন্তু যখন তাঁরা আগেকার যে-কোনো সময়ের তুলনায় তাঁদের আত্মিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন। ইতিহাসের সমগ্র ধারায় সর্বদা ও সর্বত্র জনগণই মানুষকে সৃষ্টি করেছে।

এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রগুলির জীবন এবং 'ত্রেসেন্তো' ও 'কোয়াত্রোসেন্তোর' কমিউনগুলির জীবন থেকে। এই সময়ে ইতালীয় জনগণের সৃষ্টিশীলতা আত্মিক জীবনের সকল দিকের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং দেশের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে তার উষ্ণ রক্তস্রোতকে প্রবাহিত করেছিল, জন্ম দিয়েছিল মহিমান্বিত এক শিল্পকলার, লেখনী, তুলি আর ছেনির সাহায্যে রচিত শিল্পের মহৎ স্রষ্টাদের।

'প্রি-র‍্যাফেলাইট' শিল্পীদের শিল্পকলার চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য উদ্ভূত হয়েছিল জনগণের সঙ্গে শিল্পীদের শারীরিক ও আত্মিক নৈকট্য থেকে; আজকের শিল্পীরা সহজেই এর প্রমাণ পেতে পারেন, যদি তাঁরা অনুসরণ করার চেষ্টা করেন ঘিরলান্দাইও, দোনাতেল্লো, ব্রুনেল্লেস্‌চি ও তৎকালের এরূপ সকলের পদচিহ্ন। সেই সময়ে সৃষ্টিশীল প্রেরণার তীব্রতাটি ছিল প্রায় উন্মত্ততার কাছাকাছি এক মহৎ উন্মাদনা, আর শিল্পী ছিলেন জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকের দাস নয়। ১২৯৮ সালে ফ্লোরেন্সের জনগণ একটি গীর্জা নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করে আরনোলফো দি লাপোকে চিঠি লিখেছিলেন এই ভাষায়ঃ "আপনাকে নির্মাণ করতে হবে এমন এক সৌধ, যার চেয়ে মহত্তর ও সুন্দরতর কিছু মানুষের শিল্পকলা কল্পনা করতে পারে না; আপনাকে সেটি নির্মাণ করতে হবে এমন ভাবে যাতে তা **অত্যুত্তমরূপে** মহৎ একটি হৃদয়ের **উপযুক্ত হয়**, তার মধ্যে যাতে **এক** ইচ্ছায় লীন **নাগরিকদের** আত্মা **একীভূত** হয়।"

চিমাবুয়ে যখন তাঁর ম্যাডোনা শেষ করেন, তখন সেই এলাকায় এত আনন্দ-উল্লাস হয় এবং এত উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে সেই সময় থেকে যে-অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন তার নাম হয়েছে 'বোরগো আলেগ্রো' (আনন্দ-নিকেতন)। রেনেসাঁর ইতিহাসে এমন অজস্র ঘটনা আছে যা থেকে দেখা যায় যে সেই যুগে শিল্প ছিল এমন একটা কিছু জনগণকে যা অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে প্রভাবিত করত এবং তার অস্তিত্ব ছিল জনগণেরই জন্য; শিল্প লালিত হত জনগণের হাতে, তার মধ্যে তাঁরা তাঁদের আত্মিক চেতনা দিয়ে পরিপৃক্ত করতেন, তাকে দিতেন তাঁদের অমর, সুমহান ও সেই সঙ্গে শিশুর মতো আত্মা। যেসব পণ্ডিত এই যুগটি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা সকলেই এ-কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমন কি গণতন্ত্রবিরোধী মোনিয়েরও তাঁর গ্রন্থের শেষে লিখেছেনঃ

"মানুষ যা কিছু করতে সক্ষম 'কোয়াত্রোসেন্তো' তার সবই উদঘাটিত করেছে। প্রকাশ করেছে একথাও—এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি শিক্ষাও দিয়েছে—যে, শুধু নিজস্ব সামর্থ্যের উপরে নির্ভরশীল, সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, শুধু নিজের উপরে নির্ভরশীল ও শুধু নিজের জন্য বেঁচে-থাকা মানুষ সবকিছু অর্জনে অক্ষম।"

"শিল্প ও জনগণ এক সঙ্গে বিকশিত ও উন্নীত হয়—আমি, হান্‌স্‌ সাক্‌স্‌, একথাই মনে করি।"

আজকের মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর জিনিস অর্জন করতে সক্ষম এবং তাঁর আত্মার কী শোচনীয় তুচ্ছতা তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ থেকে আমাদের চিন্তা করা উচিত ভবিষ্যৎ আমাদের ভাগ্যে কী ধরে রেখেছে, ভেবে দেখা উচিত অতীত আমাদের কী শিক্ষা দিতে পারে এবং ব্যক্তিকে যা অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সেই কারণগুলি বার করা উচিত।

কালক্রমে, সকলের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সংগ্রামের দরুণ জীবন হয়ে ওঠে আরো কঠোর, আরো সংক্ষুব্ধ। ব্যক্তি তার স্বজাতের আক্রমণ প্রতিহত করতে বাধ্য হয় বলে এই শত্রুতা থেকে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব গড়ে ওঠা উচিত ছিল ; ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনোরূপ সৃষ্টিশীল প্রেরণা থেকে থাকে, তাহলে সকলের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের এই নিয়ত সংগ্রাম তাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করায় যেখানে সে সমগ্র বিশ্বের কাছে তার আত্মা ও কবিত্বগুণের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি এখনও পর্যন্ত একটিও প্রমিথিউস, বা এমন কি একজন উইলিয়ম টেল-এরও জন্ম দেয় নি, কিংবা সুপ্রাচীনকালের হেরাক্লসের সঙ্গে শক্তি ও সৌন্দর্যে তুলনীয় একটিও ভাবমূর্তির জন্ম দেয়নি।

সৃষ্টি হয়েছে বহু ম্যানফ্রেড, তাদের প্রত্যেকেই নানান ভাবে বলে একই জিনিসের কথা—ব্যক্তির জীবনের রহস্য, বিশ্বে মানুষের একাকীত্বের যন্ত্রণা, কখনো কখনো সেই যন্ত্রণা উন্নীত হয় নিখিলবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর দুঃখ-জনক একাকিত্ব নিয়ে শোকের মনোভাবে—এসবই শুনতে খুবই করুণ, কিন্তু তাতে প্রতিভার ছাপ সামান্যই। ম্যানফ্রেড হল প্রমিথিউসের ১৯শ শতকীয় অনুকরণ, একজন ফিলিস্টিন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর সুঅঙ্কিত প্রতিকৃতি, যে-ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এবং তার সম্মুখীন মৃত্যু সম্পর্কে অনুভব করা ছাড়া পৃথিবীতে আর সব কিছু অনুভব করার ক্ষমতা চিরতরে হারিয়েছে। কখনও কখনও সমগ্র পৃথিবীর দুঃখকষ্টের কথা বললেও সে দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য পৃথিবীর প্রয়াসের কথা ভাবে না ; চিন্তাটা যদি-বা তার মাথায় আসে, সে যেটুকু বলতে পারে তা এই যে, দুঃখকষ্ট অজেয়। একথা না বলে তার উপায় নেই, কারণ একাকিত্বে বিধ্বস্ত একটি আত্মা দৃষ্টিশক্তিহীন, সমষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত কার্য-কলাপ সে দেখতে পায় না, জয়লাভের চিন্তা তার অপরিচিত। 'আমি'-র জন্য থাকে আনন্দের শুধু একটি উৎস—তার রুগ্নতা এবং অনিবার্য মৃত্যুর আগমনের কথা বার বার বলা ; ম্যানফ্রেড দিয়ে শুরু করে সে গায় তার নিজের অন্ত্যেষ্টি-সংগীত, আর অনুরূপ একাকী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের অন্ত্যেষ্টি-সংগীত।

এই ধরনের কবিতাকে অভিহিত করা হয়েছে "'ভেল্‌ট্‌শ্‌মের্‌জ'-এর কবিতা।" আমরা যদি এর সারকথার মধ্যে প্রবেশ করি, দেখতে পাবো যে 'ভেল্ট'—পৃথিবীকে নিয়ে আসা হয়েছে একাকী মানুষ 'আমি'-র নগ্নতা ঢাকতে সাহায্য করার জন্য, তার কম্পিত মৃত্যুভয় থেকে এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন—এই বলে তার সোচ্চার অথচ অকৃত্রিম বিলাপ থেকে তাকে আশ্রয় দেবার জন্যে। ব্যক্তিত্ব যখন তার চারপাশের বিরাট ও জীবন্ত পৃথিবীর সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপন করে তখন সেই পৃথিবীতে সে তার এই অনুভূতিকে ছড়িয়ে দেয় যে অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ নেই, সে গর্বের সঙ্গে তার একাকিত্বের কথা বলে এবং তার করুণ আত্মার বিলাপের প্রতি মনোযোগ দাবি করে মশার মতো বিরক্ত করে জনগণকে।

এই কবিতা কখনো কখনো বলিষ্ঠ, তবে যন্ত্রণার অকৃত্রিম চিৎকার যতখানি হতে পারে শুধু ততটাই; তা সুন্দর হতে পারে, তবে শুধু সেই কুষ্ঠরোগের মতো, যখন ফ্লবেয়ার তা দেখান; জীবন ও সৃষ্টির উৎসস্বরূপ জনগণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ঐক্যের বোধকে যে-ব্যক্তি তার বুকের মধ্যে পিষে মেরেছে, সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশের যুক্তিগতিসংগত পরিণতি হিসেবে এটাই স্বাভাবিক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন তার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময়ে পুঁজিবাদের নির্দয় বজ্রমুষ্টি তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন করে সৃষ্টি করছিল সমষ্টিকে, প্রলেতারিয়েতকে পরিণত করছিল এক সুদৃঢ় নৈতিক বাহিনীতে। ক্রমে ক্রমে, অথচ ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে এই বাহিনী উপলব্ধি করতে শুরু করছে যে পৃথিবীর মহৎ সমষ্টিগত আত্মারূপে তার একার উপরেই অর্পিত হয়েছে জীবনকে মুক্তভাবে সৃষ্টি করার ব্রত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কাছে এই শক্তির আত্মপ্রকাশ যেন দিগন্তে ঘনকৃষ্ণ ঝড়ো-মেঘের মতো। শরীরের মৃত্যু যেমন তাদের ভীত করে এটাও ঠিক ততখানিই ভীত করে তোলে তাদের কারণ তাদের, কাছে এই শক্তির অর্থ হল সামাজিক মৃত্যু। তাদের প্রত্যেকেই মনে করে, তার 'আমি' বিশেষ বিবেচনা ও উচ্চ মূল্যায়নের দাবিদার, কিন্তু যে-প্রলেতারিয়েত পৃথিবীতে নতুন জীবন সঞ্চারিত করবে সে এইসব "আত্মার অভিজাতদের" উপরে তার মনোযোগের দাক্ষিণ্য বর্ষণ করতে চায় না। এবিষয়ে সচেতন বলেই এই ভদ্রলোকেরা প্রলেতারিয়েতকে আন্তরিক ভাবেই ঘৃণা করে।

এদের কেউ কেউ, যারা অধিকতর ধূর্ত এবং ভবিষ্যতের উচ্চ প্রতিশ্রুতি

সম্পর্কে যাদের বোধ আছে তারা সমাজতন্ত্রীদের কর্মীবাহিনীতে যোগ দিতে চায় আইন-প্রণেতা, ভবিষ্যদ্বক্তা ও নির্দেশক হিসেবে ; প্রলেতারিয়েতের বোঝা উচিত এবং তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে বুঝবেনও যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এদের পা মিলিয়ে চলার আগ্রহের পিছনে লুকিয়ে আছে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার ফিলিস্টিন-সুলভ বাসনা।

আত্মিক ভিক্ষাবৃত্তির স্তরে অধঃপতিত, স্ববিরোধের জালে আবদ্ধ, এবং নিজের জন্য আশ্রয় নেবার মতো একটি আরামদায়ক স্থান সন্ধানের চেষ্টায় সর্বদাই হাস্যকর ও করুণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভেঙে পড়েছে এবং তার মানসিকতায় আরো বেশি করে ক্ষুদ্র হয়ে পড়ছে। এটা অনুভব করে এবং হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে (এই হতাশা সে উপলব্ধি করতে পারে অথবা নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারে) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মুক্তির সন্ধানে উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে অধিবিদ্যায় অথবা পাপে, সন্ধান করছে ঈশ্বরের, অথচ সে শয়তানে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ; তার সমস্ত সন্ধান ও বিক্ষোভ মৃত্যুর আসন্নতার পূর্বাভাস দেয় এবং সচেতনভাবে উপলব্ধ না-হোক অন্তত তীব্রভাবে অনুভূত তার অপ্রতিরোধ্য ভবিষ্যত সম্পর্কে আতঙ্ক প্রদর্শন করে। বর্তমান কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদ্বিগ্ন হতাশার কবলে পড়েছে। সে তার ভারসাম্য হারিয়েছে, সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করছে জীবনের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে, কিন্তু তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে, একমাত্র যে-জিনিসটি বাকি রয়েছে তা হল তার ধূর্ততা, কোনো ব্যক্তি যাকে অভিহিত করেছেন "মূর্খদের জ্ঞান" বলে। তার আগেকার সত্তার আবর্জনাসদৃশ রূপে পর্যবসিত, আত্মার দিক দিয়ে শ্রান্ত এবং আত্মিক বিক্ষোভে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কখনো সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মাখামাখি করে, কখনো পুঁজিবাদের ঘৃণ্য মোসাহেবি করে, আর তার সামাজিক মৃত্যু যে প্রত্যাসন্ন সেই পূর্বাভাস তার ক্ষুদ্র রুগ্ন 'আমি'-র ভাঙনকে আরো ত্বরান্বিত করে। তার হতাশা ক্রমেই বেশি করে পরিণত হয় অসূয়ায় ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী তখন উন্মাদের মতো অস্বীকার করে, পুড়িয়ে দেয় সেই সব জিনিসকে যাকে সে একদিন আগেও পুজো করেছে ; তার নেতিবাদের সম্পূর্ণ অভিঘাত তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নিক্ষেপ করে গুণ্ডামি-রাহাজানির কাছাকাছি এক মানসিক অবস্থায়। যারা ইতিমধ্যেই অপমানিত তাদের অপমান করার ইচ্ছায় কিংবা হৃতমান ব্যক্তিদের মানহানির ইচ্ছায় আমি 'গুণ্ডামি' শব্দটি ব্যবহার করিনি—জীবন তা আমার সাধ্যের চেয়ে অনেক কঠোর হাতে এবং নির্দয়ভাবে

করেছে ; না, গুণ্ডামি হল ব্যক্তিত্বের মানসিক ও কায়িক অধঃপতনের ফল, তার ভাঙনের চূড়ান্ত মাত্রার অকাট্য প্রমাণ। এ হয়তো সামাজিক অপুষ্টিজনিত মস্তিষ্কের কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি, বোধেন্দ্রিয়ের কোনো রোগ, যাতে বোধশক্তি ক্রমেই বেশি করে ভোঁতা আর মন্থর হয়ে যায় এবং পরিবেশ-সৃষ্ট ছাপগুলিকে আরো কম তীব্রভাবে গ্রহণ করতে থাকে এবং এর ফলে দেখা দেয় বুদ্ধিবৃত্তির এক ধরনের অনুভূতিবিলুপ্তি।

গুণ্ডা এমন এক জীব যার কোনো সামাজিক অনুভূতি নেই, চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে যে কোনো যোগসূত্র অনুভব করে না, সমস্ত মূল্যমান সম্পর্কে যে অ-সচেতন, এমন কি ক্রমে ক্রমে যে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিও হারিয়ে ফেলে এবং যে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও আর সচেতন নয়। সুসংলগ্ন চিন্তায় সে অক্ষম, বিভিন্ন অবস্থার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে তাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় ; তার চিন্তা-প্রক্রিয়া যেন নিছক আলোর ক্ষণিক ঝলক, চারপাশের পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের উপরে বিলীয়মান ও ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে যা শূন্যতায় মিলিয়ে যায়। সে রোগগ্রস্তের মতো সহজেই প্রভাবিত হয়, কিন্তু তার দর্শনশক্তির পরিধি সংকীর্ণ এবং তার সংশ্লেষণ ক্ষমতা কণা-পরিমাণ। এটাই সম্ভবত তার চিন্তার বৈশিষ্ট্যসূচক স্ববিরোধিতার কারণ এবং কুতর্কের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের কারণ। সে জোর দিয়ে বলে যদিও যা বলে তা সে বিশ্বাস করেনা—"কাল মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই কাল সৃষ্টি করেছে।" কার্যত তার অক্ষমতা বোধের উপরে জোর দিয়ে সে আরো দাবি করে "যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সুন্দর-সুন্দর কথা, সুন্দর কাজ নয়।" সে তার তত্ত্বগত ও সামাজিক অবস্থান দ্রুত পরিবর্তনের ঝোঁক দেখায়। এটাও আবার তার রুগ্ন মানসিকতার অস্থিরতা ও উদ্‌ভ্রান্ততার পরিচায়ক। তার ব্যক্তিত্ব এমন যা শুধু ভেঙে গুঁড়িয়েই যায়নি, তা দুরারোগ্যভাবে বিভক্তও বটে—তার মধ্যেকার সচেতন ও সহজাত বৃত্তি একটিমাত্র 'আমি'-তে কখনো একীভূত হয়না বললেই চলে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শোচনীয় যোগফল এবং তার মনের দুর্বল সংগঠনী ক্ষমতা এধরনের একটি জীবের মধ্যে সৃষ্টি করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার অধিকতর প্রভাব, যার ফলে সে এক অন্তহীন অথচ মন্থর ও নিষ্ফল সংঘাতে লিপ্ত হয় তার পিতামহের ছায়ার সঙ্গে। প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী তিন গ্রীক দেবী ফিউরির মতো অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রতিহিংসাকামী প্রেতগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তাকে সর্বদা এক উন্মত্ত

উত্তেজক অবস্থায় রাখে, তার সহজাত প্রবৃত্তির গভীর থেকে জাগিয়ে তোলে পূর্বগানুকৃতিমূলক ও পাশবিক প্রবৃত্তি। তার ভোঁতা ও বিধ্বস্ত স্নায়ুগুলি সচীৎকারে জোরালো ও তীব্র উদ্দীপক বস্তু কামনা করে—সেই জন্যই গুণ্ডার ঝোঁক যৌনবিকারের দিকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ধর্ষকামিতার দিকে। তার অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন এই জীবটি জীবনের উপস্থাপিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা-গুলিকে আরো ঘন ঘন অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়, তার ফলে সামাজিক নীতিবোধ হারিয়ে যায়, দেখা দেয় সর্বাত্মক ধ্বংসকামী মতবাদ এবং তীব্র ঘৃণা—যেগুলি এই গুণ্ডার বৈশিষ্ট্যসূচক।

এ এমন একজন ব্যক্তি যে সারা জীবন উন্মত্ততার কিনারে ঝুলে থাকে। সামাজিকভাবে সে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুর চাইতেও বেশি ক্ষতিকর; সে নৈতিক সংক্রমণের উৎস, বিপজ্জনক বীজাণু ধ্বংস করতে যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা দিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না।

তার অসংলগ্ন চিন্তা এবং তার অদ্ভুত ও প্রায়শই বিরক্তিকর কার্যকলাপের তলায় রয়েছে পৃথিবীর প্রতি, জনগণের প্রতি বৈরিতা, সহজাত অথচ অক্ষম বৈরিতা, একজন রুগ্ন মানুষের দুঃখবাদ। তার উপলব্ধিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাই সে কোনো মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, জীবনের অগ্রযাত্রার অনেক পিছনে পড়ে আছে, সে পথ হারিয়েছে, সে পথ খুঁজে পেতে সে অপারগ। তার আর্তনাদ নিষ্ফল কারণ তা ক্ষীণ; তার বাক্যগুলি অসংলগ্ন, শব্দগুলি বিবর্ণ। তার আবেদন নিষ্ফল, কারণ তার চার পাশে যারা ঠিক তারই মতো, ঠিক সেই রকম অক্ষম ও অর্ধোন্মাদ; তার মতোই তারা কোনো সাহায্য দিতে পারে না এবং দেবে না। ঠিক তারই মতো বিদ্বেষপূর্ণভাবে তারা তাদের সামনের পথে যারা এগিয়ে চলে গেছে সে পথে থুথু ছিটায়, তারা যা বুঝতে পারে না তার কুৎসা করে এবং যাকিছু তাদের প্রতিকূল তাকে পরিহাস করে, অর্থাৎ পরিহাস করে এমন সব কিছুকে যা সক্রিয়, সৃষ্টিশীলতার চেতনায় যা সিঞ্চিত, পৃথিবীকে যা কৃতকর্মের ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করে এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশ্বাসের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ঃ কারণ সোফিয়া পিস্তিসের ভাষায়—"অগ্নি এক দেবতা, যিনি নশ্বর কামনা-বাসনাকে গ্রাস করেন এবং বিশুদ্ধ আত্মাকে আলোকোদ্ভাসিত করেন।" [ক্রমশ]

অনুবাদকঃ প্রফুল্ল রায়

পাদটীকা

১. বুসলায়েভ ফিওদোর ইভানোভিচ (১৮১৮-১৮৯৭)—বিশিষ্ট রুশ-ভাষাবিজ্ঞানী, 'রুশ ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ' এবং রুশ-সাহিত্য ও লোকগাথার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ও রচনাদি প্রণেতা।

২. স্‌ভিয়াতোগোর, ইলিয়া মুরোমেতস, মিকুলা সেলিয়ানিনোভিচ—রুশ লোক-মহাকাব্যের বীর নায়ক।

৩. বেসতুঝেভ-রিউমিন, কনস্তানতিন নিকোলায়েভিচ (১৮২৯-১৮৯৭)—রুশ বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তা। দুখণ্ডে সম্পূর্ণ 'রাশিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থ-প্রণেতা।

৪. আর্চপ্রিস্ট আভ্‌ভাকুম (১৬২১-১৬৮২)। রাশিয়ার অন্যতম রাস-কোলনিক নেতা। জার সরকারের হুকুমে ১৬৮২তে এঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।• এঁর 'আত্মজীবনী' ১৭ শতকের রুশ-জীবনের এক মূল্যবান দলিল।

রাজনীতি, বিশ্বাস ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

রমেন্দ্র বর্মণ

বাঙলা উপন্যাসের তিন প্রধান পুরুষের প্রস্থানভূমির মধ্যে যে একটা গভীর নৈকট্য রয়েছে একথা আমরা প্রায়শই অন্যমনে ভুলে থাকি। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রোমান্সের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যের জগতের কথা আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথে আমরা মননশীল কল্পনাসমৃদ্ধ তত্ত্ববিশ্বের পরিচয় নিতে আগ্রহী, আর শরৎচন্দ্র, অধিকাংশের নিকট, "কান্না-হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা"র এক জনপ্রিয় কথাকার। অথচ এই ত্রয়ী ঔপন্যাসিক যে একই নিবিড় আততিতে রাজনীতিকে উপন্যাসে বরণ করে নিয়েছিলেন তা বাঙলা উপন্যাসের এই দুর্দিনেও মনে করি না। কিন্তু বাঙলা উপন্যাসের প্রধান ভোক্তা যেখানে "প্রাক্-চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী" (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) সেক্ষেত্রে আপাত-প্রেক্ষণে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' রচনায় আত্মনিয়োগ মোটেই যথার্থ হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রধান চারটি উপন্যাসের রাজনীতিক উপজীব্য অনেকে খুশী মনে গ্রহণ করেন না। আর ভাগ্যে লাঞ্ছনার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা জানা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র কেন রচনা করেন 'পথের দাবী'? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা জ্ঞান অভিজ্ঞতার স্তর এবং উপন্যাসে এর রূপায়ণ সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে যে অনেক তর তম ইত্যাদি রয়েছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থেকেই বলছি, শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব। রালফ্ ফক্সের একটি উক্তির ভগ্নাংশ, "...in many cases literature is political, openly and deliberately political art." (The Novel and the People, page 41) এক্ষেত্রে তাই স্মরণীয়। শিল্পীর নিজস্ব তাগিদ, এবং উপন্যাসে বাস্তবতা পরিস্ফুটনের প্রবল চাপে তাঁকে রাজনীতির নিকট বারংবার প্রত্যাবর্তন করতে হয়। উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমস্যার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অথবা সূক্ষ্ম সংশ্লেষণের একজাতীয় দলিল এবং এভাবেই যেহেতু জীবন-সামগ্র্যের আদলটা স্পষ্টীকৃত হয়, সুতরাং

রাজনীতিকে জীবনে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নটা বোধহয় অবান্তর। কারণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় রাজনীতিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা অমোঘ হাতিয়ার। এমন কি আমাদের আবেগ-অনুভূতি-কল্পনা, চিন্তাভাবনা প্রভৃতি আত্মিক ও মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডকে রাজনীতিঅচ্ছুত বা নিরপেক্ষ বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস যে কিরূপ হাস্যকর তা কার্ল মার্কসের 'ক্রিটিকো অব পলিটিক্যাল ইকনমি'-র প্রস্তাবনায় যথার্থভাবে ধরা পড়েছে। আর সেজন্যে "মানুষ রাজনৈতিক জীব" (Zoon Politikon) এ্যারিস্টটলের অনেক কাল আগের এই ঘোষণাকে মূল্যবান বলে স্বীকার করতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়করা স্বদেশ-চিন্তায় পরাঙ্মুখ ছিলেন এমন অপবাদ তাঁদের দেওয়া যাবে না। তাঁরা হয়ত বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর নিয়ে মেতেছেন, কখনো বা এর বিপরীতটাকেই আদর্শ বলে জ্ঞান করেছেন, কিংবা কখনো স্বদেশ-বিদেশের এক অসম পরিণয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু বিচিত্র কর্মৈষণা, এবং ততোধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ নন্দনকর্মে আত্মবিনিয়োগের মধ্যে তাঁদের স্বদেশ-ভাবনার গূঢ় অভিজ্ঞান লভ্য। ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ, প্রশাসন-কার্যে বৈষম্যমূলক আচরণ, শিক্ষিতশ্রেণীর ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গ, সকল শ্রেণীর (শিক্ষিত-অশিক্ষিত) বেকার সংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি, ব্রিটিশ পুঁজিবাদের আঘাতে ভারতীয় শিল্পের নাভিশ্বাস ইত্যাদি রাজনৈতিক চিন্তার অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটায়। ফলে প্রায় অচল, অনড় জগদ্দল সমাজের বুকে জাগে বিচিত্র স্পন্দন—'সামাজিকেরা' নানা বিক্ষোভ-আন্দোলন-আলোড়নে জাতীয় মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন। আবেদন-নিবেদনমূলক সংস্কার প্রয়াস, সন্ত্রাসবাদ, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, মার্কসীয় বিপ্লববাদ ইত্যাদির আঘাতে আমাদের জাতীয় জীবন দলিত-মথিত হয়। ফলে রাজনীতি নানাসূত্রে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সদর দরজা দিয়ে অথবা গলিঘুঁজির পথে সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে, প্রবেশাধিকার লাভ করে। অবশ্য প্রাগুক্ত আন্দোলনগুলি মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর কবলিত ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা কতখানি নিঃশেষিত হয়েছিল এবং তার পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর যোগ্য ভূমিকা ও উদ্যোগ ভারতের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর তাৎপর্যে ব্যাপকভাবে সৃষ্ট না হওয়ায় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনও কতখানি অন্য খাতে বয়ে যায় তার বহুপ্রমাণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে পাওয়া যায়।

ভারতের কৃষক-শ্রমিকের গণসংগ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্যের দ্বারা আমাদের বুর্জোয়া-নেতৃত্ব শিক্ষিত হয় নি বলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও জনবিচ্ছিন্নতায় নীরক্ত পাণ্ডুর। জাতীয় মুক্তির উপায় হিসেবে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপক প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি এই ঐতিহাসিক কারণেই ঘটে। অবশ্য বাঙালির রোমান্টিক জাতীয় প্রকৃতিও যে তার আনুকূল্য করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙলা উপন্যাসেও সন্ত্রাসবাদের রক্তাক্ত মুদ্রা প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়।

সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি বঙ্কিমচন্দ্র (...the secret societies modelled themselves closely upon the society of the children of Ananda Math, 'Bandemataram' !' the battle cry of the children became the war cry not only the revolutionary societies, but of the whole of nationalist Bengal." (সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চিন্তা গ্রন্থের ১৪৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) রবীন্দ্রনাথের তো বটেই, শরৎচন্দ্রেরও একটি প্রিয়প্রসঙ্গ। 'দেনাপাওনা' অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' ইত্যাদিতে শরৎচন্দ্রের যে রাজনৈতিক পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল 'পথের দাবী'-তে তা হীরকদীপ্তি নিয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা রাজনৈতিক উপন্যাসকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়তা করে।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কেউই আক্ষরিক অর্থে রাজনীতিতে ছিলেন না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অপিচ, তাঁর চরিত্রের অনন্য স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার কথা মান্য বলে বিবেচিত হলে কোনোরূপ রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান যে তাঁর চারিত্র্যের একান্ত বিরোধী তা সহজেই অনুমেয়।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক বাতাবরণে স্বাদেশিকতায় দীক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট উপাদান বর্তমান ছিল। ভারতের "মলিনমুখ চন্দ্রমা" ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের ভারত-আবিষ্কারে (মূলত হিন্দু ভারত) এবং কর্মে ও কথায় নবভারত সৃষ্টিতে প্রণোদিত করে। চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার আয়োজন, কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবনে উৎসাহ দান, দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান, লোককথার সংগ্রহ ও প্রচার,

"ফিরে চল গাঁয়ে" জাতীয় রোমান্টিক ব্যাকুল আর্তির প্রসার ইত্যাদি প্রয়াস অবশ্যই স্বদেশকে চেনাজানা, নিজের করে পাওয়া বা আবিষ্কারে বিশেষ তাৎপর্য-বহ উদ্যম, যদিচ, রাজনৈতিক কর্মপন্থা হিসেবে এইগুলির কার্যকারিতা গভীর বিতর্কের বিষয়। বাল্যকৈশোরের রোমাঞ্চকর উন্মাদনার দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সেই তরঙ্গে স্নাত হয়েছিলেন তার কিছু কিছু বিবরণ 'জীবন স্মৃতি' 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতিতে লভ্য। "জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন ইহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা।···সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল।···দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৬৭)। "খ্যাপামির তপ্ত হাওয়া" বলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ একে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু এযে সন্ত্রাসবাদীদের দীক্ষাপদ্ধতির নকল মহড়া তা ধরতে মোটেই কষ্ট হয় না।

অবশ্য স্বদেশের প্রতি দায়িত্বকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই অস্বীকার করেন নি। জাতীয় সঙ্কট মুহূর্তে তিনি বারংবার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী (নিজস্ব পন্থায়) প্রতিবাদ করেছেন। হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রদায়িকতার সমস্যা, ধর্মীয় প্রশ্ন, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতাবাদ, ফ্যাসিজমের বিরোধিতায় তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা সর্বদাই লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উদার মানবিকতাবাদের গণ্ডীর বাইরে স্থাপন করার যথেষ্ট বিপদ রয়েছে তা বলা বাহুল্য। ফলে প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তিকে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে স্মরণীয় বলে বিবেচনা করি—"Rabindranath is not and has never been either a practical or a theoretical politician......But if we take politics in its human, and not in its professional sense, Rabindranath has been undoubtedly the greatest political force of modern Bengal." (Preface to Political Philosophy of Rabindranath by Sachin Sen).

বস্তুত আমাদের কথিত ত্রয়ী উপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন অভিযানে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত ছিলেন বেশ কয়েক বছর। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর

একনিষ্ঠ পূজারী হলেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তিনি তাঁদের নানাভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দিতেন এমন কিছু তথ্য শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুগত সহচর শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। "বিপ্লবীদের শরৎচন্দ্র বড় শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহ করতেন। মতের হাজার পার্থক্য থাকলেও তিনি এঁদের চরিত্র-মুগ্ধ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, অমানুষিক এবং চরম নির্যাতন যাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন তবু নতি স্বীকার করেননি বা একটি স্বীকারোক্তি মুখ থেকে বার করেননি, দেশকে যাঁরা আপন অস্থি মাংস অপেক্ষাও বেশী ভালোবেসেছেন তাঁদের তিনি অকপটে অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধা করতেন :......শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের কাছে তাঁদের বিগত জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী সব নিবিষ্টচিত্তে শুনতেন। তাঁদের দেশকে স্বাধীন করবার আশা ও স্বপ্ন, তাঁদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সফলতা ও বিফলতার ঘটনাবলী ও তার কারণ-পরম্পরা, বিপ্লবীদের প্রতি দেশের লোকের ধারণা ও ব্যবহার, ইংরেজের হাজত ও কারাগারে বিপ্লবীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের কথা সবই শরৎচন্দ্র তাঁদের নিজমুখ থেকে শুনতেন।...বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না কিন্তু বিপ্লবী কর্মীদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে যখনি প্রয়োজন হয়েছে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন।" (শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৫৬-৫৮)

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদী উভয়বিধ আন্দোলন-ধারার সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সমর্থ হন নি। শরৎচন্দ্র আর দশজন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মতোই এককালে রাজনীতি করেছিলেন এবং শেষে হতাশ হয়ে রাজনীতি পরিত্যাগ করেন ইত্যাকার ঈষৎ রূঢ় সিদ্ধান্তেই আমাদের পৌঁছুতে হয়। "আমি বড় চিন্তায় পড়েছি। Politics-এ যোগ দিয়েছিলুম। এখন তা থেকে অবসর নিয়েছি। ও হাঙ্গামায় সুবিধা করতে পারিনি। অনেক সময় নষ্ট হ'ল। এতটা সময় নষ্ট না করলেও হত।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ ৬ষ্ঠ সম্ভার, পৃঃ ৪২১)। শরৎচন্দ্রের এই উক্তিতে আমাদের প্রাগুক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। জাতীয় মুক্তিকামী এবং সমাজব্যবস্থা-পরিবর্তন-প্রয়াসী অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের কাছে রাজনীতি ব্যাপারটা ছেলেখেলার বিষয় নয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে আমরা সবিশেষ উৎসাহবোধ করি কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে

এই জ্ঞান কিছুতেই তাঁর জীবনদর্শন বা চেতনার সঙ্গে অদ্বৈত সংযোগে আবদ্ধ হয় না। আসলে শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার ফসলে পরিণত করতে সমর্থ হন নি। রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষা তো ছিল তাঁর নাগালের অনেক উঁচুতে। রাজনীতি ক্ষমতা দখল কাড়াকাড়ি বা ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপার নয় কিংবা আপন কোলে ঝোল টানার স্বার্থান্ধ হীন কৌশল মাত্র নয়—মানবজীবনের সঙ্গে এ জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে, সমাজব্যবস্থার কোনো মৌল পরিবর্তনই রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে ঘটতে পারে না। শরৎচন্দ্র এই সহজ সত্যটা বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে তাঁর নামজাদা একদা বাজেয়াপ্ত উপন্যাস 'পথের দাবী' একটি বৃহৎ সম্ভাবনার মহৎ অপমৃত্যু বলে গণ্য।

তিন

'পথের দাবী' যদিচ সরাসরি রাজনীতি নিয়ে রচিত উপন্যাসের একতম উদাহরণ (শরৎচন্দ্রের) কিন্তু প্রাক্ এবং উত্তর 'পথের দাবী' বহু উপন্যাসে রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনীতি-ঘেঁষা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত। শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ কিছু মন্তব্যের ('শ্রীকান্ত'-র তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তের মুখে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নরূপটা, চতুর্থপর্বে সতীশ ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর গ্রামবাসীদের কথোপকথনে গ্রামীণ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস-চিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি, 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের সূচনায় জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার প্রতি আঘাত হানার চেষ্টা) দ্বারা রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি কিংবা দ্বিজদাস-বন্দনার চরিত্রে রাজনীতির মিশেল দেওয়াতেই তা সীমাবদ্ধ। সুতরাং একে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক সচেতনতা অপেক্ষা স্পর্শকাতরতারই ইঙ্গিতবহ বলে মনে করি। 'জাগরণ' উপন্যাসটিতে পটভূমিকা নির্বাচনের মধ্যে কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কবলিত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১-২২) এবং বিলিতি দ্রব্য বর্জন আহ্বানের মধ্যে প্রথম বারের মতো বুর্জোয়া নেতৃত্বের তরফ থেকে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যাবার সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পন্থা হিসেবে অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে কোনো কূট প্রশ্ন না করাই

বাঞ্ছনীয়। আন্দোলন শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করার মুহূর্তে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেতৃত্বের দুর্বলতার পরিচায়ক একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মর্যাদা ও স্বীকৃতি আদায় করে। কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজ-পরিবেশে অসহযোগ এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন সঞ্জাত আন্দোলন,—বিলিতি শিক্ষা-দীক্ষা ও সহযোগিতায় পাকাপোক্ত-জমিদার কন্যার বৈপরীত্যে সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যথার্থ শিক্ষিত এক তরুণ অসহযোগব্রতী চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রচলিত ছকের বাইরে পদার্পণের চেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য ; কিন্তু উপন্যাসটি অসমাপ্ত বলে বেশী কিছু বলা সমালোচনার নামে জল্পনা-কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়ার নামান্তর হবে। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যে চরম বোঝাপড়ার যে ইঙ্গিত ছিল তা শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পরিস্ফুট করতে পারেন নি। চণ্ডীগড়ের বঞ্চিত কৃষকদের ষোড়শীর নেতৃত্বে চাষের জমি রক্ষার তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হবার ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী সামন্তশ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণের কবল হতে অস্তিত্ব রক্ষার তাই ছিল ইতিহাস-নির্দিষ্ট গতিপথ (সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-সংগ্রাম)। শরৎচন্দ্র নায়ক-জমিদার জীবানন্দের হৃদয় পরিবর্তন করে তাঁকে যেভাবে উদার মহামানবে রূপান্তরিত করেন তাতে উপন্যাসটি বৃহৎ তাৎপর্য হারিয়ে প্রায় সমাজসংসার বিবিক্ত ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বের (জীবানন্দ-ষোড়শী) সুলভ কাহিনীতে পর্যবসিত হয়। অত্যাচারী জমিদারের হৃদয়পরিবর্তন নিশ্চয়ই বিরল নয় এবং উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায় (কোন গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটেছে তাও উহ্য রয়েছে) অনুসারে অনুষ্ঠিত হলে হয়ত প্রবল আপত্তির কিছু থাকে না। কিন্তু ঔপন্যাসিক যে এক্ষেত্রে গভীর জীবন সমস্যাটিকে (সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম) পাশ কাটিয়ে একটা সহজ তরল সমাধান অন্বেষণ করেছেন তাতে সন্দেহ থাকে না। আসলে রাজনৈতিক উপন্যাসকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের প্রবাদতুল্য খ্যাতি ঝুলে আছে সূক্ষ্ম সূতোর উপর। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার গরিমাময় দিনগুলিতে এই আশঙ্কা অবশ্য কাউকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি।

'পথের দাবী' উপন্যাস আলোচনায় প্রধান সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন আমাদের পূর্বাচার্যগণ সন্ত্রাসবাদ এবং বিপ্লববাদকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় পরিবেশিত তথ্য হতে জানা যায় যে শরৎচন্দ্রের সন্ত্রাস-

বাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না ঘটলেও তাঁদের দুঃসাহসিক জীবনপণ সংগ্রামের কথা তাঁর অবিদিত ছিল না এবং তিনি এঁদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেন "শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে বিপ্লববদর্শনের পূর্ণ সমর্থন আছে" (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৫১৮) তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিপ্লবদর্শন' বলতে যথার্থত কি বুঝিয়েছেন ? 'বিপ্লবদর্শন' বলতে কি তাঁর লক্ষ্য মার্কসীয় পরিভাষায় 'পরিপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা'—যার মাধ্যমে বিশ্বের মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় ? মার্কসবাদী দার্শনিকেরা সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ও পরিণাম অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী রণকৌশল হিসেবে একে পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদে জনবিচ্ছিন্নতা, শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের প্রতি আস্থাহীনতা যেমন প্রবল তেমনি অর্থহীন বীরত্ব প্রকাশের ঝোঁকটাও প্রকট। সন্ত্রাসবাদ যে কার্যত বিপ্লব বিরোধী এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং অর্থনীতিবাদের সঙ্গে এর কোনো মৌল পার্থক্য নেই তা লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এভাবে—"The Economists and the present-day terrorists have one common root, namely, subservience to spontaniety,......The Economists and the terrorists merely bow to different poles of spontaniety ; the Economists bow to the spontaniety of "the labour movement pure and simple", while the terrorists bow to the spontaniety of the passionate indignation of intellectuals, who lack the ability or opportunity to connect the revolutionary struggle and the working-class movement into an integral whole. It is difficult indeed for those who have lost their belief, or who have never believed, that this is possible, to find some outlet for their indignation and revolutionary energy other than terror." (V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 5, Page 418).

অবশ্য সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব বিকাশ বা অবলুপ্তি ঐতিহাসিক কারণেই ঘটে। বাঙলা দেশ তথা ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রসার ইতিহাসের অনিবার্য গতিধারার বহির্ভূত কাকতালীয় ব্যাপার নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই এর মূল অনুসন্ধান করতে হবে। ১৮৮৫-তে দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কংগ্রেস

নেতৃত্বের এবং আন্দোলনের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের তেমন জোরদার অভিপ্রকাশ কোথাও পাওয়া যায় না—আবেদন-নিবেদনের অর্ঘ সাজিয়ে রাগ-অভিমানের পালা কীর্তন করে দেশসেবায় কংগ্রেস অধিকতর অভ্যস্ত ছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই আপসপন্থী মনোভাব ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ, ইংরেজী শিক্ষায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'র বাণী, বিবিধ প্রগতিশীল ভাবধারা এবং কর্ম-উদ্যমের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় লাভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী জাঁতাকলে পিষ্ট ভারতে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না। 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথকে তাই ঘোষণা করতে হয়—"অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনো দিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি ; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জন-সাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪০৭-৪০৮)। বৃটেনের নগ্ন শোষণ উৎপীড়ন এবং ক্রমবর্ধমান বেকারীত্বের জ্বালা দেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দেয়। স্বদেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি অবশ্য বিদেশের রাঙা আলোর হাতছানিতে উজ্জীবিত হয়েছিল। লেস্টার হাচিনসন লিখেছেন—"তৎকালীন ঘটনাবলী হইতে এশিয়ার জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণা লাভ করে। য়ুরোপ অপরাজেয়—এই ধারণা সেই সকল ঘটনাদ্বারা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্রশক্তি রুশিয়ার বিরাট স্থলবাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ায় পরাজিত করে এবং রুশিয়ার সমগ্র নৌ-বহর তুশিমার যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া ফেলে।...চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ইহা হইতে ধারণা করে যে, যে-বিরাট শক্তি (রুশিয়া) এতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকেও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তিটাকে যদি জাপানীরা এত সহজে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে যেহেতু ভারতবাসীরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে জাপানীদের তুলনায় বহুগুণে উন্নত, সেই হেতু তাহারাও ইংরেজদের পরাজিত করিতে পারিবে—অবশ্য যদি তাহারা সত্যই তাহাদের দেশ হইতে ইংরেজদের

বিতাড়িত করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। এদিকে 'বুয়র যুদ্ধ'-এও ব্রিটিশ সামরিক শক্তি সম্পর্কে পূর্বের উচ্চ ধারণা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাঙলার যুব সম্প্রদায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য বিপ্লবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ইতালী ও আয়ার্লণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।" (সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ১৩৬-৩৭ পৃঃ হতে উদ্ধৃত)। ব্রিটিশবিরোধী এই চরমপন্থী সংগ্রামী মনোভাব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচক। চরমপন্থীদের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও বীরত্বের দীপ্ত মহিমা নিশ্চয়ই অবিস্মরণীয়। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসেবে, পূর্বেই কথিত হয়েছে, চরমপন্থা বা সন্ত্রাসবাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও বহুবিধ। চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ মূলত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—কৃষক-শ্রমিক বা সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর সম্প্রসারণের কোনো সুদর্থক চেষ্টা দেখা যায় না। গণচেতনার জাগরণ এবং বৈপ্লবিক জীবনদর্শনকে জনতার সৃষ্টিশীল সত্তায় গ্রহণের মধ্যেই বৈপ্লবিক কর্মপন্থার সাফল্য নির্ভর করে, সন্ত্রাসবাদীদের ভাবধারায় কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে অবশ্য এই আন্দোলনের সামগ্রিক পটভূমি ও তাৎপর্য উহ্য থাকে, ফলে বইটি উত্তেজক অপরিণত রচনার নিদর্শনরূপে গণ্য। বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের মস্ত বড় দুর্ভাগ্য এই যে, রাজনৈতিক উপন্যাসে সমস্যাটাকে জীবন-সামগ্র্যের সঙ্গে বুননের প্রয়াস ঔপন্যাসিকেরা কদাচ দেখান। ফলে বাস্তবতা সমগ্র চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় খুব কম ক্ষেত্রেই। অভিযোগটা শরৎচন্দ্রের সম্পর্কেই প্রযুক্ত নয়—রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'ও এই অভিযোগের হাত এড়াতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীদের বিষয়ে শরৎচন্দ্র উৎসাহী ছিলেন, সম্ভবত তাঁর সহানুভূতিও অকৃত্রিম এবং প্রশ্নাতীত, পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের "বিভীষিকা পন্থা"র প্রতি অন্তরের সায় বা অনুমোদন ছিল না—এই তথ্যগুলি 'পথের দাবী' কিংবা 'চার অধ্যায়' আলোচনায় খুব জরুরি নয়। কারণ, শ্রেণী-সহানুভূতি এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের পশ্চাদ্‌গামিতা সত্ত্বেও ব্যালজাক ইতিহাসের গতিভঙ্গিকে অভ্রান্ত বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য পতন তাঁর অগোচর ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আগামী দিনের কুশীলবদেরও তিনি চিনতে পেরেছিলেন। ফলে উপন্যাসের বাস্তবতা তাঁর আয়ত্তগম্য হয়েছিল অনায়াসে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বা

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এ এই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবটা চাপা থাকে না, আর উভয়েরই বাস্তবজ্ঞান বা বোধ ভাসা ভাসা, অনেকটা উপরিতলের ব্যাপার। সন্ত্রাসবাদের মৃত্যুবীজ যে রয়েছে জনবিচ্ছিন্নতার মধ্যে কিংবা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি আলাদা করে সন্ত্রাসবাদের কোনো মূল্যায়নই যে অর্থবহ নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র, দুজনই বিস্মৃত হন অবলীলা-ভরে। বাস্তবের এই খণ্ড চিত্র এবং জীবন-সামগ্র্যের ভগ্নাংশ উপস্থাপনে উভয়ের দায়িত্ব বোধহয় সমান।

চার

স্বদেশী আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ডামা-ডোলের সময় আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থপাঠে (অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস) জানা যায়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ'—বৈপ্লবিকদের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশ-বিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন; জিব্রলটারের পথ দিয়া য়ুরোপে আসিয়াছেন। সে বন্ধ হইলে বৃটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কুছ্ পরোয়া নাই, ইহাই মনের ভাব।...সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়া অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে, অমনি বঙ্গভাষী ও পাঞ্জাবী ভাষী যুবকের দল লাগিয়া গেল। ইরান (পারস্য) ও বালুচিস্থানের মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দল দৌড়িয়া গেল। কাজে আগে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তাহার পর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয়। মরিব কি বাঁচিব তাহা পরে দেখা যাইবে, ইহাই ছিল সেই সময়ের বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্ত্বের অবস্থা।...পূর্ব এশিয়ায় তখন ভারত-বিপ্লব-উদ্যোগের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তৎকালে জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বৈপ্লবিকদের কার্যের জন্য ঘাঁটি বসিয়াছে।...এই সফল অবস্থার সমবায়ের ফলে বৈপ্লবিকেরা ভারতীয় বিপ্লব চালাইবার জন্য এক 'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করেন। এই 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'তে অনেক জাপানী অভিজাত বংশীয় যুবক ভর্তি হইয়াছিল।" (১৬—২২ পৃঃ)। এই "আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কিছু তথ্য শরৎচন্দ্র বর্মায় শুনেছিলেন"

বলে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত 'পথের দাবী' উপন্যাসে এর একটা আদল দুনিরীক্ষ্য নয়। স্বদেশ থেকে আত্মগোপনকারী একদল সন্ত্রাসবাদী সুদূর বর্মাতে মিলিত হয়েছে 'পথের দাবী' নামক গুপ্ত সমিতিকে কেন্দ্র করে। এ সমিতির প্রাণপুরুষ সব্যসাচী ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে চীন, জাপান, কোরিয়া সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে ধূমকেতুর ন্যায় পরিক্রমা করেছে—বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং অস্ত্রসংগ্রহ সব্যসাচীর বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রধান অঙ্গ। উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায় সব্যসাচী বর্মার কর্মধারা গুটিয়ে সিঙ্গাপুরের অভিযাত্রী। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ঘটনাকেন্দ্রকে কেন ভারতের বাইরে স্থাপন করেছিলেন তার কোনো সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। উপন্যাসের পটভূমির বিস্তারই কি শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ? চরিত্রবিকাশের কোনো অনিবার্য কারণ কি এর মধ্যে অনুস্যূত ? দুক্ষেত্রেই উত্তরটা নেতিবাচক। ফলে একদা প্রবাসে শোনা কাহিনীর প্রভাব, হয়ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসই এর মধ্যে কার্যকরী ছিল এ জাতীয় অনুমানের উপরই শেষ পর্যন্ত আমাদের নির্ভর করতে হয়।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মুখপাত্ররূপে শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী চরিত্রটি পরিকল্পিত। কিন্তু নায়ক চরিত্রে শরৎচন্দ্র এতো চড়া রঙ চাপিয়েছেন যে তাঁকে অনায়াসেই অতিমানব বা সুপারম্যানের পর্যায়ে ফেলা যায়। সব্যসাচী সর্ববিদ্যা বিশারদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অবাধে বিচরণ করতে পারেন—মানববিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী বিদ্যাও তিনি আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সরু আঙুলের চাপে ব্রজেন্দ্রের বাঘের থাবা গুঁড়িয়ে যায়, "অন্ধকারে প্যাঁচার মত দেখতে পায়" (সব্যসাচীর নিজের উক্তি), একাই ১০।১২ জন সশস্ত্র আক্রমণকারীর মোকাবিলা করতে পারেন, এদের মধ্যে ৬ জনকে আবার ঘটনাস্থলেই ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী দুর্ধর্ষ মোহনকেও লজ্জা দিতে পারে অনায়াসে। কিন্তু 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচীর দুঃসাহসিক কর্মধারার সাক্ষাৎ পরিচয় খুব অল্পই পাওয়া যায়, ফলে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণগুলিকে অলংকার শাস্ত্রের কেতাবী বুলি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কথা ও কর্মে যে আত্মীয়তা থাকলে চরিত্র রক্তমাংসে সাবয়ব হয়ে ওঠে সব্যসাচী চরিত্রে তারই অসদ্ভাব। অধিকন্তু, সব্যসাচীর আত্মপ্রচারের উৎসাহ, তাঁর বিপ্লবের (?) আদর্শ বা নীতি প্রচারের প্রধান অন্তরায়। সব্যসাচী আত্মকথনে পঞ্চমুখ না হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করলে

উপন্যাসটির তাত্ত্বিক মূল্যকে অগ্রাহ্য করার সাহস হত না আমাদের। রাজনৈতিক উপন্যাসে আদর্শসংঘাত, তর্কবিতর্ক বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ ছিল শরৎচন্দ্র তার পুরো সদ্ব্যবহার করেন নি।

'পথের দাবী' ধ্বংসের সমস্ত দায়িত্বটাই চাপানো হয়েছে অপূর্ব-র কাঁধে। অপূর্ব-র বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই ক্ষমার্হ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষক-শ্রমিকের বৈপ্লবিক আন্দোলন ধারার প্রতি সব্যসাচী যে অবজ্ঞা ("ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, একথাটা ভুলো না। আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নির্ব্বিরোধী, নিরীহ কৃষকদের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।") প্রকাশ করেছে তাতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে না। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেও কৃষক-শ্রমিক অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব অবশ্য এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতে গররাজী। ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা বিশ্বাসঘাতকতার উপর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ধ্বংসের দায়িত্ব আরোপ না করে গণসংগ্রামের পথ পরিহার, কৃষক-শ্রমিকের সংগ্রামী চেতনার প্রতি উপেক্ষা এবং রাজনৈতিক রণকৌশল হিসেবে সন্ত্রাসবাদ যে একটি অচল পন্থা তা পরিস্ফুট হলে উপন্যাসটি বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হত।

গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল, কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদাধিকারী শরৎচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের প্রতি আসলে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাতে অনেক সময় ধন্ধ লাগে। 'পথের দাবী'-র সন্ত্রাসবাদী দলে অপূর্বকে যেভাবে সভ্য করা হল তাতে মনে হয় গুপ্ত সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যেন পাড়ার ফুটবল ক্লাবের সভ্য হওয়ার সামিল। অথচ সন্ত্রাসবাদীদের রিক্রুটমেন্টের নিয়মকানুন সামরিক দলে ভর্তি হওয়ার চাইতেও নাকি কঠিনতর ছিল একথা সন্ত্রাসবাদী নেতাদের বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়। বিশ্বাসঘাতকতা করার পরও অপূর্ব-র বেঁচে থাকাটা 'পথের দাবী'-র আরেকটি অসঙ্গতি। সামান্যতম দলীয় শৃঙ্খলা-

ভঙ্গের ফলে যেখানে চরমদণ্ড দেওয়া হয় সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা (যার ফলে তলওয়ারকর ধরা পড়েন, 'পথের দাবী'-র সমস্ত কর্মধারা বন্ধ করে দিতে হয়) করেও অপূর্ব বহালতবিয়তে বেঁচে রইল তা কেমন যেন বেমানান। প্রসঙ্গত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নাট্যাবেদনপূর্ণ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং সংগতির বিষয়টি উক্ত ঘটনার দ্বারা আলোকিত। দলত্যাগী সন্ত্রাসবাদী দাদা যখন "গচ্ছিত অর্থ আর আর্মস" ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে তখন পূর্ণের তাঁকে হত্যা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিলো না। শিবনাথ চরিত্রের ('ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক) পরিবর্তন সাধনে (সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান) কিংবা এই নাটকীয় পরিস্থিতির দৃশ্যে শিবনাথের উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল কিনা এ সকল প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রেখে বলা চলে তারাশঙ্কর এক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের দলীয় শৃঙ্খলা এবং অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নেতার আদেশ পালন ইত্যাদি চিত্রিত করে সন্ত্রাসবাদের যুগের একটি অবিকৃত বাস্তবচিত্র উপহার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, সব্যসাচীর 'পাষাণ হৃদয়ে' প্রেম ও করুণার ফল্গুধারার সন্ধান দেবার জন্যে শরৎচন্দ্র যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা উপন্যাসপাঠকের বাস্তবচেতনাকে আহত করে।

তদুপরি, সব্যসাচীর সন্ত্রাসবাদী বক্তব্যের পাশাপাশি ভারতী যে ভাবে অহিংস্র আন্দোলন, তথাকথিত উদারনৈতিক সংস্কার-প্রয়াস ইত্যাদির প্রচার চালিয়েছে তাতে ঔপন্যাসিকের আনুগত্য কোন দিকে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। 'পথের দাবী'র ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে শশী কবির নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাত্রাকালে নৌকার মধ্যে ভারতী কখনো প্রশ্নের ভঙ্গীতে বা কৌতূহল ভরে, কখনো বা অভিমান বশে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছে। ত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেখি সব্যসাচীর আবেগ থরথর উক্তির ("দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেচে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার ?") প্রতিবাদে ভারতীর কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে অহিংসার ললিত বাণী—"এসব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের কথা আছে।···যে বিদ্বেষ তোমার সত্য বুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেচে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে

এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্ব্বরতার দিন থেকেই চলে আসচে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?"

বস্তুত, সন্ত্রাসবাদ এবং অহিংসপন্থার মুখোমুখি সংঘর্ষকে এড়িয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাসটির ক্ষতিসাধন করেছেন। কারণ, আদর্শ-সংঘাতের মাধ্যমে চরিত্র বিকাশের নকশাটা একরৈখিক না হয়ে কার্যত জটিল কাটাকুটির শিল্পরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণামে তা ঔপন্যাসিকের শক্তিমত্তারই দৃষ্টান্তস্থল।

ভারতী হয়ত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কথিত শরৎ-সাহিত্যের শাশ্বত নারীর অন্যতম প্রতিনিধি। কোমল মাধুর্য এবং সেবাপরায়ণতার দ্বারা সে অপূর্ব বা সব্যসাচীর হৃদয়ই জয় করে নি—পরিশেষে আদর্শ ও বিশ্বাসের পুণ্যবেদিকায় স্থিতিশীল হয়েছে। ভারতীর বিপরীতে সুমিত্রা চরিত্রের দার্ঢ্য আমাদের আকর্ষণ করে কিন্তু এই চরিত্রের purpose সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ধারণা স্বচ্ছ ছিল না। বাঙালি পিতা এবং ইহুদী মার সন্তান সুমিত্রা জীবনের এক চরম সঙ্কট মূহূর্তে সব্যসাচীর সাহায্যে রক্ষা পায়। সব্যসাচীর প্রতি তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা চলে না—অপূর্ব-র বিচারের সময় 'পথের দাবী'র প্রেসিডেণ্ট হিসেবে সে-ই সন্ত্রাসবাদীদের সামরিক শৃঙ্খলার বিষয়টিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে —সুমিত্রা নিঃসন্দেহে সব্যসাচীর হাতের শাণিত আয়ুধ—বক্তব্যে হয়ত মুখর নয় কিন্তু কর্তব্যে একনিষ্ঠ অবিচল। ফলে 'পথের দাবী'র বিপর্যয়-লগ্নে সুমিত্রার সব্যসাচীর সংস্রবত্যাগ এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে জাভা-যাত্রা প্রত্যাশিত নয়। সব্যসাচী-সুমিত্রার অন্তর্গূঢ় প্রেমের এবং হার্দ্য সম্পর্কের ইঙ্গিত-গুলিকে শরৎচন্দ্র অস্পষ্ট রেখেছেন। রাজনৈতিক উপন্যাসে সুস্থ মানসিক প্রেমের অপহ্নুতি অবশ্য বাঙলা উপন্যাসের সনাতন ঐতিহ্য।

শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের সিংহভাগ দুর্বলচিত্ত, বিশ্বাসঘাতক অপূর্ব অধিকার করে থাকে। মায়ের আঁচলধরা টিকি ও শাস্ত্রে গভীর বিশ্বাসী অপূর্বই হচ্ছে এ্যাভারেজ বাঙালির টাইপ চরিত্র। অপূর্ব চাকুরি অন্ত প্রাণ, আবার দেশের প্রতি, সন্ত্রাসবাদের প্রতি একটা রোমাণ্টিক মোহও রয়েছে। আর সর্বশেষে "গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার" নেওয়া এবং নিজের জন্য নয় দেশের জন্যে সন্ন্যাস নিয়েছি এই আত্মপ্রতারণায় মজে থাকা আমাদের এ্যাভারেজ

শিক্ষিত মানুষের ললাটলিপি। সব্যসাচী রাজনৈতিক দর্শনের বন্ধ্যাত্বের জন্যে জনবিচ্ছিন্নতার শিকার, অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ। ভারতী এবং অপূর্ব যে পথে দেশের কাজ এবং চাষীদের উপকার করার পরিকল্পনা করেছে তাতেও যথার্থ মঙ্গল হবে না, কারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত না হলে সাধারণ মানুষের, কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি উন্নতি ইত্যাদি কথাগুলি বাতুলের কল্পনামাত্র হয়ে থাকে।

টলস্টয়-প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন প্রাক্-বিপ্লবযুগের সাহিত্যিকদের রচনায় বিপ্লববিরোধী এবং বিপ্লবীচেতনা যুগপৎ অস্তিত্বশীল থাকে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার কারণ শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিরুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষা বা রোমান্টিক কল্পকামনার রূপায়ণই এতে ঘটেছে তা বলা চলে না। আপসপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে, আমাদের আবেদন-নিবেদনমূলক সংস্কার আন্দোলনের যুগে নিঃশেষে প্রাণ-দানের যে আদর্শ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা স্থাপন করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই একধাপ অগ্রসর রাজনৈতিক চেতনার দ্যোতক। সব্যসাচীর এই ব্যঙ্গোক্তি—"আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার-আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকি,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজী হয় না এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী-প্রচার করে, বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেচি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেচে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দে মাতরমের দিব্বি করে বলচি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।"—আপোষপন্থী রাজনীতির রূঢ়রেখ পরিচিতি বহন করে। সনাতন নীতিবোধ এবং ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি যে সপ্রশ্ন অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছিলেন তাও শরৎচন্দ্রের প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়ঃ "পুরাতন মানেই পবিত্র নয় ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েচে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে

হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নাই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকে পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী ? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো ? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন ! সে সংস্কারের মোহে অপূর্ব্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি ? আর শুধু কি অপূর্ব্বর বর্ণাশ্রম ? তোমার ক্রীশ্চান ধর্ম্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।"

মোটকথা, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসে যেভাবে সমাজের তৎকালীন প্রগতিশীল এবং সংগ্রামী চেতনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা আজও বারংবার স্মর্তব্য।

•

উপন্যাস সমালোচনায় নতুন দৃষ্টি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস সমালোচক ও মনোযোগী পাঠক মাত্রেই শ্রীকার্তিক লাহিড়ীর 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি'* নামক বইটিকে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানাবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। উপন্যাসের টানেই তৈরী হয় উপন্যাস-সমালোচনা। গত কয়েক বছরের বাঙলা উপন্যাসের কতকগুলি মূল্যবান বিচিত্র প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেই বলা চলে যে, ঔপন্যাসিকেরা এখন আর শুধু বিনোদনকে মর্যাদা দিচ্ছেন না। তাঁরা বিনোদন অপেক্ষা পাঠকের নিস্তরঙ্গ হ্রদমানসে আলোড়নের জন্যই চেষ্টিত। এ দুর্মর জনশ্রুতি অবশ্য প্রতিযোগিতা-শীল বাজারে অর্থনৈতিক কারণেই বেঁচে থাকবে বেসটসেলারের বেশে—"বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাকৃচল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার ও উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী"। তথাপি এই চেহারাটিই বাঙলা উপন্যাসের সমগ্র পরিচয় নয়। উপন্যাসের জনতোষিণী ধারাযন্ত্রটি থেকে দূরে আরেকটি ধারা বরাবর বয়ে চলেছে—ব্যক্তিত্বের নির্জন গিরিচূড়ায় তারও জন্ম, ঔপন্যাসিকের কল্পনা ও উদ্‌ঘাটনের পশ্চাতে যে জীবন-ধ্যান কাজ করে, তাতেই তারও পুষ্টি। আজও একচেটিয়া ব্যবসারীতি উপন্যাস-সাহিত্যকে যখন বিবর্ণ ভাঁজকাটা একটাকার নোটের মতো সংশয়াবহ করে তুলেছে, তখনো উপন্যাসকে শিল্পকৃতি হিসাবেই প্রায় কবিতুল্য অভিনিবেশ এবং স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় চিহ্নিত করে চলেছেন, এমন ঔপন্যাসিক বিরল নয়। কয়েক বছর পূর্বে কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা' এবং ও বছরে প্রকাশিত লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ'—বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে দুর্নমনীয় সাহসিকতার নিদর্শন নয়, শিল্পীদের অভিজ্ঞতাসিদ্ধ রূপপ্রত্যয়ের নিদর্শনই বটে। নামপত্র ও কভার পেজটি হারিয়ে গেলে যেখানে একজনের উপন্যাসের সঙ্গে আর একজনের উপন্যাস পৃথক করা যায় না—সেখানে এ ব্যাপার প্রকৃত উপন্যাসরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। এসব উপন্যাস প্রমাণ করে যে, অভিজ্ঞতাই মূল্যবোধের

---

* বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি। ডঃ কার্তিক লাহিড়ী। সারস্বত লাইব্রেরি। দশ টাকা

প্রেরণায় রূপান্বিত হয়ে ওঠে উপন্যাসে, কিম্বা বলা যায় ঐ রূপটাই অভিজ্ঞতা। অতএব এতো খুবই স্বাভাবিক যে, আজ উপন্যাস-সমালোচকও হতে চাইবেন রূপকল্প-সচেতন এবং প্রযুক্তি-জিজ্ঞাসু। উপন্যাসের ফর্ম ও স্ট্রাকচার নিয়ে এদেশে বিলম্বে হলেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। ডঃ লাহিড়ীর বইটি সে পর্যায়ের বাঙলা উপন্যাস সমালোচনা-সাহিত্যে একটি দিকনির্দেশক গ্রন্থ। যথাসময়ের পরে, তথাপি এ আগমন স্বাগতযোগ্য।

জেমসীয় উপন্যাস তত্ত্বের অনিবার্য পরিণামেই উপন্যাসরসিকেরা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন কারুসচেতন। কিছু বেশি পঞ্চাশ বছর আগে ল্যুবক যখন ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দু এবং তার ঘটনা ও ঘটনাংশের দৃশ্য-ছন্দ নাটক ও মহাপটের ব্যাখ্যা শুরু করেন তখন থেকেই উপন্যাসের রূপান্বেষা অন্তত ওদেশে জিজ্ঞাসায় তীব্র হয়ে উঠেছে। এদেশে উপন্যাস-আলোচনা নানা কারণে প্রথানির্ভর বলে খুব কম ক্ষেত্রে সে আলোচনা বয়স্কমানসের উপযোগী। সেই অতি অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমের মধ্যে শ্রী লাহিড়ীর বই অন্যতম।

'ঘটনা প্রধান উপন্যাস : বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন পর্যায়,' 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস : বাংলা উপন্যাসের নব পর্যায়,' 'মননধর্মী উপন্যাস : বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা' এই তিনটি সুবিস্তৃত অধ্যায়ে লেখক বাঙলা উপন্যাসের রূপরীতির বিবর্তনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁর অধ্যায়ের শিরোণামগুলির দ্বিতীয়ার্ধ একটু ভ্রমাত্মক হবার ফলে এ সন্দেহ স্বাভাবিক যে তিনি বুঝি বাঙলা উপন্যাসের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন নতুন দৃষ্টিতে। কিন্তু গ্রন্থটির গভীরতর বিচারে সে কথা টেঁকে না। বরং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় তিনি চমৎকার প্রমাণ করেন এই সাহিত্য সিদ্ধান্ত যে, রূপের বিচারেই উপন্যাসের শিল্পকর্মের সত্যবিচার। এই তিন অধ্যায়ে লেখক তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন—কথাটা পৃথকভাবে বলা হল এইজন্য যে, তাঁর যোগ্যতা শুধু পণ্ডিতের যোগ্যতা কিনা তা পণ্ডিতেরা বলবেন, আমার বলার কথা এই যে, এটা রসিকের যোগ্যতা। 'বিষবৃক্ষ' বা 'চতুরঙ্গ'-এর আলোচনায় তিনি যে রসবোধ ও রসব্যাখ্যা প্রমাণিত করেছেন তা অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। কোনো অতিনাগরিক উন্নাসিকতায় তিনি যে বঙ্কিমকে নস্যাৎ করেন নি, বা মফঃস্বলীয় অতিভক্তিতে তিনি যে রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণেই বিগলিত হন নি, এতে বোঝা যায় তিনি স্থিতধী সমালোচক।

প্রতিটি উপন্যাসের আলোচনাতেই অগ্রাধিকার পেয়েছে লেখকের আঙ্গিক

সচেতনতা। উপন্যাসটির সম্যক বিচারে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় অপেক্ষা শিল্পকর্ম হিসাবে উপন্যাসটি কেমন সে কথাই গ্রন্থকর্তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। প্লটের সরলতা এবং জটিলতা নিয়ে এ জাতীয় আলোচনা, এবং যৌগিক প্লট ব্যাখ্যায় বাঙলা উপন্যাসসাহিত্যের উদাহরণের এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ, বাঙলা উপন্যাস সমালোচনা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায় নি। এই প্রসঙ্গে পৃথক ভাবে উল্লেখ্য অধ্যায় হল গ্রন্থটির 'আখ্যানভঙ্গী' নামক অধ্যায়টি। এই বিষয় সম্বন্ধে একটি বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করলেন ডঃ লাহিড়ী।

দুই

অবিনয়ের অগৌরব যদি স্পর্শ না করে, একটি বা দুটি প্রস্তাব শ্রী লাহিড়ীর কাছে বিবেচনার্থ পেশ করতে চাই:

১. যে-অর্থেই হোক বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যখন বিষয়সীমা, তখন তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই বাঙলা উপন্যাসের রূপরীতিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আভাস দেখা গেছে, উপন্যাস যে ব্যক্তির গহন মানসচারী হবার জন্য তখনই সচেষ্ট হয়েছে, সেকথা এ আলোচনার ফ্রেমে আসা উচিত্ ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ ও 'অন্তঃশীলা,' 'চতুরঙ্গ' আলোচনার স্বাভাবিক পরিণতিতেই এ গ্রন্থে গৃহীত, পরীক্ষিত হতে পারত।

২. এবং সেই সুযোগেই বাঙলা উপন্যাসের রূপরীতির বিবর্তন-সূত্রটিও আলোচিত হতে পারত কালগত তাৎপর্যের পেক্ষাপটেই। [প্রসঙ্গত একটি ব্যক্তিগত কথা অন্যান্য সুধিবৃন্দকে নিবেদন করতে চাই: অভিজ্ঞতার উপাদান ও আধার এই দুয়েরই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সূচিত হয় টেকনিকের রূপান্তর। টেকনিকের পৃথক ইতিহাস নিবিড়ভাবে সমাজ ও সভ্যতার নিজস্ব ইতিহাসের সঙ্গে গ্রথিত ও অন্বিত। সে কারণে যে সব সহৃদয় সমালোচক কোনো উপন্যাস বিষয়ক গ্রন্থ আলোচনায় কারো সম্বন্ধে 'দেশকাল সচেতন' এই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন তখন বিস্মিত হই এই ভেবে যে, দেশকাল সচেতনতা ছাড়া কোনো সাহিত্যই, বিশেষত উপন্যাস আলোচনা আদৌ সম্ভব কি?] সে-প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে শ্রীলাহিড়ী অনবহিত ছিলেন একথা বলা চলেনা। কিন্তু আমার ধারণা প্রেক্ষাপটটির পূর্ণতর ব্যবহার হয় নি।

৩. লেখকের একটি মন্তব্য বিষয়সীমাকে অতিক্রম করেছে বলে মনে করি:

"বিশ্বের অনবদ্য উপন্যাস সাহিত্যের পাশে রাখার মতো বাংলা সাহিত্যের একটি উপন্যাসেরও নাম করা যায় না।" তাহলে আর এ গ্রন্থের কোনো কার্যকারণ থাকেনা। 'চতুরঙ্গ' থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত দশখানি বাংলা উপন্যাসের নাম করা চলে যারা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং তার রূপায়ণের অনবদ্য সাক্ষ্য। পরম-পর্যায়ে আমাদের উপন্যাস কবিতার ধার ঘেঁষে যায়—সেটা ত্রুটি নয়, বৈশিষ্ট্য।—যেমন 'কবি,' যেমন 'দুইবাড়ি' যেমন 'অচিন্‌রাগিণী'। যদি বলতেন আমাদের ব্যর্থতা এসেছে বৃহৎ পট ও পটধৃত ব্যক্তিপাত্রের পারস্পরিক সন্নিপাতের ক্ষেত্রে—তাহলে কথাটি কিছুটা গ্রাহ্য হতে পারে। যে-জটিলতা এবং তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ইয়োরোপ প্রবেশ করেছে শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায়, ব্যক্তির অস্তিত্বের যে-অনপনেয় যন্ত্রণা, বিবিক্ততা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামগ্রী হয়েছে সেখানে, এখানে তা অনুভূত হতে শুরু করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যও ব্যক্তির সেই জটিলতার দর্পণ হতে পেরেছে তার পরেই। তার আগে আমাদের অর্ধবিকশিত উপনিবেশের পটপরিবেশের অভিজ্ঞতা নিয়েই কি লিখিত হয় নি 'গোরা', 'গণদেবতা' 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' অথবা 'আরণ্যক' ?

৪. ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনায় ডঃ লাহিড়ী কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির রূপবর্ণনার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অনবদ্য ও অসামান্য অধ্যায়টিতে ভাষা-প্রসঙ্গে প্রায়ই point of view বা প্রেক্ষণবিন্দুর বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়টির নামকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন।

৫. ১০৪ পাতায় 'লেখকের কর্তামি' এই কথাংশে 'কর্তামি' কথাটি শুনতে কানে বেজেছে।

৬. একটা নির্ঘণ্ট থাকা দরকার ছিল।

তিন

তবে এসমস্তই কী হলে হতে পারত তার আলোচনা। তিনি যা করেছেন, তার গুরুত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না এসব কথায়। 'আখ্যানভঙ্গী' ও 'ভাষা' (যাকে আমি প্রেক্ষণবিন্দুর আলোচনা বলতে চাই) শীর্ষক অধ্যায় দুটির কথা কৃতজ্ঞচিত্তে আরেকবার স্মরণ করি। স্মরণ করি 'চতুরঙ্গ'-র পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি। 'চতুরঙ্গ' আলোচনায় লেখক তাঁর রসবোধ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অন্তর-দৃষ্টি এবং কলাবিচারের পরম পরিচয় দিয়েছেন। মূলগ্রন্থ পাঠের আনন্দকে সংহত করে

তোলা যদি সমালোচকের কাজ হয়, ডঃ লাহিড়ী এ আলোচনায় সে কাজে সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। শরৎচন্দ্র এবং উপন্যাসগুলির আলোচনায় তিনি বিষয়-বিন্যাস ও রূপকর্মের এক অনাসক্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। 'শেষপ্রশ্ন' বা 'গৃহদাহ'-র বিষয় এবং বিন্যাসের ব্যাখ্যায় তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সার্বিক আলোচনায় নতুন দৃষ্টিকোণ অভিনন্দনযোগ্য।

রূপকল্প ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত এমন পৃথক আলোচনা বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে এর আগে হয় নি—একথা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। উপন্যাসরসিক হিসাবে লেখককে উপন্যাস সমালোচনাক্ষেত্রে আমি অভ্যর্থনা জানাই।

লজ্জা

দিলীপ সেনগুপ্ত

লম্বা লম্বা ঘাসের মাঠখানা এতই ছোট যে বাঁশের নামমাত্র গেট টপকে রাস্তা থেকে মাঠে শুধু পা ফেলারই অপেক্ষা। সামনে পাতকুয়া। পেছনে একটু ডানদিক ঘেঁষে ইঁটবালি খসে যাওয়া স্নানের ঘরখানা ; খেটেখুটে বানানো দরমার দরজায় প্রাক্তন কাঠের পাল্লার ভারিক্কিপনা পুরো না হোক খানিকটা যেন ফেরত দিয়েছে। কুয়া থেকে বালতিতে জল তুলে ওই হেন গোপন কক্ষে স্নানের জন্য ঢুকে পড়তে যে সময়টুকু দরকার, বীণার কাছে তার মূল্য অনেকটা। গুণলে অবশ্য তেমন কিছু নয়। অমিয় ঘরে থাকলে, প্রায়ই থাকে, 'একটু দেখো—আমি চানে গেলুম' বলে বালতি হাতে, কুঁজো মেরে সুড়ুত করে ঢুকে পড়া অনেকটা নাটকীয় উত্তেজনায়-কোনো চরিত্রের এক দৃশ্যের অভিনয় শেষ করে মঞ্চ থেকে গ্রীন রুমে ছুটে আসার মতো। অমিয় না থাকলে, প্রায় সময়ই থাকে বা থাকলেও 'আছে' এইটুকু জানা ছাড়া বীণার আর কোনো লাভ হয় না। অমিয়র ঘরে থাকা-না-থাকা একই প্রকার। তবু যখন থাকে না, ভরসা ভগবান। সামনের খোলা রাস্তাটা নিয়েই যত ভাবনা। এক গামছায় সবখানি দেহ ঢাকা পড়ে না। দুই গামছা দরকার হয়। তাতে-ও হয় না। দুই-এর একখানা বেখাপ্পা ছিন্ন থাকবেই। অমিয় জোয়ান স্বামী হয়ে স্ত্রী'র গামছা পরে স্নানে যাওয়ার অর্থ নিয়ে কতক্ষণ আর ভাবতে পারে? একেবারে চোখের সামনে বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে, পথটা যুবতী স্ত্রীর অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে আসার পক্ষে বেশ দীর্ঘ। বাথরুমের সামনে বীণার শুকুতে দেওয়া একমাত্র শাড়িখানা পরিচ্ছদ না হয়ে পর্দা হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আর প্রতিদিন এক ছুটে ঘরে আসা বীণা, আপাতত ঘরে মানে আড়ালে আসার তাড়নায় ভুলেই যায়, দড়ি থেকে শাড়িখানা টেনে আনতে হবে। মনে যখন পড়ে, তখন শাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে আসা হয়ে যায়, যে দৃশ্যে শাড়ি আর পর্দা থাকে না, খোলা রাস্তাটা হাঁ করে ওকে গেলে যেন। উত্তেজিত নাটক-চরিত্র অমোঘ বাক্যটি বলে যাওয়ার আগে উইংস-এর পাশে সরে আসে, ঠিক বলার মুহূর্তে আবার মাঝ-মঞ্চে। বীণা আবার ফেরে, এবং একটা হ্যাঁচকা

টানে দশ হাতি শাড়িখানা নিয়ে দারুন বেগে ঘরে ঢুকে পড়ে। লজ্জা যত না বীণার, তার চেয়ে অনেক বেশি অমিয়র। এ কথাটা যে বীণা বোঝে না তা নয়। তবে প্রকাশ করে না। তাতে অমিয়র সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বীণা আসলে অমিয়র লজ্জা, মোট কথা দুঃখ বোঝেই না। বুঝলেও আমল দেয় না। অমিয়র দিক থেকে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। আর বীণারও সুযোগ নেই অমিয়র সঙ্গে এই উলঙ্গ দারিদ্র্যের লজ্জা-দুঃখ নিয়ে প্রস্থে প্রস্থে আলোচনায় বসবার। বীণাকে পাহারা দেওয়ার পয়লা নম্বর অসুবিধেটা অমিয় কখনও মুখ ফুটে বলে না বীণাকে। কেন না, তা বীণার জানা। গামছা গায়ে জড়িয়ে স্নান সেরে স্নানের ঘর থেকে বেরোতে হয় ওই গামছা গায়েই। ঠিক কখন বেরোবে সেকেণ্ড গুণে তা তো আর বলা যায় না। তবু ওই গোটা কয়েক মুহূর্ত, এক রত্তি সময়, বাথরুম থেকে বেরিয়ে দড়ির শাড়ি টেনে ঘরে ঢোকা পর্যন্ত, পাহারার মৌল সময় ওইটুকু। লক্ষ্য-ও ওইটুকু। লজ্জা বা ভয়, দুটোই বীণার তরফে, ওইটুকুই। কেন না, পথের লোকজন এভাবে এক রমণীকে দেখে ফেলবে, স্বামী হিসেবে অমিয়র, ভদ্র স্ত্রী হিসেবে বীণার—কারো মনঃপূত নয়। তবু অমিয়র দাঁড়ানো হয় না। বীণার নির্দেশটুকুই সার। অসারও। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যে বারান্দায় অমিয়কে দাঁড়াতে হবে, তা-ও রাস্তামুখী। অমিয় ওভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। 'কেউ না এসে পড়ে' এই ভয়ে এক-আধ মিনিট যখন দাঁড়ায়, তখন বহিরাগতের ভয়ের সঙ্গে কাপড়ের অভাবে বীণাকে এভাবে স্নানে পাঠানো এবং যে কাপড় দিতে পারে, তারই প্রহরী হয়ে দাঁড়ানো—এত বড় লজ্জা—! অমিয় ঘরে ঢুকে পড়ে। বাইরে থেকে কেউ এখন মাঠে এসে দাঁড়ালে তা হবে বীণার নিদারুণ লজ্জা, কেন না ও রমণী। অমিয়র অশেষ অপমান, কেন না ও দুঃসহ দেনাদার। অসংখ্য, সংখ্যায় তারা তিরিশের মতো—হিসেব করার সময় মাথা ঝাঁকিয়ে নেয় অমিয়। আসলে হিসেবে বসা চলে না। অমিয়র অন্তরের দুঃখ ভয়াবহ কারণের কোপে বীণার কাছে আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা গেল না। কোনোদিন সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। আপাতত যে কারণে খোলা রাস্তার দিকে মুখ করে অমিয়, কিম্বা রাস্তা থেকে সরাসরি দ্রষ্টব্য অমিয় স্ত্রীকে পাহারা দেবার জন্য সময় দিতে পারে না তা খুবই স্পষ্ট। এ ব্যাপারে বীণা ওর ভরসা। 'বাড়িতে নেই তো! সেই সকালে বেরিয়েছে—ফিরতে অনেক রাত্তির হবে বলে গ্যাছে।' ঘরের মধ্যে বীণার স্বামী অমিয় ততক্ষণই পা দোলায় যতক্ষণ ও পক্ষের কথা না শোনা

যায়। 'বলে দেবেন—দেখা হলে টুঁটি চেপে ধরবো—হারামের টাকা নয় যে ছেড়ে দেবো।' বীণা বলিয়ে লোকটির দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না, লোকটি ওই কথা বলে চলে যাবার পর বীণা ঘরে ঢুকলে অমিয়-ও পারে না বেশ কিছুক্ষণ বীণার দিক তাকাতে। বীণা এমন একটি ভঙ্গী করে যেন ও একটা অন্যায় কাজ করে এল। স্বামী কৈফিয়ত চাইলে দিয়ে ফেলবে। অমিয়র প্রতিবারই ভয়, কোনো প্রশ্ন করে বীণা ওকে না অস্বস্তিতে ফেলে। মুখ থেকে কটু কথা সরে না। দারুন মিহি গলায় বীণা লক্ষ্মীর পট সাজাতে সাজাতে বলে, 'কি জানি—কপালে কি আছে? এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে নাকি!' কাকে, অমিয়কে না নিজেকে বলল তা স্পষ্ট না হলেও ওই কথাই তখনকার মতো অমিয়র মুক্তি। ও শ্বাস টানে। বীণা পেছন ফিরে ওকে একবার দেখে নেয়। সম্ভবত- নিশ্বাসের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে। স্তব্ধ বীণা অমিয়র ভীতি, অস্বস্তি এবং আতঙ্ক। লজ্জা ও দুঃখ-ও বটে। এতগুলো প্রহারে বিবস্ত্র অমিয় এমনভাবে হেসে ফেলে, যা শব্দ না হয়েও অবস্থার সুবাদে সশব্দ।

বীণার শাড়ি মাত্র একখানায় ঠেকেছে, এই অবিশ্বাস্য তথ্য অমিয়র কাছে অনেকদিনই অগ্রাহ্য ছিল। কারণ, ওর বিগতা জননী কোনোদিন এক শাড়িতে দিনযাপন করেনি। বাসি কাপড় ধুয়ে দড়িতে মেলে গামছা পরে তাকে লক্ষ্মীর পট সাজাতে হয় নি, অথবা বাবাকে পাহারা রেখে স্নান ঘরে ঢুকতে হয় নি খোলা রাস্তা এবং পথচারীর ভয়ে। বাড়ির সামনে রাস্তা থাকা অসম্ভব কিছু নয়। সেখানে লোকজন হাঁটা-চলা করবে তাও প্রথামাফিক। শুধু বীণার এই আচরণ বেশ কিছুকাল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঠেকেছে অমিয়র কাছে। নারী মাত্রেই কম বেশি গোছানো প্রকৃতির—অর্থাৎ, এইভাবে অমিয়কে বাধ্য করার কৌশল যেন সে অচিরাৎ বীণার শাড়ি কিনে আনে। যেমন করে হোক সে ধারণায় ঘুণ ধরেছে। এখন অমিয়র মনে বীণার একখানা মাত্র শাড়ি থাকা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি, বীণা অত্যন্ত দরিদ্র, অমিয়র তুলনায় অনেক বেশি দীন। তবু করার কিছু নেই। পাওনা-দাররা বাড়িতে ঢুকে চেঁচামেচি করার সময় বীণাকে যে শাড়িখানা পরে থাকতে দেখে, দেখতে দেখতে তা-ও অভ্যস্ত আর পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু তারা তো আর মহিলার পরণে কি রং-এর শাড়ি তা দেখতে আসে না। আসে অমিয়র খোঁজে। টাকা আদায় করতে। চার বছরে কমপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ জনের

কাছ থেকে টাকা ধার করে এক পয়সাও এখন অবধি শোধ না করতে পারার কারণ বীণা জানে। মর্মে মর্মে জানে অমিয় নিজে। চাকরি না থাকলে, না পেলে, বছরের পর বছর কর্মক্ষেত্রটি বন্ধ হয়ে থাকলে অমিয়র কিছু করার নেই। বাড়ি একখানা আছে, পৈতৃক। যে বাড়িতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে অমিয়। ন্যূনপক্ষে কিছু না কিছু আহারও করে, নইলে বেঁচে থাকা, বিশেষ করে পাওনাদারের ভয়ে পালিয়ে বেঁচে থাকা তো সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য। এই আকালের বাজারে ঘাপটি মেরে থাকাও খালি পেটে সম্ভব নয়।

বীণা ছাড়া আর কেউ না জানলেও অমিয় ঘরেই থাকে। ক্বচিৎ কখনও অবশ্য থাকে না। সকলেই ওর দেনাদায়ের খবর রাখে এমন নয়। সকলেই নিষ্ঠুর এমন-ও নয়। মানুষ তো অনেক। যারা রাখে না, যারা নিষ্ঠুর নয়, তাদের দ্বারস্থ হয়ে হাত পাতার পরিকল্পনা অমিয়কে করতে হয় ভীষণ সন্তর্পণে। ওকে বেরোতে হয় চৈতন্য ও দৈব এই দুই অবস্থাকে মনে রেখে। কোনো পাওনাদার যদি ঘুণাক্ষরেও ওর পদযাত্রার সংবাদ পায় বা দৈবাৎ সাক্ষাত হয়ে যায় তবে—অমিয় সে লাঞ্ছনার কথা ভাবতে পারে না। তবু এরকম যে ঘটেনি তা নয়। একাধিকবার। প্রতিবারই রেহাই পেয়েছে অমিয়। অবশ্য সব কৃতিত্বই অমিয়র। এক সেকেণ্ড আগেও যা ভাবে নি, তেমন সব কুশলী বাক্য মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। পাওনাদারের চেঁচামেচিতে জড় হওয়া অতি উৎসুক লোক-জনকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পেরেছে ও জেনুইন, অসৎ নয়। দায়ে পড়ে এমন দশা। আর যে পায়, সে যে একেবারে অমানুষ নয় তা লোকসমক্ষে প্রমাণ করার জন্য একটা সীমা অবধি নির্মম হয়, ডেট আদায় করে অমিয়র কাছ থেকে। অমিয় ডেট দিয়ে ফেলে, যে তারিখটি কোনোক্রমেই দেনা শোধের তারিখ হতে পারবে না, তথাপি আপাতত নতুন অন্বেষণের পথটাকে মুক্ত করে নেওয়া।

বাইরের হাঁকডাকের যাবতীয় জবাব দিতে দিতে বীণা এখন বেশ পটু। কখনও কুৎসিত, আবার কখনও হাড়পোড়ানি মোলায়েম বাক্যগুলোর কোনো জবাব হয় না। ও চুপ করে থাকে। অসহ্য লাগলে বলে ফেলে, 'কি বলব বলুন—ও যে বাইরে এত ধার করে তা আমি জানি-ই না।' বীণার এই কৃতঘ্নতায় ঘরের ভেতর দেয়াল ঠেসে থাকা অমিয় কেঁপে ওঠে, ইচ্ছে করে পাওনাদারের সামনে একবার ভজিয়ে নেয়, কথাটা কত বড় মিথ্যে। তারপর অবস্থার একটু পতন ঘটলে বীণাকে খুবই বুদ্ধিমতী এবং স্বামীর বিপদ সম্পর্কে

সজাগ মনে হতে শুরু করে। তবু দু-একবার জিজ্ঞেসও করেছে, 'আমি কেন ধার করি তা তুমি জান না বীণা ?' বীণা চুপ করে থেকে হয়তো বোঝাতে চায়, এসব না বলে উপায় কি ?

পাওনাদারের তাগাদায় আসা সময় ও নির্ঘণ্টতে বাধা থাকতে পারে না। বিশেষ করে যে লোকটি টাকা নিয়ে ফেরত দেয় না, দিতে আগ্রহী নয় অথবা অক্ষম—যদিও অক্ষমতার বিবেচনা খুব কম পাওনাদারকেই বিচলিত করে—তাকে হাতে নাতে ধরা একরকমের সুখ। টাকা পাওয়া গেল কি না গেল। সবল পক্ষ মনস্তাত্ত্বিক হয়ে উঠবে, উপযুক্ত সময় বাছবে—কেন না, তার পক্ষে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ সহ্য করা সদা দুরূহ। সে বেমক্কা হাজির হয়। চুপি চুপি—পা টিপে টিপে আসে, ছোট মাঠ আর পাতকুয়ার মাঝামাঝি জায়গায়, যেখানে রোদ আর জ্যোৎস্না দুই-ই বেশি, সেখানে দাঁড়িয়ে ডাইনের ঘরে আড়চোখে দেখে। 'অমিয় বাবু—অমিয়'—হাঁক ছাড়ে ঠিক তখনই, যখন সবেমাত্র দরমার দরজা পা দিয়ে ফাঁক করে বাথরুম থেকে বেরোয় বীণা। ডাক আর বেরনো দুই দিকের দুই কাণ্ড এমন একটা মাপা সময় হয়ে যায়, বীণা ফিরতে পারে না। আগন্তুকের পক্ষে ডাক ফেরানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। বিমূঢ়া বীণা দু-সেকেণ্ডের মধ্যে শুকুতে দেওয়া শাড়ির সামনে ভীষণ বেগে এসে যায়। বাইরের কোনো পুরুষ ওর এই ভরা দেহ দেখে ফেলবে, স্বামী দেনাগ্রস্ত না হলে তার একটা ক্ষমা ছিল। গামছায় জড়ানো অতি সহজে ভাঁজ-নিভাঁজ দ্রষ্টব্য বাণাও এবার ডুবল। স্বামীর এই দুর্দশা ওর গরিমাকে যে একটুও ম্লান করে নি, একটা দুর্ঘটনা মাত্র। অমিয়র কর্মস্থলে তালা পড়ার ফল, এই বিশ্বাস বুঝি একেবারে চুর-চুর হয়ে গেল। বীণা কাঁপছে। এক আঙুলের শাঁখার আংটি ইতিমধ্যে শিথিল হয়ে এসেছে। ওই শৈথিল্য ওর রোগা হওয়ার লক্ষণ, এখন ভিন্ন অর্থ। স্নানঘর থেকে বেরিয়েই যখন পড়েছে, নিরুপায়। শাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে বলে ফেলে, "বাড়িতে নেই।"

'কোথায় গ্যাছে—?' প্রশ্ন।

'বলে যায় নি কিছু।' উত্তর।

'তা বললে তো হবে না। আর কতদিন ঘুরব ?' আবার প্রশ্ন।

বীণা চুপ। শুকুতে দেওয়া দু ফাত্তা শাড়িখানা মোটা পর্দার মতো ওর অর্ধ-উলঙ্গ দেহ ও দুর্দশাকে আগন্তুকের আড়াল করে রাখলেও বিশ্বাস হয়

না বীণার। মনে হচ্ছে, সামান্য কাছে দাঁড়ানো ওই পাওনাদার লোকটা ওর বর্তমান শরীর দেখে ফেলেছে বা দেখছে। অগত্যা আড়ালের বীণা বুকের গামছা বাঁ কাঁধে টেনে নেয়, একদিকে বেশি টান পড়ার ফলে অন্যদিকে অভাব ঘটে।

'কি হল—চুপ করে আছেন যে?' আবার।

তবু বীণা চুপ। লোকটা যদি অন্তত দু মিনিটের জন্য একটু সরে যেত—কাপড়টা পরার সময় দিত বীণাকে—তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি সহজই না হতে পারত।

'আপনি অমিয়র কে হন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। কতক্ষণ আর এড়িয়ে যাওয়া চলে! তৈরী হয় বীণা। জবাব দেয়, 'আমি এ বাড়িতে কাজ করি।'

'ওরে বাবা! ফাঁট তো আছে ষোলো আনা। ধার শোধ করতে পারে না—চারশো বিশ আবার ঝি রাখে ঘরে!'

যাক। বিশ্বাস করেছে। নিশ্চিন্ত বীণা আড়ালে নিশ্বাস টেনে নেয় তাড়াতাড়ি।

'তোমার মাইনে-পত্তর দেয় তো?'

আপনি থেকে তুমি। মাইনে-পত্তর। বীণার বেশ খসে পড়ার উপক্রম। দড়ির শাড়িখানা হাওয়ার দমকে উল্টে যাওয়ার দশা।

'যাক গে—সে সবে আমার কাজ নেই—আমার টাকা চাই। সাতদিনের মধ্যে না পেলে ফল খুব মারাত্মক হবে বলে দেবে। এই চিঠিখানা দিয়ে দিও ওকে।'

চিঠি! অর্থাৎ লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এখন?

সব সংকট কাটিয়ে উঠল। এখন? তা-ও মোচন হল।

'ওইখানে রেখে যান—নিয়ে নোবো।'

চিঠি রেখে চলে গেল লোকটি।

শাড়ির কালো পাড়ের কিনার ঘেঁষে উঁকি মেরে লোকটার চলে যাওয়া দেখতে পেতেই ক্ষিপ্র হল বীণা। ওই গামছা পরা অবস্থায়ই ছুটে এল ঘরে। মাথা নিচু করে বসে থাকা নিস্তেজ অমিয় একবার মাত্র চমকে উঠল। নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকে এলোপাথাড়ি চড় কিল ঘুঁষি মেরে গেল বীণা। ঠিক নিঃশব্দে নয়। বীণা কাঁপছিল। নিশ্বাস নিচ্ছিল জোরে জোরে। আচমকা আক্রান্ত

হয়ে, তা-ও বীণার দ্বারা, অমিয় আত্মরক্ষার চেষ্টা তো করলই না, দেহের সর্বত্র অবিশ্রান্ত আঘাত অনায়াসে সহ্য করে গেল। পায়রা ডাকার মতো কি সব বলে যাচ্ছে বীণা। পরিশ্রান্ত বীণার বুকের গামছা পড়ে গেল মেঝেয়। এবং ও থামল।

অমিয়র চোখ দুটি ইতিমধ্যে লাল হয়ে উঠেছে। আকস্মিক ঝড়ের কোপ থেকে অবশেষে রক্ষা পাবার ফল। তারপর অবান্তর ও বিবর্ণ চোখে বীণার দিকে চেয়ে রইল। বীণা ঘুরে দাঁড়াল, আবার ফিরে অমনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করেও পেরে উঠল না। দুজনের এই চাহনির অর্থ এ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে কখনোই করা যেত না।

একটু পরে ক্লান্ত অমিয় অগোছাল হেঁটে বাইরের দড়ি থেকে শুকুতে দেওয়া বীণার শাড়িখানা তুলে এনে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলার পর 'এভাবে কি মানুষ বাঁচে—' ছাড়া বীণার বোধহয় বলার কিছু ছিল না। এই উক্তিকে অসম্ভব সরস মনে হওয়া সত্ত্বেও আচরণে হেরফের হল না। টুলের সমান্তরাল হাঁটু দু'খানা দুলতে লাগল অমিয়র। তারপর জানালা থেকে রাস্তায় উঁকি মেরে নির্ভীক হওয়ার চেষ্টা করল।

ভারতবর্ষ

রত্নেশ্বর বর্মণ

যত দূরেই চোখ যায় শুধু আকাশ। এ তল্লাট ও তল্লাট জুড়ে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে আকাশটা। টগবগ করে ফোটা আগুনের হাওয়ায় ঝলসে ঝলসে ঘন নীল আকাশ তামাটে। আকাশটা মরা মাছের চোখের মতো নির্বিকার স্বচ্ছ, নিমেষহীন নিষ্ঠুর। এক ফোঁটা বাষ্প নেই, এক টুকরো মেঘ নেই—পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে ক্ষেপা হাওয়ায় সাথে উড়ে আসা সাদা মেঘও নেই ছিটে ফোঁটা। আকাশের এ মাথাটা সমুখে এবং ওকোণটা পেছনে অনেক দূরে গিয়ে মাঠে মিশেছে। এক পাখিওয়ালা যেন পাখি ধরার ফাঁদ পেতেছে চরাচর জুড়ে।

নদীর নাম সরযূ। নদী নামেই বটে। এপার ওপার বালির ঢেউ সোনালী রঙের। অনেকদিন জল ছিল অশ্রুজলের মতো শীর্ণরেখায় তারপর বালি ছেটে ছেটে জল পাওয়া যেত গরু মোষের জন্য। এখন তাও ধূ ধূ শুখনো। শুধু বালি আর বালি—সোনালী রঙের বালিতে কাঁপন লাগে হাওয়ায় হাওয়ায়।

পাহাড়ের নাম নেই। বস্তির পাশে চুপচাপ ঝিমানো পোষা মোষের মতো। গাছ গাছালি ছিল, পাখি পাখালি ছিল। ক্রমশ সব উজাড়—কেটে কেটে উজাড়। এখন কিছু শিশু শালের নেড়া গোড়া, দু-একটা বিবর্ণ ঝোপঝাড়। এককালে বন ছিল, জঙ্গল ছিল গহন—বাঘ ভালুক হায়না ছিল। এখন শুধু বিরাট বিরাট পাথরের চাং ছড়ানো ছিটানো।

চাষের মাঠ উঁচুতে নিচুতে কাটা কুমড়োর মতো ফাল ফাল করা। লাল মাটি এয়োতি বধূর কপালের গোলা সিঁদুরের মতো দগদগে। চারাও উঠেছিল কোনোকালে, এক হাত, দপ করে। প্রথমে পাতায় হলদে ছিটে দাগ। ক্রমশ হলদে হয়ে হয়ে শেষে চোখের সামনে শুকিয়ে খড় হয়ে গেল। সব শুকিয়ে গেল—দুরন্ত গমের চারারা, সবুজ পুদিনার ক্ষেত।

তপ্ত তাওয়ার মতো তাতা তামাভ আকাশের তলায় চাপা পড়া, প্রায় বিলুপ্ত

বন-বাদাড়, রিক্ত নদী ও শুষ্ক নদীর আঁচলে বাঁধা একটা নিরানন্দ গ্রাম—গ্রামের নাম ধনুয়া। চার-পাঁচ ঘরের বস্তি খাপরা ছাওয়া—তাল তাল মাটি দিয়ে তৈরি দেওয়াল, কয়েকটা শিশু আমের চারা। এই নিয়ে গ্রাম। কয় ঘর বাসিন্দা সব ভূমিহার।

প্রাচীন রামধারি—বয়স একশ বছর। সকালে খাটিয়ায় বসে রামায়ণ পড়ছিল। বন্দৌ রামনাম রঘুবরকে, হেতু কৃশানু ভানু হিম করকে। বিধি হরিহর ম্যয় বেদ প্রাণসো, অগুন অনুপম গুননিধান সো॥ কিন্তু রামায়ণ পড়তেও ভালো লাগছিল না। জয় রামজীকি। হতাশভাবে দেখছিল—সামনের মাঠ পাহাড় আর বনভূমির অবশেষের দিকে। বিড়বিড় করে বকছিল। আকাশে মেঘ নেই। তবু মনে হয় পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বুঝি একটা মোষের রঙের গর্ভবতী মেঘ। খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখে। দৃষ্টি খানিকদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে। তারপর ডাকে—দুখন, আকাশমে ঘটা ঘেরলে বা কা। হায়, বুড়ো মেঘ খুঁজে পায় না, শুধু নির্মম সূর্য। ঘরে ঘঁউ নেই, চানা নেই, চাওল নেই। চোখে ঘুম নেই। কূয়োর জল তলানিতে পড়ে গেছে। পাশের খাটিয়ায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে দুখন। পেটানো লোহার মতো সুঠাম শরীর। নিঃশ্বাসের ওঠানামায় বিরাট দেহটা কাঁপছে। বুড়ো বটের মতো রামধারির বয়েস হয়েছে। কবে হুট করে মরে যাবে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেকে জাগিয়ে এই সকাল বেলা পৃথিবীটা চিনিয়ে দেয়। মায়া হল, তাই ডাকল না।

এখন আর মুখিয়া আসে না, অনেকদিন আসে না মুখিয়া নওলকিশোর। দুখনের জরুর হাতের রুপোর খাড়ু জোড়া কিনে নেওয়ার পরে আর এদিকপানে আসে নি। কোমরের সাথে বাঁধা টাকার থলেটায় একরাশ দোমড়ানো নোট। মুখিয়া আঙুলে থু থু লাগিয়ে টাকা গুনে বলে—এই লে গান্ধী মহরাজকী রূপায়া। দুখনের বৌ লখিয়া জেয়রের শোকে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে। মুখিয়ার হাতের থলেতে ঝন ঝন রূপোর গহনা বাজে। মুখিয়া খাটিয়ায় বসে দুনিয়ার খবর শোনায়। খবর দেয়, ইলেকট্রিক এসে গেছে হাঁসুয়া তক, সেখানে অঢেল আলো। রামধারি পায়ের তলায় বসে খইনি বানায়, গল্প শোনে এবং সামনে সব অন্ধকার দেখে। মুখিয়া মাথার পাগড়ি সেঁটে বাঁধে, চাঁদির গহনার থলে ঘোড়ায় ঝুলিয়ে উধাও হয়ে যায় গান্ধী মহারাজের ছবির ছাপ দেওয়া নোটের বিনিময়ে আরও সোনা চাঁদি কিনতে।

বস্তির ওমাথায় কে আবার গানের মতো সুর করে কাঁদে। রাম নাম সত্য হ্যয়, রাম নাম সত্য হ্যয়। লখিয়াকে লড়কী মর গৈল, লখনাকে লড়কা মর গৈল। সব মর যাতা। সব মরে গেল। কে যেন শোকে বুক চাপড়ায়—হাই বাপ সব খতম হো গৈল। তারপর মৌমাছির শব্দের মতো কান্না, এদিকে ওদিকে সব দিকে। রামধারি হাত দিয়ে কান দুটো ঢাকা দেয়। কিন্তু ওর মাথার কোষে কোষে যেন সেই কান্না গুন গুন করে মাছির মতো বিরক্ত করে।

দাঁড়িয়ে থাকা জোয়ান মোষটা সটান শুয়ে পড়ে। হাত পা ছড়িয়ে দাপায় কয়েক মুহূর্ত, তারপর স্থির নিশ্চল। পলকহীন চোখে কয়েক ফোঁটা জল গড়ায়। দূর গাঁও থেকে মুচিরা আসে। ছুরিতে শান দেয়, মাজা ছুরি রূপোর মতো ঝক ঝক করে। রামধারি ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পারে না। কি ভাবে ছুরি দিয়ে চামড়া ছাড়াচ্ছে। ওর বুকের মধ্যে ছ্যাঁকা লাগে। দুখিয়া টাকা গুনে বুঝে নেয়, মড়া মোষের চামড়া নিয়ে দর কষাকষি করে। চামড়ার টাকায় ওর চোখে লোভ জ্বলে। টাকা মানে পরমায়ু। সামনে দুর্দিন। না খেতে না খেতে সব শেষ হয়ে যাবে। জ্যান্ত মোষ কেনার খরিদ্দার নাই। বস্তি উজাড় করে লোক পালাচ্ছে। কূয়ো থেকে কাদা উঠছে। বালি উঠছে। দিনের আলোতে ও যেন একটা ভীষণ চতুর ভালুক, ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। রামধারি আর ভাবতে পারে না। পা মাতালের মতো টলছে। একটা আশঙ্কা শিরদাঁড়া থেকে শির শির করে নেমে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। গাছ কাটার আওয়াজ আসছে। বিরাট পিপুল গাছ, বস্তির পুরনো গাছ। কুড়োলের ঘায়ে গাছটার রস গড়াচ্ছে। কুড়োলের প্রত্যেকটা আঘাত যেন বিঁধছে রামধারির বুকে পাঁজরায় অসহ্য যন্ত্রণায়। গাছের উপরে মহাবীরজীর ধ্বজা ভয়ে কাঁপছে। বুড়ো টলতে টলতে ছুটে চলল। কুড়োলের শব্দগুলো নীলামের ঢোলকের শব্দের মতো। সমস্ত পাহাড়তলী গম গম করছে—নীলাম, নীলাম।

রামধারি শুয়ে পড়ল। তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ওর কানের কাছে ট্রানজিস্টারের শব্দ বাজছিল—নওলকিশোর মুখিয়ার ছেলের ট্রানজিস্টার। বঙ্গোপসাগরের মেঘ বঙ্গাল হয়ে এদিকে আসছে। মেঘ আসছে, মেঘ আসছে! জয় রামজীকি। কোথাও মেঘ নেই। গত বছরের খরা, এবারের বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল আষাঢ়ও যাচ্ছে গুটি গুটি পায়ে। জল নাই। চামড়া ছাড়ানো

মোষের মাংস, লখনের ছেলের মাংস নিয়ে শকুনরা সশব্দে কাড়াকাড়ি করছে। ট্রানজিস্টারের দৈববাণীতে আর বিশ্বাস নাই। বঙ্গাল থেকে মেঘেরা আসছে, আবার ফসল হাসবে। সব ঝুট বাত। হাঁদুয়া তক ইলেকট্রিক এসে গেছে, এদিকে যে নিশ্চিত অন্ধকার। এখন নওলকিশোরের লড়কাও আসে না। ফিনফিনে ধুতি আর টেরিলিনের শার্ট পরা ছেলেটা চকচকে জুতোর পদচিহ্ন রেখে গেছে বালির উপরে। একরাতে ভরতের জোয়ান বৌটা উধাও হয়ে গেল। সেই কবে লখন ওয়াজিরগঞ্জ গেছে সরকারী গঁউর খোঁজে, আর ফেরে নি। তিনটে বাচ্চা নিয়ে অনাহারী বৌটা ঘরে কুঁই কুঁই করে কাঁদছে।

দুখিয়া সারা রাত মেঘেদের স্বপ্ন দেখে। অসংখ্য কালো মেঘ আকাশে ছুটোপাটি করছে। অজস্র জল ঝরছে অবিরল। দুখিয়া উত্তেজনায় চেঁচামিচি করে। অন্ধকার খাটিয়ায় বসে রামধারি আকাশের তারা গোনে। ক্যা সপ্‌না দেখ্‌তারে ববুয়া। ক্যা সপ্‌না দেখতারে। জোয়ান ছেলে স্বপ্ন দেখবেই। রামধারি ছেলের দেহ ধরে নাড়া দেয়।

সংবাদটা আর্তনাদের মতো বাজল। ইনারকে পানি শুখ গৈল। কূয়োর জল শুকিয়ে গেছে। দুনিয়া সব শুখ গৈল। এ তল্লাটে আর জল নেই এক ফোঁটাও। সমস্ত দুনিয়া শুকিয়ে গেছে। বস্তির সব লোক এসে ভিড় জমাল। শূন্যদৃষ্টিতে শুখনো কূয়োর দিকে তাকিয়ে হতাশায় সবাই মাটিতে বসে পড়ল। রামধারি উদাস দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। বাতাসের মধ্য থেকে।

এদিকের এমনি আরও অসংখ্য গ্রামের মতো ধনুয়াও জনশূন্য হয়ে গেল। একে একে সব ঘর ছেড়ে বের হল। সর্বপ্রথমে রামধারি। দুখন, ভরত, শিউন বের হল। তারপর মেয়েরা সব—তিনটে যুবতী বৌ, একটা বুড়ি, এক গাদা শিশু। সবার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। জানে না কোনদিকে যাবে, কোথায় যাবে। সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে অন্ধকার, উপরে নিচে সমান অন্ধকার। তবু একসময় ওরা সামনের দিকে পা বাড়াল। একদল মেয়ে পুরুষ শিশু, সঙ্গে পুঁটলিপাটলি, ঢোলক, দুটি শিশু মোষ। একটি কিশোরের হাতে একটা চৌকো লণ্ঠন। মেয়েরা কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছছিল। সেই গভীর অন্ধকারে লণ্ঠনটা একটা তারার মতো মিটমিট করে জ্বলছিল। একটা থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে রামধারি রামায়ণ গাইছিল—সজি বন সাজ সমাজ সব, বনিতা বন্ধু

সমেত। বন্দৌ বিপ্র গুরুচরণ 'প্রভু, চলে করি সবহি অচেত। হায়, সব বনবাসী হয়ে ঘর ছাড়ছে। অযোধ্যার প্রজাদের মতো বুঝি মাঠ পাহাড় নদী কাঁদছে। অন্ধকারে সুরেলা কণ্ঠ কাঁপছিল। গান শেষ হয়ে গেলে আর কোনো শব্দ নাই। শুধু পথ চলার পায়ের শব্দ ছাড়া। ওরা চলছিল চড়াই উতরাই পেরিয়ে। কখনো বন্ধ্যা চাষের মাঠ, কখনো নিঃশেষিত বনভূমি পায়ে পায়ে পার হচ্ছিল। কিশোরের হাতে লণ্ঠনের আলোক-শিখা দুলছিল। কেউ কোনো কথা বলছিল না।

চলতে চলতে একটা গ্রামের নিশানা পেল। শাল গাছের ছায়ায় তিন-চারটে ঘর গায়ে গায়ে লাগোয়া। রাত কত কেউ জানে না। সবাই থমকে দাঁড়াল যদি এক ফোঁটা জল গলায় দিতে পারে। যদি একলোটা জল দয়া করে দেয় বস্তির লোকেরা। দুখন চওড়া গলায় চেঁচিয়ে ডাকল—এ গাঁওমে কেহু বা হো? এ গ্রামে কে আছে? আশার ঔজ্জ্বল্যে সবাই জ্বলছিল। কিন্তু ওদিকের কোনো সাড়া নাই। মনুষ্য পরিত্যক্ত গ্রাম সীমাহীন অন্ধকারে বোবা দাঁড়িয়ে রইল। দুখন হতাশ হয়ে নিজে নিজেই বলল—না, কেহু নেইখে। না, কেউ নেই।

ওদের শরীরের শেষ শক্তিবিন্দুটাও কে যেন নিংড়ে নিয়ে গেছে। লণ্ঠনটাকে মাঝে রেখে সবাই বসে পড়ল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। আবছা আলোতে সবার কপাল চকচক করছিল। কুঞ্চিত কপালের রেখা এবং অসহায় চোখগুলো দেখা যাচ্ছিল। আকাশে লক্ষ তারা। নির্জন অঞ্চলটাকে তখন একটা বায়ুহীন বাকসের মতো মনে হচ্ছিল। ওরা নিঃশব্দে নেংটি ইঁদুরের মতো হাঁপাচ্ছিল দাপাচ্ছিল। এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে শিশুরা তৃষ্ণায় কান্না সুরু করে দিল। অনাহারী মা বার বার শুষ্ক স্তন টেনে নিল। শিশুরা হাত পা দাপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এক সময় আবার সবাই উঠে দাঁড়াল। আবার যন্ত্রের মতো চলা সুরু হল। সবার আগে লণ্ঠন হাতে কিশোর। তারপর মেয়েরা, ছোট শিশুরা কোলের মধ্যে, তার চেয়ে বড় যারা পাশে পাশে। সব শেষে ভরত, দুখন, তারও পেছনে রামধারি লাঠি ভর করে চলছে।

যেন ওরা কতদিন পায়ে হেঁটে চলেছে। লক্ষ বছর অজস্র মানুষ এমনি নিঃস্ব হয়ে পথে হাঁটছে। সবাই ঝিমুচ্ছে, চলছে। লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে গিয়ে পলতে পুড়তে লাগল। লণ্ঠন আস্তে আস্তে নিভে গেল। অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। একদল মানুষ চলছে, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা।

চলছে। পায়ে হাঁটা শিশুরা আর চলতে পারছিল না। তাই পুরুষরা বুকে তুলে নিয়েছে। মানুষ চলছে, মোষগুলো চলছে এক নিঃশব্দ ঐক্যতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। রামধারির চোখের জল ঝরছে। হায়, চোখের জলেও যদি শিশুদের তৃষ্ণা মেটানো যেত। রামধারির মনে হল সে মরে যাচ্ছে। এত ঢল, আকাল, মারী মড়ক দেখা মানুষটা মরে যাচ্ছে। ও মরে গেলে আকাশ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরবে। পায়ে পায়ে চোট খাচ্ছে, রক্ত ঝরছে। কোথা দিয়ে পায়ে চলার পথ, পথের চিহ্ন ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু থমকে দাঁড়ানোর উপায় নাই—চলছে, চলছে। সুমুখ দিয়ে এগিয়ে চলছে।

কিন্তু এক জায়গায় এসে সব স্থির হয়ে গেল। না, আর এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। সামনে একটা দেওয়াল যেন খাড়া হয়ে রয়েছে। ডান দিকে ঘুরে এগিয়ে যেতে চাইল—সেখানেও বাধা। বাম দিকে খানিকটা এগিয়ে আটকা পড়ে গেল। একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় যেন ফাঁদের মধ্যে ওদের আটকে ফেলেছে। পেছনে ফেরার উপায় নাই। কাঁটা ঝোপঝাড়ে ওরা প্রতিমুহূর্ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

দুখনের গলা শোনা গেল—হমনিকা রাস্তা ভূতলা গৈল বানি সন। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।

শিশুদের কণ্ঠে কান্নার রোল উঠল—জল চাই। মায়েদের চোখ ভেজা ভেজা—জল চাই। যুবক কিশোরদের বুকের ছাতি তৃষ্ণায় জ্বলছিল—জল চাই। কাঁটা ঝোপের মধ্যে আটকে যাওয়া নিঃশেষিত মানুষগুলো আকাশের দিকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আর্তনাদ করছিল। রামধারির চোখ দিয়ে যেন রক্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। তবু যদি যুঁই ফুলের মতো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরত। দুঃখী লোকের কান্নায় আকাশের করুণা ঝরে না। দুঃখী লোকের কান্নায় পৃথিবীর বেদনা ঝরে না। রামধারি রামচরিত মানস আওড়াচ্ছিল। বলছিল, ভগবান কা সাহারা বা। উনহিকে নাম ল। ভগবান সর্বশক্তিমান, তার নাম লও।

জোয়ান ছেলে দুখনের চোখে একটা স্থির প্রতিজ্ঞা জ্বলছে। ধ্রুবতারার মতো। দুখন ভরত এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করল। কাঁটার আঘাতে পরণের কাপড় ছিঁড়ে গেল। পাথরের আঘাতে কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ফিনকি দিয়ে। যৌবনের দর্পে ওরা বাধার পাহাড়কে ভূলুণ্ঠিত করতে চাইল। রণভঙ্গ দিল

প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য

আঁরি বারব্যুস

[ফরাসী সাহিত্যের শক্তিমান লেখক আঁরি ব্যারব্যুস জীবনকে রঙীন চশমা পরে দেখেন নি। নিজের জন্ম যে সমাজে তার আত্মাশ্রয়ী কূপ-মণ্ডূকতায় নিজেকে তিনি আটকান নি। তাঁর প্রথম জীবনের নিছক অকপট হৃদয়াবেগ তাই পরে বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতায় উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি কমিউনিজম্‌কে অঙ্গীকার করেছেন এবং পূর্ণ জীবনদর্শন হিসেবে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সর্বক্ষেত্রে—আর্টে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, সমাজবিন্যাসে—তার প্রয়োগ খুঁজেছেন। এ বিষয়ে রোলাঁর সঙ্গে তাঁর খানিকটা তুলনা টানা যায়। অবশ্য ব্যারব্যুস নব সাহিত্য সৃজনে মহৎ কোন কীর্তি রেখে গেছেন বললে ভুল হবে। তাঁর সৃজনী প্রতিভার হয় তো ততটা প্রাবল্য ছিল না, তাঁর অতিরিক্ত আবেগ হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা হয়তো সামাজিক পরিবর্তন-কাল সার্থকতার আশু সম্ভাব্যতা নিবারণ করছে। ব্যারব্যুস নীচের প্রবন্ধে সাধারণভাবে এ প্রসঙ্গের আলোচনা ও কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গতি-বদল আর প্রথম পদক্ষেপটাই লক্ষ্য করবার। ব্যারব্যুস এ দিকে দামী, আরও দামী তাঁর ভাবনা ও মানসিক উপলব্ধি। তার পরিচয় পাওয়া যাবে এ প্রবন্ধে (মূল থেকে অনূদিত)। ইয়োরোপীয়, বিশেষত ফরাসী সাহিত্যকে মনে রেখে তিনি এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন বছর ১৫ আগে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটিতে তাঁর মত খাটাতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু কতকগুলো মূল কথা এবং প্রবণতা তিনি ধরেছেন যা সব সাহিত্য সম্বন্ধেই উল্লেখ করা চলে। তাঁর মতামত সকলে মানুন আর না মানুন তা নিয়ে বিচার ও আলোচনা করবার দায়িত্ব আজ সকলের, বিশেষত তাঁর আলোচিত প্রশ্নের তাগিদ যখন আমাদের দেশেও দুর্নিবার হয়ে উঠছে।—অনুবাদক]

প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেটা অসঙ্গত নয়। এ সাহিত্যকে পৃথক করা দরকার, কিন্তু প্রথমে দরকার একে চেনা, এর সীমা নির্দেশ করা, এর স্বরূপ সঠিক নিরূপণ করা। আমরা যে যুগে

পৌঁছেছি সে হচ্ছে পরিমাপ করবার, অনুসন্ধান করবার, জঞ্জাল পরিষ্কার করে পথ ঠিক করবার যুগ।

একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক। এই সংজ্ঞার জন্যে এ যাবত অনেকেই হাত্‌ড়ে ফিরেছে। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক সাহিত্য ; যে নতুন সমাজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে সংগঠিত হচ্ছে এবং যা ধনিক সমাজের বুকের মধ্যে পুরনো ব্যবস্থার প্রান্তসীমায় নেপথ্যে জন্ম নিচ্ছে সেই সমাজকে বর্ণনা করবার জন্যে, তাকে আলোকিত ও উদ্দীপিত করবার জন্য তার সঙ্গে যে সাহিত্য নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এ সেই সাহিত্য। আমরা বলব, প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য হচ্ছে যাকে বলা হয় লোক-সাহিত্য তার বর্তমান ও জীবন্ত রূপ, যে রূপ সুনির্দিষ্ট এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও শাণিত।

কিন্তু এই ব্যাপক বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই একটা মুসকিল দেখা যেয়। সাধারণত সাহিত্যিক আন্দোলন তার পরিচয় দেয় পর পর বিভিন্ন গ্রন্থের একটা চক্রে। এখানে এমন একটা জিনিষ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যা জন্ম নিচ্ছে এবং যার কীর্তির চেয়ে বরং পূর্ব-লক্ষণগুলোই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সে সব সার্থক রচনার উপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব যা এখনও সংখ্যায় খুবই অল্প এবং বয়সেও কাঁচা। এ কথা স্পষ্ট যে, যে-নতুন সমাজ থেকে এই শিল্প আন্দোলনের উদ্ভব সেই সমাজ অস্থিমজ্জায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকার পর তবে এই আন্দোলন তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করবে, তার আগে নয়। কিন্তু তবু তার সূচনা এবং তার প্রথম বাস্তব আত্মপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তার সৃষ্টি বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড খণ্ড প্রয়াসে প্রকাশ পাচ্ছে। সে এখন সংগ্রামের অধ্যায়ে রয়েছে দুনিয়ারই মতো। উঠতি পড়তি, থামা এবং আবার চলা, লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়া আবার ঝিমিয়ে পড়া—এ নিয়ে সারা দুনিয়া এক বৈপ্লবিক বিক্ষেপের অবস্থায় আছে।

সুতরাং যে সৃজনী তৎপরতা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতেরই বস্তু তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, বিশেষত আর্টের ক্ষেত্রে। এই কারণে যারা এই বিরাট এবং এখনও পর্যন্ত অর্ধ-শৃঙ্খলিত আন্দোলনের প্রথম ফল ও গতিকে ধরেছে, যারা তার অল্পবিস্তর অনিশ্চিত প্রথম প্রকাশগুলো সংগ্রহ করেছে এবং এ পর্যন্ত তার যাত্রার অধ্যায়গুলো লক্ষ্য করেছে তারা এখনও এই শক্তির সংজ্ঞা ও শ্রেণী নির্ণয়

করতে পারে নি। মানসিক ক্ষেত্রে হলেও এ শক্তি প্রকৃতির বন্ধন-মুক্ত কোনো শক্তির সঙ্গে কম তুলনীয় নয়। আমি স্বীকার করছি যে, এ সম্বন্ধে যত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার সব আমি জানি না। আমার দিক থেকে আমি বর্তমানের কিছু চিহ্ন এবং ভবিষ্যতের নতুন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্পষ্ট কিছু ভিত্তি খুঁজবার চেষ্টা করছি।

রুশ বিপ্লব এক নতুন মানুষকে খাড়া করেছেঃ শ্রমরাজ্যের নাগরিকঃ কারখানার শ্রমিক, কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক, বুদ্ধি জগতের শ্রমিক। এই মানুষ যোদ্ধাও বটে। এ যোদ্ধাকে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে, গত যুগের সংস্কার-গুলোকে ধ্বংস করতে হবে এবং একটা সামাজিক সৌধ গড়ে তুলতে হবে, যার পরিকল্পনা ও উপাদান তার হাতে। বিপ্লব তাকে সমস্ত অংশে সৃষ্টি করেছে—তার ঈপ্সায়, তার বুদ্ধিতে, তার অনুভূতিতে, তার নৈতিকতায়। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য হল সেই শ্রমিক যোদ্ধার জিনিষ। এ সাহিত্যকে তার ছাঁচ, ভঙ্গী, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস ও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা এবং পরিশেষে তার কাজকে রূপায়িত করতে হবে। কিন্তু ওই শ্রমিক যোদ্ধা হচ্ছে একটা সমগ্রের মধ্যের চালন-চক্র। এক জীবন্ত সত্তায় সে রয়েছে প্রাণকোষের মতো, এক সমষ্টির অংশের মতো; যে জীবন্ত সত্তা বা সমষ্টি হল আন্তর্জাতিক জনগণ। এই নতুন মানুষের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণ্ডীর বাইরে তার স্ফূরণ এবং তার সামাজিক ছাঁচ। এর তাৎপর্য ব্যক্তিত্বের বিলোপ ও বিনাশ নয়। পক্ষান্তরে বিপ্লবী দেশে, সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিত্ব আরও বিকশিত হয়, কারণ যে সব সম্ভাবনা মালিক ও দাসের দেশে শোষিতদের কাছে রুদ্ধ সেই সব সম্ভাবনা প্রত্যেকের সামনে খুলে যায়। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর বিশুদ্ধ ও ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে দেখে সোভিয়েট ভূমিতে ব্যক্তিত্বের এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ কর্মে প্রত্যেকের অংশ গ্রহণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তার জন্যে এই লক্ষণ বস্তুত স্বাভাবিক। সংগঠনের দ্বারা সংহতি এবং সংহতির দ্বারা সংগঠন সৃষ্টি করে বলে সমাজতন্ত্র প্রত্যেক লোকের সমাজের মধ্যে বিকশিত হবার সর্বাধিক উপায় করে দেয়।

যে অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যকে বিবর্তিত হতে হবে তা যদি আমরা এখন আরও ভালোভাবে বিচার করতে চাই তাহলে ছাঁচ, আধার, বহিরঙ্গ সম্বন্ধে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে।

এই ছাঁচকে যতদূর সম্ভব নিখুঁত হতে হবে। পুরনো লাঙল ব্যবহার না

করে ট্রাক্টর ব্যবহার করার প্রশ্ন এখানে। অন্য যে কোন জিনিষের চেয়ে সাহিত্যের পক্ষে টেকনিকের দরকার বেশী। এমন কি যুগের পর যুগ যে বস্তু সঞ্চিত হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে ছাঁটাই করে দিলে চলে না, যেমন ঘটে থাকে ফলিত বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প উন্নয়নের পথে। অতীতের জিনিষকে জানা সব সময়ে দরকার এবং কখনও কখনও ব্যবহার করা অপরিহার্য। এ হচ্ছে আর্টের প্রগতির মার্গ। টেকনিক ও সংস্কৃতি বল্‌তে এই।

স্টাইলের প্রশ্নে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা এবং সর্বাগ্রে স্টাইল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা দরকার। আমি যদি এখানে "আধার" ও "উপজীব্য" এ দুয়ের মধ্যে বরাবরকার পার্থক্যকে জায়গা দিই তবে তা এই মার্ক্সীয় অভিমতেরই উপর জোর দেবার জন্যে যে, শরীর যেমন অঙ্গসংস্থানে ও দেহযন্ত্রের ক্রিয়ায় প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত তেমনি আধারকে উপজীব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হতে হবে। এবং এই সঙ্গে আমি এ কথাও জানাতে চাই যে, সমসাময়িক বুর্জোয়া সাহিত্যে এ আইন মানা হয় না—মানা হয় না এই অর্থে যে, আমরা অচল নৈতিক ধ্যানধারণা আর শুষ্ক শূন্যগর্ভ এক মতবাদের সঙ্গে একটা মৌলিক ও নতুন 'ফর্ম'-এর উদ্ভট পরস্পরবিরোধী জোড়াতালি দেখছি।

প্রোলেটারিয়ান লেখকদের পক্ষে সাহিত্যের বর্তমান বুর্জোয়া ধ্যানধারণা থেকে নেবার কিছু যদি না থাকে, লেখার টেকনিক সম্বন্ধে কিন্তু তা বলা চলে না। আমি এর আগে অনেকবার বলেছি ঃ সাহিত্যিক লিখন তার বিপ্লব সাধন করছে। এখন একটা নতুন প্রকরণ, প্রকাশ পদ্ধতি হয়েছে যা অসামান্য। ফরাসী সাহিত্যের মতো অতিসভ্য সাহিত্যে পনের বছর আগে যে রকম লেখা হত এবং এখন যে রকম লেখা হয় তার মধ্যে পার্থক্য এতখানি যে একটা পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই লেখার তারিখ বোঝা যায়। বাস্তবিকই একটা আধুনিক স্টাইল হয়েছে।

লিখন-পদ্ধতির রূপান্তর হয়েছে এই রকম ঃ লেখাভাষা থেকে শিথিলতা চিরাচরণ, ঘুরিয়ে কথা কওয়া (আমার বলতে লোভ হয় আগেকার ভাষার ভব্যতা) বাদ দেওয়া হয়েছে ; পুরনো অলঙ্কার কাট ছাঁট করা হয়েছে ; চিন্তা বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শব্দগুলো আরও সোজাসুজি প্রয়োগ করা হয়েছে ; যে প্রতিরূপ স্টাইলের সার তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছন্নতা, গতিবেগ, সুপরিকল্পিত সংক্ষিপ্ততা প্রবর্তন করা হয়েছে ; বরাবরকার ব্যবহৃত বাক্যাংশ ভেঙে ফেলে তাকে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং আরও তেজীয়ান করা হয়েছে। লিখন এখন আর পোষাক নয়, গায়ের চামড়া।

এই বিপ্লব ঘটছে অনেক কিছুর জন্য। সেগুলো এই : জনসাধারণের ব্যবহৃত রুক্ষ ও উজ্জ্বল কথ্য ভাষার অভাব (এ বিপ্লবের শিরায় প্রোলেটারিয়ান রক্ত আছে), মহাযুদ্ধের সময়ে ট্রেঞ্চে ব্যবহৃত slang-এর সাংঘাতিক নিরাভরণতার ধাক্কা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আচার-ব্যবহার ও মনস্তত্ত্বে একটা বৈজ্ঞানিক ধাঁচের, একটা বেপরোয়া ধরনের খানিকটা আমেরিকানিজমের অনুপ্রবেশ। এই সব প্রবণতা থেকেই মহাযুদ্ধের আগের কিউবিজ্‌ম ও ফিউচারিজম্‌-এর জন্ম হয়েছিল। পক্ষান্তরে তারা আবার বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং হাস্যকর কাণ্ড করতে থাকে। অর্থহীনভাবে তাদের বিধিবদ্ধ করা হয়, লোক-দেখানো কেরদানির উদ্দেশ্যে এবং খামখেয়ালী কেরামতির জন্যে তাদের কাজে লাগানো হয়। এ ফর্মালিজম্‌ ও ডেকাডেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তবু এ সব আন্দোলন চিরাচরিত বাক্য-বিধিতে ও নিয়ম-কানুনে এক গভীর ও চূড়ান্ত রকম ভাঙন ঘটায়।

অতএব যে স্টাইল আমাদের দরকার তা ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে। প্রোলে-টারিয়ান লেখকরা তা ব্যবহার করলে তাদের জিনিষেরই অনেকখানি আবার গ্রহণ করবে ; কারণ আর্ট ও মানসের ক্ষেত্রে সমস্ত লোক-সৃষ্টি যে অনাড়ম্বরতা ও গভীরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তারই সূত্র অনুসারে এ স্টাইল পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু এরকম একটা যন্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করতে হয় (গোর্কি সম্প্রতি লেখক-শ্রমিকের শিক্ষানবিশিকে কামার-শ্রমিকের শিক্ষানবিশির সঙ্গে তুলনা করেছেন ; তিনি ঠিকই বলেছেন)। আমরা যেন উৎকৃষ্ট ফর্মের গুরুত্বকে কম করে না দেখি এবং স্বাভাবিকতা, অসংযম ও স্থূলতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাকে শিশুসুলভ দৃষ্টি দিয়ে গুলিয়ে না ফেলি। এ ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল 'মানুষিগিরির' যে সব জটিলতা আছে, যে সব ভান আছে এবং যত বিকার আছে তা যেন আমরা পরিহার করি। নতুন ভাষা তার সজীবতা, তার পরিচ্ছন্নতা, তার তেজ এমন কি তার রূঢ়তা যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে আমরা যেন অবহিত থাকি ; কিন্তু এ ভাষা থেকে আর যা কিছু পাওয়া যেতে পারে তাও যেন আমরা পরীক্ষা করে দেখি। আমরা যেন এখন থেকে তাকে সমস্ত ফর্মুলার কড়াকড়ি থেকে মুক্ত রাখি, এমন কি ব্যক্তিগত মৌলিকতার ফর্মুলা থেকেও, যা যে-কোন লেখকের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। প্রকাশ-পদ্ধতিতে টেক্‌নিকের দিক দিয়ে, বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কাব্যের বেলায় অচল ছাঁচ ভেঙে ফেলার ব্যাপারটা বড় বেশী দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাচীন ধারা বর্জন করার প্রয়োজন

ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ছন্দ ও সঙ্গতিকে হুড়মুড় করে তার সঙ্গে ঠেলে দেওয়া ভুল হয়েছিল। এমন এক অস্ত্রোপচার হল যার ফলে কাব্যের ঘটল অঙ্গহানি। এ ক্ষেত্রে শীগগিরই হোক আর দেরীতেই হোক খানিকটা পিছনে ফিরে আসার দরকার হবে।

যাকে বলা হয় সাহিত্যিক রচনার শ্রেণী তাতে, বিশেষত উপন্যাসে ও নাটকে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের পক্ষে একটা সংশোধন আনা দরকার। আমার মতে এখানে তার খুঁজতে হবে অতীতকে, সদ্য অতীত নয়, ক্লাসিক স্থিতিশীলতা নয়, যা নিঃস্ব ও অবাস্তব হয়ে পড়েছিল ; তার খুঁজতে হবে লোক-ঐতিহ্য, লোক-সঙ্গীতের, লোক-রূপকের বিশাল বিস্তারময় সমৃদ্ধ ও জীবন্ত রচনার ঐতিহ্য (যদিও প্রথম বিপুল বিস্ফুরণে সে রচনার পদক্ষেপ ছিল টলমল), "মিস্ট্রি" ও মহাকাব্যের ঐতিহ্য। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যকে ধরতে হবে এই সব অতিকায় প্রাচীন ফর্মগুলো যাদের প্রস্ফুরণ ক্লাসিক বিধিবদ্ধতার কবলে পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই সব বিশাল কাঠামোকে আবার গ্রহণ করে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য তাদের মধ্যে নতুন নিশ্বাস দিয়ে, তাদের মধ্যে বর্তমান জনগণের, ভবিষ্যতের শ্রমজীবীর গতিস্পন্দন, প্রসারণ ও স্বপ্ন ভরে দেবে।

আগে থেকে ঠিকঠাক করে কাজে নামবার কোন কৃত্রিমতা ওই প্রবণতায় নেই। একটা স্বাভাবিক শক্তির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে আছে। রাজনৈতিক নির্দেশের কোন স্বপ্ন আর এতে নেই। বৈপ্লবিক অভিযান হচ্ছে এক জীবন্ময় অবধারিত ভাগ্যের সংগঠন। এ প্রবণতা স্বভাবসঙ্গত, কারণ এ হচ্ছে জনগণের অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও মূলগত পরিণাম।

সাহিত্যকে অধিকাংশ মানুষের এই সুকল্পিত ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের রূপ প্রতিফলিত করতে হবে ; যে বৈপ্লবিক ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে এবং যা এখন থেকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত চলবে সেই ইতিহাসের টাইপ, চরিত্র, কীর্তি ও ঘটনা প্রদর্শন করতে হবে, অতীতের বিরুদ্ধে বর্তমানের ভিতরের ও বাইরের প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে।

তার একটা নেতিমূলক কর্তব্যও দেখা দিয়েছে—ধ্বংসের কর্তব্য। যে পুরনো ব্যবস্থা চলমান পৃথিবী বদলাতে চেষ্টা করছে সেই ব্যবস্থাকে তার আক্রমণ করতে হবে : কর্মে, আচার-ব্যবহারে, মনোবৃত্তিতে সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে, বৃহৎ-ভাবে ও ক্ষুদ্রভাবে যত ক্ষয়, যত অপব্যবহার, যত অসামঞ্জস্য ও যত পাশবিকতা

আছে সব আক্রমণ করতে হবে। সমস্যা দুই জাতের নেই : বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়ান ; আছে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী। মুখোস খসিয়ে দেওয়া দরকার। এমন দৃশ্য এমন বিকার ও আচার-ব্যবহার রয়েছে যেগুলো বিশ্বব্যাপী দর্শকের সামনে টেনে এনে ধরতে হবে—যাতে তারা পরে চোখের সামনে সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে দেখতে পায় কিংবা যাতে তারাই সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে।

নতুন সাহিত্যকে প্রাচীন 'ইন্টেলেকচুয়ালিটি'-ও আক্রমণ করতে হবে, বিশেষভাবে, বুর্জোয়া সাহিত্যের সমালোচনার ভার নিতে হবে (কর্মী-লেখকদের একটা বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা)। বুর্জোয়া সাহিত্য তার সমস্ত রূপে ধনতন্ত্রী সমাজকে প্রকাশ করে। এ রকম পণ্যকে প্রবল আঘাতে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমি ইতিপূর্বেই মস্কোতে এই কৃত্রিম, উপর-ভাসা ও ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের কথা বলেছি। এ সাহিত্য তার প্রতিনিধিদের কারো কারো অর্থাৎ সাহিত্যিক শিল্পপতিদের টেক্‌নিক-কুশলতার দৌলতে এখনও একটা মর্যাদা বজায় রেখেছে। এই বইয়ের স্তূপের বৈশিষ্ট্য হল মার্সেল প্রুস্ত্-এর ধরনের বিশৃঙ্খলা, অসংলগ্নতা, শূন্যতা, তুচ্ছতা (এ রচনার নতুনত্ব সঞ্চার করা হয়েছে উপর থেকে), সবিস্তার খুঁটিনাটির উপর রুচি, উঁচু সমাজের ঝলকানি, আঁদ্রে জিদ্-এর ধরনের দুর্নীতি অনুশীলন, পল ক্লদেল-এর ধরনের কুসংস্কারণ-অনুশীলন ; তাক লাগাবার জন্যে চেষ্টা, সাধারণ গণ্ডীর বহির্ভূত চরিত্র ও বিষয় খোঁজা (যে সব কৃত্রিম লোককে আমাদের বিপরীত দিকে খাড়া করবার চেষ্টা করা হয় তাদের মধ্যে বিকৃতমস্তিষ্ক ও বিকৃতস্বভাবের সংখ্যা প্রচুর), খোপে খোপে ভাগ করার প্রাণপণ ঝোঁক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—সংক্ষেপে সর্বক্ষেত্রে ভাগ-বিভাগ, আত্মকেন্দ্রিকতা আর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা জীবনের শ্বাসরোধ। এই স্বৈরাচার থেকে শুধু একটি নেতিবাচক থিয়োরিই বেরিয়ে আসে : আর্টের জন্য আর্ট।

এই যে যাদুঘর এখানে আজকাল আবার "পপিউলিস্ট" লেখকেরা নিয়ে আসছে জনসাধারণের সবারি, শ্রমিক ও কৃষককে সাজাচ্ছে হাল ফ্যাশানে। এরা মনে করছে বিষয়বস্তু বদলাতে হয় নেকটাই বদলাবার মতো। এরা জনসাধারণের সেইরকম বন্ধু যেরকম বন্ধু সরকারী ডেমক্র্যাটরা। এরা শ্রমজীবীদেরই আঁকুক আর স্নায়ুবিকারগ্রস্তদেরই আঁকুক, যে জীবন্ত ও রূঢ় মনোবেগ নতুন মানুষকে, সমষ্টি মানুষকে, জনতাকে তুলে ধরে তার আপন বলে সাহিত্যে প্রবেশ করাবে (সাহিত্যের কাঠামো যদি তাতে ফাটে ফাটুক), সে বেগ এদের পেছনে ফেলে চলে যেতে দ্বিধা করবে না।

যে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় আমি পর পর বললাম তা থেকে এই সিদ্ধান্তই হয় যে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানস-শক্তিগুলোর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-চিহ্নিত দিক-পরিবর্তন, নতুন ব্যূহ সংগঠন ও গতিমুখীনতা। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তও করতে হয় যে, বর্তমান সময়ে এমন লেখক খুবই কম যাঁরা সর্বাঙ্গীনভাবে প্রোলেটারিয়ান লেখক। আবশ্যক সমস্ত শর্ত এক সঙ্গে পূরণ করতে পারেন এমন লেখক বিরল। যাঁদের নাম মনে আসে তাঁদের অধিকাংশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁরা মাত্র কোনো একটা দিক দিয়ে প্রোলেটারিয়ান লেখক। আমাদের সংগঠিত প্রোলেটারিয়ান লেখক-বাহিনীরা (আমাদের ফ্রান্সে এই বাহিনী অবিরাম গড়তে থাকবে) এখনও পরামর্শ-সঙ্ঘ আর বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এ সাহিত্যের বিকাশ যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করা। সমাজ-কর্মীদের পরিকল্পনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এই বিরাট কর্মসূচীকে সমস্ত বাধা অপসৃত করে সামনে ধরতে পারলে সে ব্যবস্থা হবে। সেইটাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের যতখানি সচেতনতা আর পরিষ্কার উপলব্ধি সঞ্চার করতে পারব এই বিকাশে ততখানি সাহায্য করতে পারব। আমাদের অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ইণ্টেলেকচুয়াল ও আর্টিস্টিক আন্দোলনকে সম্পর্কিত ও একীভূত করতে ; বরং বলি, তাদের পক্ষে নিজের থেকে সম্পর্কিত ও একীভূত হতে সময় লাগে। এই ধরনের উপলব্ধি ও তার রূপ-দানে মানুষের মন কেমন যেন একটু মন্থরভাবে চলে। মানস ক্ষেত্রে দানা বাঁধবার জন্যে যে সময় দরকার তাকে প্রাকৃতিক উপাদানের দানা বাঁধার সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘটনাবলীর দ্বারা অপেক্ষাকাল বাড়তে পারে ; কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই তার আসল কারণ হল সমস্ত কাঠামোটা রক্তে মাংসে গড়ে তোলার গভীর কর্ম প্রয়াস। আমরা এ কর্মের একটা গৃহ নির্মাণ করেছি। সুতরাং সবচেয়ে কার্যকরী যে যোগাযোগ আমাদের দরকার, তা আমরা পাব মহৎ রুশ বিপ্লবের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

অনুবাদক : অরুণ মিত্র

প্রখ্যাত ফরাসী লেখক আঁরি বারব্যুস-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই রচনাটি ভাদ্র ১৩৫১-এর 'পরিচয়' থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। আগামী কোনো সংখ্যায় এই বিশ্বখ্যাত কমিউনিস্ট লেখকের প্রতি বিশদভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।—সম্পাদক

উদয়পুরের উপকথা

ভবানী সেন

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৫

গান্ধী আরুইন চুক্তির ফলে মহেশখুড়ো মেয়াদ না ফুরোতেই জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছিলেন। উদয়পুরে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু মহেশখুড়ো তাতে কোনো উৎসাহ পান নি। তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, "মরা ছেলে জন্মেছে, জন্মবার্ষিকী আর মৃত্যু বার্ষিকী এক সঙ্গেই করা চলে।" গান্ধী আরুইন চুক্তিকে তিনি জাতীয়-সংগ্রামের ভ্রূণহত্যা বলে বর্ণনা করেছিলেন। তারপর বহুদিন তিনি আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। ১৯৩৪ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতির ভাষণ পড়ে আবার উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

ভাদ্র মাস। বৃষ্টির জল সুলতানপুরের বিল ছাপিয়ে উদয়পুরের পথের ঘাট পর্যন্ত তলিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ল। জল বেড়ে বেড়ে এত হল যে পথে ঘাটে আর চলা যায় না। চারিদিকে শুধু জল আর জল। বাড়ির উঠোনেও হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যায়। ৪ বছর আগে সুলতানপুর চাষীদের খালকাটার আন্দোলনে যারা নির্লিপ্ত ছিল, তারাও এবার জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর নামে শপথ উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছে। হাটবাজার একরকম বন্ধ বললেই হয়। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের দুরবস্থার একশেষ। উদয়পুর, সুলতানপুর প্রভৃতি দশ-বারো খানা গ্রামের এই অবস্থা। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে হলে নৌকা, ডোঙা কিংবা ভেলায় চড়ে যেতে হচ্ছে। চাষীদের বিপদ সবচেয়ে বেশি। ধান-পাট যার যা কিছু আছে তাও রাখার জায়গা নেই। ঘরের মধ্যে মাচা তৈরি করে বাস করতে হচ্ছে। গরু-বাছুর রাখে-বা কোথায় আর বাঁচায়-বা কি খাইয়ে।

মহেশখুড়ো স্কুলের মাস্টার জলধর বাবুকে নিয়ে দুর্গতদের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা করছেন। তাঁদের উদ্যোগে একটি সংকটত্রাণ সমিতি গঠিত হয়েছে।

স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু বন্যায় যে মহাসংকট সৃষ্টি করেছে তাতে রিলিফ সমুদ্রে গোষ্পদের সমতুল্য।

একদিন সন্ধ্যের সময় জলধর বাবু তার বৈঠকখানায় বসে আছেন। সারাদিন ধরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিকে থৈ থৈ করে জল। এমন সময় ভিজতে ভিজতে হন্তদন্তভাবে মহেশখুড়ো এলেন। ঘরের পৈঠেয় পা দিয়েই তিনি বলে উঠলেন—"শুনেছো জলধর, পুলিশে সাধনের বাড়ি নোটিশ দিয়ে গেল, আগামী একমাসের মধ্যে অবনী যদি আত্মসমর্পণ না করে তো সমস্ত বাড়িটা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিসহ সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নেবেন। গরীব বেচারা সাধন, পরিবার নিয়ে এই দুর্দিনে এখন যায় কোথায় ?"

জলধরবাবু বললেন—"বসো খুড়ো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আরে ও মধো, মধো কোথায় গেলি, খুড়োকে তামাক দে।"

খুড়ো বলে চললেন—"এখন এর একটা বিহিত করো জলধর।" জলধর-বাবু বললেন—"তাই-তো, বেচারী সাধনের ত বড় বিপদ উপস্থিত। কিন্তু অবনীরই বা কি আক্কেল, খামোখা হুজুগে মেতে এসব কি খামখেয়ালি করে বেড়াচ্ছে আর তার ফলভোগ করতে হচ্ছে একটা নিরপরাধ পরিবারকে।"

জলধর বাবু সমাজ সেবায় অগ্রণী, কিন্তু রাজনীতি তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। অথচ তাঁর যে স্বদেশপ্রীতি নেই তা নয়, অতীতের গৌরব, বর্তমানে দুর্গত সেবা এ সমস্তই তাঁকে উৎসাহিত করে। অবনী ও ভোলানাথকে তিনিই সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের মনে প্রথম স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণা তো জলধরবাবুর কাছ থেকেই আসে। তারপর যখন তারা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রাজনীতির স্তরে প্রবেশ করল, জলধরবাবু তখনই তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। সুলতানপুরের চাষীরা যখন খালকাটার আন্দোলনে নেমেছিল তখনও প্রথমটা জলধরবাবু তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু তা-ও যখন রাজনীতির মোহনায় প্রবেশ করল, জলধরবাবু তখন নিঃশব্দে কেটে পড়েন। তাই বলে যারা রাজনীতি করে তাদের ওপর যে তাঁর অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ ছিল ঠিক তা নয়।

জলধরবাবুর কথা শুনে খুড়ো উত্তর দিলেন—"আক্কেলটা অবনীর না পুলিশের সেই কথাটা ভাবো তো। তুমি তো রাজনীতি পছন্দ করো না, কিন্তু রাজনীতি যে লোকের পেছন পেছন তাড়া করে আসে। সাধনই কি রাজনীতি পছন্দ করে ? কিন্তু ভাইয়ের জন্য তার ওপর এ জুলুম কেন ?"

মধ্যে তামাক দিয়ে গেল। খুড়ো নিঃশব্দে হুঁকোয় টান দিতে থাকলেন।

জলধরবাবু বললেন—"সে কথাও বুঝলুম, কিন্তু তোমাদের রাজনীতিতে এত মতামত আর এত দলাদলি, সেই জন্যই তো রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করে বেশ আছি। তুমি এক মতের, অবনী আর এক মতের, ভোলানাথ শুনছি নাকি আবার অন্য-এক মতের।" একটু থেমে একটু হেসে বললেন—"সবাই যদি একমত হোতে তো না হয় নেমে পড়তাম তোমাদের সঙ্গে মাথায় পাগড়ি বেঁধে।" খুড়ো হুঁকোয় সুখটান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"মতের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভালো হয় বুঝি? পাঁচমতের চেয়ে যদি একমত ভালো হয়, তবে শূন্য মত সবচেয়ে ভালো। সুতরাং তোমার আর শূন্যমত ছেড়ে একমতে এসে কাজ নেই। এখন সাধনের কি ব্যবস্থা করা যায় তাই বলো দেখি।"

জলধরবাবু অগত্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন—জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে কিছু গ্রামবাসীর স্বাক্ষরসহ আর্জি নিয়ে গিয়ে একবার দরবার করে দেখবেন।

খুড়ো খুব খুশী। একগাল হেসে বললেন—"তুমি না হলে কি আর কাজ হয়, এই জন্যই ত তোমার কাছে আসা।"

জলধরবাবু—"বেশি আশা রেখো না খুড়ো। যাব বটে, তবে কাজ কিছু হবে কিনা বলতে পারি না। হাকিম নড়লেও হয়ত হুকুম নড়বে না।"

খুড়ো—"এই ত একটা রাজনৈতিক মত প্রকাশ করে ফেললে। নাঃ, তোমার জাত আর রইল না দেখছি।"

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেলো। খুড়ো উঠি উঠি করতেই জলধরবাবু বললেন—"এত রাতে জলে ভিজে যেতে হবে,—বাড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, না খেয়ে তোমাকে আজ যেতে দিচ্ছি না।

সহাস্যে খুড়ো অগত্যা আবার জমে বসলেন।

১৬

উদয়পুর পরগণার সর্বত্রই প্রায় ১ মাস হল বন্যা শুরু হয়েছে, জল এখনও কমছে না। প্রথম পনেরো দিন জল ক্রমাগত বেড়েছিল। গ্রামের মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন, তাঁরা অনেক খরচ করে বাড়ি তৈরি করেন, তাঁদের বাড়ির উঠোন

উঁচু, ঘরের ভিটেও উঁচু। কিন্তু যারা খুব গরিব তাদের উঠোনও নীচু আবার মাত্র হাতখানেক উঁচু ভিটের ওপর খুঁড়ে। তাও আবার অনেকের ঘরে ছাউনি নেই। বন্যায় তাদের দুরবস্থার একশেষ।

এমনি দুরবস্থায় পড়েছে মালিনী। সংসারে তার আজ আর কেউ নেই। আর স্বামী যখন মারা যায় তখন মেনকার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। যক্ষ্মা-রোগে ধুকে ধুকে মরেছিল তার স্বামী। মেনকা আজ কোথায় ?

মালিনীর ঘরের ভেতরও জল ঢুকছে, ঘরের চাল দিয়েও জল পড়ে। সে এসে ব্রজনাথবাবুদের বাড়ির এক ঘরের বারান্দায় একটু স্থান করে নিয়েছে। ব্রজনাথবাবুরা সবাই কলকাতায় থাকেন, বাড়ির ঘরদোরে তালা দেওয়া রয়েছে।

এই বন্যায় মালিনীর আয়ের পথ একেবারে বন্ধ। সংকটত্রাণ সমিতি মুষ্টি ভিক্ষা দিচ্ছে, তাতে আধপেটা নুন ভাত খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

সন্ধ্যের সময় ব্রজনাথবাবুর বাড়ির বারান্দায় বসে বসে মালিনী আকাশ পাতাল কত কি ভাবছে।

নিজের দুঃখে মালিনীর আর কান্না আসে না। কেঁদেছিল সে একদিন, তার স্বামী যেদিন মারা যায়। তারপর থেকে দুঃখ-বিপদের আঘাতে আঘাতে চোখের জল তার শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আজ তার বুক ফেটে কান্না আসছে যদু মালী, বেনে বউ আর পাঁচীর মা এবং তাদের মতো গ্রামের আর পাঁচজনের কথা ভেবে। কত কষ্টেই না তাদের দিন যাচ্ছে।

মালিনী বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় রাস্তার দিক থেকে শুনতে পেলো—"মাসী, ও মাসী, মাসীগো।"

"কে ডাকে রে ?"

"আমি ভূপতি, শিগগির এসো মাসী, আমি ডোঙা নিয়ে এসেছি, বৌটার ব্যথা উঠেছে, এসো শিগগির।"

ভূপতির বৌয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে, ভূপতি মালিনীকে নিতে এসেছে ধাত্রীর কাজ করবার জন্য।

মালিনী চমকে উঠল। ঐ দুর্যোগের সময়…এই বন্যার মধ্যে…

মালিনী ছুটল।

ভূপতির বাড়ি ঘরের মধ্যে মাচার ওপর মালসায় তুষের আগুনের ব্যবস্থা করেছে কোনো মতে।

কাঠ তো দূরের কথা, গাছের পাতাটা পর্যন্ত পাবার উপায় নেই আগুন জ্বালার জন্য, এমনি হাল হয়েছে বন্যায়। তবু এই জল আর ঠাণ্ডার মধ্যে প্রসূতিকে খালাস করতে হবে নিরাপদে আর নবজাতককে বাঁচাতেই হবে।

ভূপতির বউ অসহ্য বেদনায় চীৎকার করেছে।···

ভূপতি ভয়ে বিশীর্ণ···

মালিনীর মন উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ···

রাত দুটোর সময় একটি পুত্র সন্তান জন্মাল। এলো আর একটি মানুষ, দুঃখ-দৈন্যের সংসারে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে; জন্মের প্রথম মুহূর্তেই তার ঘোরতর জীবন-সংগ্রাম।

মালিনী সারারাত জেগে প্রসূতিকে আর তার সন্তানকে আগুনের সেঁক দিলো—বাঁচাবেই তাদের মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে।

১৭

কৃষ্ণপক্ষ, শীতের সন্ধ্যা। পূর্ববঙ্গের কোনো একটি অখ্যাত অঞ্চলে পদ্মার পাড়ে একটি যুবক বসে রয়েছে। যুবকটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর। তার মুখে চোখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে। সে নদী পার হবে, খেয়াঘাটে না গিয়ে এইখানে বসে আছে একটা যাত্রীবাহী নৌকার অপেক্ষায়।

নদীর ওপারে শ্মশানঘাট, একটি চিতা জ্বলছে। রক্তরাঙা অগ্নিকুণ্ডের ওপর এবং চারপাশে কালো কালো ধোঁয়া আঁকিয়ে বাঁকিয়ে উঠে উঠে কালো বনরেখার গায়ে গায়ে মিশে যাচ্ছে।

যুবকটি মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে কে আর একজন বিদায় নিল পরাধীন ভারতের অভিশপ্ত সংসার থেকে, কে আর একজন রেখে গেলো অসমাপ্ত সংগ্রামের বেদনার স্মৃতি। কে সে? পুরুষ না স্ত্রী? বৃদ্ধ না যুবক, না বালক? আকাশে একটুখানি চাঁদ ছিল; ধীরে ধীরে চাঁদখানা ওপারে ডুবে গেলো। ক্রমশ পদ্মার বিস্তীর্ণ বক্ষ আচ্ছাদিত হল ঘন তমসায়। তার মধ্যে ঐ অগ্নিকুণ্ডটা যেন পরপারের একটি ইঙ্গিত।

ওপারে চিতেটা তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে।

হঠাৎ যুবকটির নজর পড়ল একটা দোমাল্লা পানসীর ওপর। নৌকোটা ধীরে ধীরে পাড়ের কাছ ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে।

যুবকটি ডাক ছাড়ল—"মাঝি ভাই, একটু পার করে দেবে ? পয়সা যা চাও তাই দেবো।"

উত্তর এলো—"পারমুনা কত্তা, সওয়ারী আছে।"

যুবকটি আবার হাঁক ছাড়ল—"যাত্রী কে আছেন নৌকায়, যদি দয়া করে আমাকে একটু পার করে দেন।"

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো নৌকোটা পাড়ের দিকে আসছে। যুবকটি আশান্বিত হল।

নৌকো পাড়ে এসে ঠেকল, যুবকটি উঠে গিয়ে গলুইয়ের কাছে বসতেই মাঝিরা পাড়ি ধরল।

যুবকটি সমস্তক্ষণ গলুইয়ের কাছেই বসেছিল, ভেতরের যাত্রীদের দিকে তাকিয়েও দেখে নি। নৌকোটা যখন মাঝ নদীতে, তখন যাত্রীদের একজন হেঁকে উঠলেন—"আরে, কে ও ? তুই ?"

যুবকটি পরিচিত গলার শব্দে চমকে উঠে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল—"দাদা, তোমরা।"

যুবকটি আর কেউ নয়, অবনী। তার বাড়ির সবাইকে নিয়ে সাধন নৌকো করে চলেছে তার মামার বাড়িতে ওদের রেখে আসবার জন্য।

অবনীর মা অপ্রত্যাশিতভাবে অবনীকে পেয়ে কেঁদে ফেললেন।

"বাবা ভগবান তোকে টেনে এনেছেন, কত ডেকেছি ভগবানকে তোকে দেখার জন্য, ভগবানের কানে সে ডাক এতদিনে পৌঁছেচে।"

তার বৌদি বলল—"সন্ন্যাসী ঠাকুরপো, বনবাসে আর সংসারে পথের মধ্যে এযে অদ্ভুত মিলন।"

অবনী তাঁদের কাছে শুনল—জলধরবাবু এবং মহেশখুড়ো অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের হুকুম রদ হল না। জলধরবাবু জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে দরবার করায় শুধু মেয়াদটা এক মাসের জায়গায় তিন মাস করে দিয়েছিল। আজ পুলিশের লোক বাড়ির দখল নিয়ে নেবে। দুদিন আগে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে এসেছেন। গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেনে এসে সেখান থেকে তাঁরা নৌকো করেছেন।

দাদা ও মা অবনীকে ধরলেন—"চল না আমাদের সঙ্গে, যাবি ? মামার ওখানে তোকে কেই বা চিনবে ?"

—"সে হয় না মা, এই যা দেখা হল এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

অবনী ফেরার আসামী, কি করে সে তাদের সঙ্গে যাবে ? তা ছাড়া চলেছে সে একটা সংকল্প নিয়ে জরুরি কাজে।

নৌকো এসে ওপারে পৌঁছল। অবনীর মা দাদা ও বৌদি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বিদায় দিলেন। বৌদি বলল—"আমাদের কথা একেবারে ভুলে যেওনা ঠাকুরপো।"

অবনী পারে উঠলেই নৌকোটা ছেড়ে দিলো—অবনী সেদিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

সরকারী দমননীতির আঘাতে বাস্তুহারা পরিবার পদ্মার বুকে ভেসে চলল।

অবনী গ্রামের পথ ধরে সোজা চলল ভেতরের দিকে। ডাকবাংলার কাছে এসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যেন কার প্রতীক্ষা করছে।

ডাকবাংলার মালী এসে জিজ্ঞেস করল—এখানে থাকা হবে নাকি বাবুর ?

"হ্যাঁ, ভোর অবধি থাকব এখানে।"

মালী বাংলোর একটা কামরা খুলে দিলো। বাতির আলোয় বাবুটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে যেন বুঝতে পারল।

"বাবু কি উদয়পুরের লোক ?"

অবনী বলল, "তোমার নাম কি মোকসেদ মিঞা ?"

"আপনি কি তাহলে··· ?"

"হ্যাঁ অবনী।"

মালী তখন প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—"বড় দেরি হয়ে গেছে বাবু, আজই তিনি মারা গেছেন।"

অবনীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

প্লুরিসি রোগে অসামান্য যন্ত্রণা ভোগ করে ভোলানাথ সেই দিনই সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। থানার দারোগা টেলিগ্রাম করেছিল ব্রজনাথ রায়কে—কিন্তু তাঁর আসতে দুদিন লেগে যাবে। তাছাড়া পুলিশে মৃতদেহ দেশে নিয়ে যেতেও দেবে না। স্থানীয় লোকেরা তাই মহকুমা হাকিমের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে আজই তার শেষকৃত্য করেছেন। ভোলানাথেরই শবদাহ অবনী দেখে এসেছে নদীর পাড়ে।

ভোলানাথ মোকসেদ মিঞার সাহায্যে অবনীকে চিঠি পাঠাত। অবনী চিঠিপত্র আদানপ্রদানের জন্য মোকসেদ মিঞার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে

নিয়েছিল। এখানে অন্তরীণ হয়ে আসার পর ভোলানাথের সঙ্গে মোকসেদ মিঞার আলাপ হয়। মোকসেদ ডাকবাংলোয় মালীর কাজ করত, তার অন্তরটা ছিল স্বদেশপ্রীতিতে পরিপূর্ণ। ভোলানাথের চরিত্রমাধুর্য এবং ত্যাগবরণ তাকে অভাবনীয়রূপে আকৃষ্ট করেছিল।

সাতদিন আগে অবনী ভোলানাথের পত্র পেয়েছিল। সেই পত্রে অবনী কিভাবে আসবে, কেমন করে দেখা করবে সে সমস্ত বিশদভাবে লিখে দিয়েছিল। মোকসেদ মিঞাকেও অবনীর বিবরণ দিয়ে সবিশেষ বলে রেখেছিল ভোলানাথ।

তারপরই ভোলানাথের অবস্থা খুব খারাপের দিকে যায়। অবনী অনেক আশা নিয়ে ভোলানাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মনের ভিতর তার ঘোরতর দ্বন্দ্ব। যে পথে সে চলছিল সে পথের ব্যর্থতার ভার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কোন পথে যাবে, কি করবে, কেমন করে জীবনের আদর্শ সফল করবে?

একদিন ভোলানাথের সঙ্গেই সে বিপ্লবী জীবন আরম্ভ করেছিল। ভোলানাথের গ্রেপ্তারের আগে তারই কাছে সে শুনেছিল নূতন একটা মতের ইংগিত। আজ সে এসেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাদের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

কিন্তু সে আর হল না।

মনের ভিতর সেই দ্বন্দ্ব নিয়ে ভোলানাথকে আবার ফিরতে হবে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে—প্রাণে নিয়ে অসহনীয় বেদনা এবং হতাশা।

ভোর হতে না হতেই অবনী রওনা হল। [ক্রমশ]

পুষ্পপ্রদর্শনী

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

খোলা চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী হয়ে গেলো গতকাল রাতে।
রাজ্যপাল কর্মব্যস্ত আসতে পারেন নি, তাই, চন্দ্রের বরাতে
ইংরেজি বক্তৃতা নয়, শহীদমিনারখানি জুটেছিল নিচে
গঙ্গায় যে নৌকো ছিল দুলে উঠল ঢেউয়ের কিরিচে।

ময়দানের এককোণে কয়েকটা কুষ্ঠরোগী সারাদিনের আয় গুণে নিয়ে এক বর্গফুট আগুন জ্বালিয়েছিল, একজন একটা গানের কলি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিল, অন্যদিকে চারপাঁচজন বাস ড্রাইভার তেরো তারিখের ধর্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, যদিও এই মধ্যশীতে শহরের অজস্র পাতা ঝ'রে গেছে, তবুও চিরহরিৎ গাছগুলো তাদের বশ্যতা বজায় রাখার জন্য রাজভবনের চারদিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং

সারিসারি গাড়ি ছিল, পাথরকুচিতে ঠাসা রাস্তা ছিল বেলেল্লা রঙীন,
উর্দিপরা ড্রাইভার ঠেস দিয়ে বসেছিল ভবনের বহুদূরে চায়ের দোকানে—
ছেলে তার লালবাজারে, কথা বের করতে গিয়ে আচমকা বধিরতা এসে গেছে
কানে,

যদিও রক্তের ছোপে চমৎকার লাল হয় একই সঙ্গে সাদা কিংবা খাকি—
জামিন না পেলে ভালো—তবুও তো বেঁচে যাবে একজনের বাড়ন্ত খোরাকি,
সাজানো ফুলের গন্ধে হঠাৎ হাসির শব্দ, নারীকণ্ঠে ভেঙে যায় হালকা
পোর্সেলিন।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের পর ভিতরের দিকে মজা হবে, তাই আগেই সমস্ত ঠিকঠাক রাখা ভালো। পাগড়ি মাথায় বেয়ারারা পৃথিবীর সব চাইতে

সাদা রুমালে বোতল এবং পেগগুলো বার বার ঘ'ষে সাজিয়ে রাখছিল, অজস্র ফুলের ফাঁকে ফাঁকে দুজন সবুজ নেতা এবং তিনজন গোয়েন্দা পুলিশ বেড়াচ্ছিল—এমন সময় হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে একজন উন্নত মহিলা এসে নামার সঙ্গে সঙ্গে নেতা এবং পুলিশের চোখে তিনি যুগপৎ দোলায়িত নিতম্বে একজন মেয়েছেলে হয়ে গেলেন।

চন্দ্র তো আকাশ থেকে নেমে এসে হয়ে যান নাম কিংবা সংক্ষিপ্ত পদবী,
মল্লিকা বাসন মাজে—একমাত্র ছেলে তার চায়ের দোকানে কাপ ধোয়,
চন্দ্র ও মল্লিকা এই শব্দ দুটি যুক্ত হলে জজসাহেব খুলে দেন ফুল্ল প্রদর্শনী—
বৃহস্পতি রিপোর্টার, মিষ্টিকুত্তা কোলে নিয়ে পুরস্কার তুলে দেয় শনি।

রাত গভীর হয়ে এলে গাড়ি চলাচল কমে যায়, একটা মাতাল জড়ানো গলায় গান ধরে, বিশিষ্ট অতিথিরা ড্রাইভারের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে হুমড়ি খেয়ে ঢোকেন, কুষ্ঠরোগীরা চট জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে, হঠাৎ একটা দোতলাবাস ভয়াবহভাবে এক চক্কর ঘুরে কোথাও চলে যায়—

প্রভুর কৃপায় জোটে মাননীয় ব্যক্তিদের নতজানু সুরা ও পশম—
ধমনীতে জমা ছিল বেহেড মুৎসুদ্দি রক্ত—এক সঙ্গে প্রভু আর ক্রীতদাস
হবার গরজ,
লম্পট চন্দ্রের নখ ভোঁতা হ'লে চশমখোর শহরের বমি উপশম,
শেষ রাত্রে মালী এসে চন্দ্রমল্লিকার বুকে খুলে দেয় বসন্তপরজ।

দেহের উপর মেলে দিয়েছ ছায়া

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দেহের উপর মেলে দিয়েছ ছায়া শাণিত আর হিম দীর্ঘ ছায়া
আর ওই তীক্ষ্ণ নখের বিদ্যুৎ হাত রেখেছে শিকড়ে
আর ডানার উষ্ণ বাতাস ঝরায় পাতা নাড়ায় ডালপালার জাগরণ
কে পেতেছে হাত নিখিল ক্ষুধার জিহ্বা যেনবা ঊর্ধ্বমুখ
আর আঙ্গুলগুলি হিমার্ত বল্লম উলংগ আর অভ্রান্ত আর নিরুত্তাপ
আর ছায়া কাঁপছে দেহের উপর শাণিত আর হিম দীর্ঘ ছায়া
উদ্যত ওই ঠোঁট দুটির তৃষ্ণা ক্রোধ এবং ঘৃণার যুগ্ম অভিযান
আর পালক তোমার ডানায় উঠছে জ্বলে বীভৎস আর অপরূপ

আড়াল করবে একদিন সূর্য থেকে আমাকে আর ঝরে পড়ব ধুলোয়
হারিয়ে যাব স্তব্ধ জটিল কুয়াশায় হারিয়ে যাব
কেমন পেতেছি সংসার উপেক্ষা করেছি নশ্বরতার ভ্রূকুটি ও
অনুশাসন জয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি হাত
স্তম্ভ গড়ব আকাশচুম্বী মিনার গড়ব আমি এই রকমই
নীলিম দাবি প্রতিজ্ঞা ও শাসন উচ্চাশা ও বেদনা
কেমন নিবিড় অগ্নিগর্ভ বৃক্ষ হয়ে জেগে উঠল এবং
ছড়াল ডালপালা ধরল ফল

বয়স ছুঁতে চাইছে নক্ষত্র পরম এক স্তবগুচ্ছ পাতায়
অধঃমুখিন ফলগুলির রক্তে শিকড়গুচ্ছে অযুত নিযুত আঙ্গুল
চায় প্রতিরোধ চায় অলোকবীজকণা
তুলে ধরছি যখন শাখাবাহুর সবুজপাত্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে
তুমি তখন ছায়া ফেলছ দীর্ঘ হিম ছায়া ফেলছ তুমি
আমার শরীর জুড়ে রাত্রি নামছে শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ছে হাত
মাটির উপর খুঁজছে ভর মাটির নিচে পরম নির্ভরতা

কোনদিকে ?

আশিস সান্যাল

যে-কোনো প্রান্তর থেকে শুরু করা যায় ;
কিন্তু কোন্‌দিকে ?
বনলতা আছে জানি নদীর ওপারে,
কিছু ফুল, প্রজাপতি, পাখি—
অথচ আশ্চর্য দেখ দিনান্তে একাকী
হেঁটে যাই অন্যধারে ;
দেখি ম্লান অন্ধকারে দিনান্তের ছায়াঘন মুখ।

যে-কোনো প্রান্তর থেকে শুরু করা যায় ;
কিন্তু কোনদিকে ?
বলো কোন্‌ অভিসারে
তোমার চোখের মতো
রয়েছে দিগন্তলীন নিমীলিত সুখ ?

আমার স্মৃতি, আমার আগুন

গণেশ বসু

সকাল থেকেই বুকের ভিতর চাপা অস্থিরতা
অনেকটা সময় কেটে গেছে শেষ বর্ষার পর
পিঁপড়ের ঠ্যাং দেখতে দেখতে
টিকটিকির চোখের তারা দেখতে দেখতে
মাকড়শার কণ্ঠস্বরে ঘরময় বুনো বাতাস, বাতাসের মাদকতা।

এখন সীমাহীন জ্বলছে সূর্য
ঘন হয়ে বসেছে দিন

দূরের আকাশ এখন জ্বলন্ত অঙ্গার
তাতেই দেখলাম পরস্পরকে।

সোমবার। ১১ জুন। দুপুর হতে অনেক বাকি।

তোমায় লিখতে গিয়ে বিচলিত। কিই-বা লিখব?
[কেবল তোমার স্মৃতিই একাকার
তোমার ভিতরেই অসহায় বন্দী
নিজে নিজেই বিকেল বেলার আলো]
"হে আমার সন্ধ্যামণির গান…বুকের ভিতর আগুন…তুমিই আমার
ক্ষুধা এবং ঘৃণা…আগুন এবং ভূমি…আমার রাজেশ্বরী দিন…
দুঃসাহসী রাত…তুমিই…"

অনেক কথাই লিখতে চাই, অথচ সাহস নেই
অনেক কিছুই বলতে চাই, তবু বলতে পারি না
ভাবতে ভাবতে সময় ভাঙে সিঁড়ি, আকাশ ছোঁয়
ভাবতে ভাবতে সংসার হয়ে ওঠে তোমার মুখ, তোমার স্বরলিপি,
এক পা এগোই
এক পা পেছোই
"আমার দুর্বলতাই আমার হন্তারক…আমার ছলনাই আমার অশান্তি
…আমি ঘুরছি অনিশ্চিতের মুঠোয়…একা একা পুড়ছে দড়ি-পাকানো
শরীর…"

তোমাকেই সব বলতে হবে…তোমাকেই লিখব…
ধুলোর মতো উড়তে চায় কাগজ
ঘোড়ার কেশর অবাধ্য এই স্মৃতি
বাঘের থাবার স্বপ্ন।

মাঝে মাঝে দেখতে পাই সেই মুখ: বুকের ভিতর আয়না
"এই পথ দিয়ে আগেই গিয়েছে কেউ…কথার ঘোরে হয়তো গিয়েছি আমিই

…আমার থেকে আবার আলাদা তার রঙ…বয়স…স্বপ্ন…"

আমায় ডাকল সেই চোখ
আমায় ডাকল তার বয়স
আমায় ডাকল তার শরীর
পিঁপড়ে, মাকড়শা, টিকটিকির পাহাড়।

কাঁদলাম : কাকে পাহারা দেবো ?
কাকে পাহারা দিচ্ছি একা একা ?
কাকে লিখছি : "আমার বয়স ৩২…অপেক্ষা করো আরেক আকাশ
আসবে বলে…সবুজ বাগান জ্বলবে বলে…আমি ৪১-এর H_2°…
'৪৭-এর এক টুকরো হাওয়ায় ভাসা ফল…পালক-ছেঁড়া পাখি…পোকায়
কাটা স্মৃতি…'৬৩-র আগুন…আমার অশ্রুই আমার ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের
মানুষ…আমার দুঃখই আমার কলকাতা, কলকাতারই স্বপ্ন…আমার
বয়স ৩২…

দূরের আকাশ এখন জ্বলন্ত অঙ্গার
আয়নার ভিতরে আয়না

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

একটাই সঙ্গীত শিখে
সকলেই জেগেছিল গ্রামেগঞ্জে, শহরে ও সময়ের মতো কোনো পাকা ধান ক্ষেতে।
রোদ্দুর পোহাতে বুঝি চেয়েছিল, রোদ্দুরেই হৃদয়ের স্বাদ জেনে নিতে !
নাকি কেউ পেয়েছিল ভোরাইয়ের গানে গানে কোনো আমন্ত্রণ ?
শিকারীরা জেনেছিল, এ সংবাদ, যেন কোনো গূঢ় টেলিগ্রামে।
জানেনি তাৎপর্যটুকু। জেনেছিল, হবে এক নাটকের দৃশ্য উন্মোচন।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত এই দূরভাষী সংবাদের ভাষ্য থেকে নিহিত সংগ্রামে
কে কেমন যুক্ত ছিল, কতটা স্বাধীন কিম্বা ক্রীতদাস ছিল বা ছিল না—
একথা বুঝিনি আমি দ্বীপান্তরে বাস করে। আদিগন্ত প্রান্তর পেরিয়ে
এখন হৃদয় দেখছি, যেন সব উপকূলে ভেঙে গেছে সমস্ত সীমানা।
ছাখো, ছাখো পাখিগুলি কী রকম উড়ে যাচ্ছে প্রাচীর ডিঙিয়ে!

এখানেই দৃশ্য শেষ। অন্তর্দৃশ্য দেখতে হবে বাঙলাদেশে গিয়ে।
নিজের অর্ধেক রক্তে ভয়াবহ স্নান সেরে যুবকেরা ঘরে ফিরছে পালক মাড়িয়ে।
এবং দ্বিতীয় স্নান করে যাচ্ছে পুনরায়
নিজেরই চোখের জলে, রুপোলি শোকের মতো জল।
ট্রেনের হুইস্‌ল শুনছে, স্টীমারের বাঁশি শুনছে, আগমনী সঙ্গীতের সুরে
এই দৃশ্য আলোময়। রক্তধোয়া সূর্য জ্বলছে—আশ্চর্য উজ্জ্বল!

মহড়া

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমার ঘরের দেয়ালে
একটা বাঘের ছাল টাঙিয়ে রেখেছি
একেকদিন নিশুতি রাত্তিরে সেটা গায় চাপিয়ে
আমি উঠোনময় ঘুরে বেড়াই
উঠোনময় বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াই
কখনো ওঁত পেতে বসে থাকি নিঃশব্দে
কখনো বা গর্জে উঠি পৃথিবী কাঁপিয়ে
আবার কখনো বা শিকার তাক্ করে
ঝাঁপিয়ে পড়ি অব্যর্থ থাবায়—
নখে দাঁতে ছিঁড়ে ওকে টুকরো টুকরো করি।

অতঃপর জামাকাপড় খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াই—
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি
শরীরের কোথাও এক আধটু বাঘের ছাপ পড়েছে কি না

ভেতরের হাড়হাভাতে গাধার বাচ্চারা
চাবুকে চাবুকে ফালা ফালা হলে
একেকদিন নিশুতি রাত্তিরে
আমি উঠোনময় বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াই ।

এখন আর দুঃখের কথা উঠতে পারে না

সত্য গুহ

এবার আর কোনো কথা উঠতে পারে না
আমি ঠিক করে ফেলেছি
বাঁচব

বাতাস বইতে থাকো, রোদ্দুর নেমে এসো
শয্যায় পৌঁছনোর আগে
গাছে গাছেই সারাদিন প্রদর্শিত হোক ফুল

দুর্ঘটনায় বিশ্বাস করিনা
আমার ভালোবাসার রূপ ও আমার ঈশ্বরকে
স্বতন্ত্র করে দেখা বাতুলতা

এখন আমি খুব স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারি
জন্ম বৃথা যায় নি
পুরোনো পৃথিবী ঢেলে সাজানোর জন্যে
আমার হাত দুটো উস্কে দিচ্ছে

গিনিমাটি রঙের আর একজোড়া হাত
এবং সে হাতই, এই ছাখো, আমার গলায়
দুর্মূল্য মালাকেও লজ্জায় ম্লান করে দিয়েছে

বাতাস বইতে থাকো, রোদ্দুর নেমে এসো
শয্যায় পৌঁছনোর আগে
গাছে গাছেই সারাদিন প্রদর্শিত হোক ফুল

বন্ধ্যা জমির দিকে মৌসুমী উড়ে যাও
সবুজ কার্পেটে পা ফেলে পা এঁকে চলে এসো ফলন্ত অঘ্রাণ
নক্ষত্রের ঝাড়লণ্ঠনগুলো এবং জোনাকীদেরও, নিশি, জ্বালিয়ে দাও

এবার আর দুঃখের কথা উঠতে পারে না
আমরা দ্বৈত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে
এ জন্মের শেষ নির্মাণ সম্ভব করে তুলেছি।

রাজকন্যা

রবীন সুর

এখনও কুয়াশাগন্ধী সকালের স্মৃতির সংক্রাম
ঝরা সজিনার ফুলে ছেয়ে আছে, বাল্যের ভিতর
কেউ আসে, ফিরে যায় ; কেউ কেউ কখনও ফেরে না
তাদের বাসন্তী রং, দক্ষিণের প্রেরিত মাতাল
সৌরভ সমস্তদিন অন্তরঙ্গ বোধের কোরকে
যন্ত্রণা-গুটিকারূপে ফুটে ওঠে তীব্র বিপর্যয়ে :
এলোমেলো হাওয়া আসে, ঘরছাড়া বাউল স্বভাবে
যে-কেবল পর ছেড়ে ঘরে থাকে, বৈষম্য বিশাল
আয়তন পেয়ে গিয়ে ভয়ংকর নিষ্ঠুর আঘাতে
তাকেই বিবাগী করে গার্হস্থ্যের জমাট সংসারে

সংক্রান্তি কাছিয়ে আসে তবু সব রদবদলের
নতুন মহড়াগুলি অভ্যাসের সতর্ক আঙুলে
তাদের প্রত্যয়গুলি তুলে নিয়ে ব্যাকুল সিন্দুকে
অনায়াসে রেখে দিতে অকারণে কেন ভুলে যায়।

নদীর গভীরে

অনন্ত দাশ

উপকূল ছেড়ে আমি ক্রমশই চলে যাচ্ছি নদীর গভীরে
সঙ্গীরা দূরত্বে হাঁটে
কিংবা সঙ্গী বলে ভাবা সেই মানুষেরা চলে যাচ্ছে দূরে
নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় আমি দলবদ্ধ পাখিদের ডানা থেকে
পালকগুলো খসিয়ে দিই
আমার অভিজ্ঞ হাতে পাপ ও সংহার জমে
চিবুকে ঘনায় অন্ধকার।

পরস্পর মুখোমুখি বসে
তবুও কখনও যেন না-চেনার ভান করে
বেঁধালে আমূল ছুরি বুকে
অথচ মানুষকে তুমি সৎ ও সুন্দর বলে ভালোবেসেছিলে
তার মুখে দেখেছিলে সমুদ্রের সাধ
অনেক রৌদ্রের রক্তে অভিষিক্ত হাতে
তুলে দিলে গোধূলির দ্বন্দ্বচূর্ণ আলো।

শূন্য বন্দরের দিকে জাহাজ ফেরাবে তুমি জানি
বিভক্ত পথের মোড়ে উড়ে যাবে রঙীন ফেস্টুন
তবু কী ফেরাতে পারো ভালোবাসা ?
নকল হাসির দাঁতে মনুষ্যত্ব, ফেলে আসা স্পর্শের উত্তাপ
আমি স্থির অকম্পিত বোধে
জ্যা-মুক্ত রৌদ্রের এই দারুণ বিস্ফারে
শুয়ে থাকি
আকাশ আত্মস্থ হলে পুনরায় ফিরে যাব নদীর গভীরে।

দাস-পরিবার

শিশির সামন্ত

নাগরিক হতে গিয়ে অমায়িক বুদ্ধির প্রদীপ
নিভে গেছে, প্রাতিস্বিক অন্ধকার করেছে দৈন্য ঢের বেশি
আজ, নিভে যায় শহরের আলো আকস্মিক।

হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে আলো, শহর আঁধার
যেন মৃত নগরীতে বাস, যেন কোনো টানেলের হঠাৎ বাতানুকূল,
অচল, তাইতে হয় দমবন্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগোয় ট্রামবাস, হাঁটে পথচারী
এখন বাড়িয়ে মুল যেন কোনো গুহা হতে
দেখছে এ সভ্যতাকে যে সব মানুষ
বাহাত্তর ইঞ্চি মেন পাইপের ভিতরে সংসার ;
লজ্জা পায় তার।

হঠাৎ কারেন্ট ফেল, এখন ডারউইন মার্কস নিয়ে
ক্রম বিকাশের তর্কে তত্ত্ব তেমনি নির্বিকার ! প্রাসঙ্গিক
নিজের মূঢ়তা নিয়ে আস্ফালনে
ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন বিরক্তি প্রকাশ।

মানুষ আগুন জ্বালে গুহা হতে বেরিয়ে তখন,
ভাত রাঁধে, যে নবজাতক তার কোলে
আমাদের দমবন্ধ টানেলে এ-জীবনে ক্রূর পরিহাস।

অনেক বিকৃতি নিয়ে আজ আমি হয়েগেছি সভ্যতার দাস।

সাধনায় প্রমত্ত সে নদী

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজটীকা ললাটে তার দেয় নাই কেহ
রক্তে তার নেই নীল বিষ, স্ব-অর্জিত অধিকার
আপন সামর্থ্য পৌরুষে ভূমিদখল ;
করুণা বালাই নিয়ে নতশির
নয় তার ভূমিস্পর্শ জানু,
দুর্বিনীত অনুজ তোমার একলব্য সাধনায়
বসেছে একান্তে অমোঘ শর-সন্ধানে ;
যদি চাও দক্ষিণা গুরুর
দিতে পারে উপহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অর্ঘ
নয় তার উন্নত মস্তক।
সে হেনেছে বারংবার আপনার বুকে
লক্ষ্য রেখে শর-শব্দ মর্মভেদী বাণ ;
হতে পারে তায় বিপর্যয়, ইন্দ্রের স্বর্গপতন
ভাগ্যের সৌভাগ্য লক্ষ্মী শ্বেতহস্তী ক্ষিপ্ত শরাঘাতে,
ঝঞ্ঝা ঝড় অশনি সংকেত
উল্কাপাত নক্ষত্রের বুকে, প্রলয়ের তূর্যনাদ।
তবু তার প্রত্যয় স্বাধীন
বিদ্ধ লক্ষ্যমুখে পারিজাত, করায়ত্ত
স্বর্গীয় সুষমা অমৃত লোকের আলো ;
সে ফিরেছে মানুষের ইতর সমাজে
দায় ভার কাঁধে নিয়ে লৌকিকের পথে
পেশল বাহুর পরে যার অধিষ্ঠান
তোমাদের রাজ্যপাট
ধন দৌলত, সম্ভ্রম যশের মিনার।
আনুগত্যে যদি তার ঘটাও বিভ্রাট
সূর্য অন্ধ কক্ষচ্যুত পৃথ্বি, স্বর্গ কাঁপে থর থর
রুদ্ররোষে ফুঁসে ওঠে বাসুকির ফণা ;

শিল্প-সৌধ ধ্বসে পড়ে,　　চিড় ধরে সভ্যতার বুকে
তালভঙ্গ হয় গানে　　মুদ্রাভুল নৃত্যে,
কবিতা নিষ্প্রভ　　যতিহীন
　　　　স্তম্ভিত শিল্পীর তুলি　　অনন্য বিস্ময় !

সে চিনেছে চেতনার ভিত্তিভূমি তার
করতলে তার সূর্য
　　　　ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়　　মুঠো মুঠো রৌদ্র ;
আত্মার কল্যাণ জ্ঞানে　　সহজে সে জানে
এই বাঁকে শীর্ণ যদি　　সুপ্ত করতোয়া
　　　　বাঁক ফিরে কলোচ্ছ্বাসে একদিন　　মাতবেই নদী ;
লুপ্ত হবে বুকে তার　　বহুধারা
　　　　উপ্ত বুকে স্বপ্ন-সুখ-স্মৃতি,
ক্ষয় লয় আছে নিত্য,　　আছে নিত্য জয় পরাজয় ।
উৎসে তবে　　কেন এতো কলরব
ভাগ্যের নির্বন্ধ তার　　লিখে যায় সে আপন হাতে
কালের কষ্টিপাথরে,　　ইতিহাস
　　　　মূর্তবাণী বিবৃতি কঠিন ;
সাধনায় প্রমত্ত সে নদী
　　　　এক বহু হয়ে যাবে　　সমুদ্র সঙ্গমে ।

সুন্দর

শুভ বসু

সুন্দর সবখানে থাকে ।　ছড়িয়ে ছড়িয়ে থেকে থাকে ।
ক্বচিৎ কখনো ছুঁয়ে যায় চেতনাকে ।

একা একা একা হাঁটছি কলকাতায়, রৌরবের মতন ফুটপাথে ।
চোখে মুখে অন্ধকার, মরণের ছাপ

স্পষ্ট ক'রে দেগে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
কঙ্কালের মতন মানুষ। একা একা একা হাঁটছি, ছায়া
আমার না কার ছায়া নির্বিকার পিছু পিছু হাঁটে।

কোথাও সুন্দর নেই, ভালোবাসা নেই কোনোখানে
এরকম কথা খালি ক্রমাগত মনকে গোলায়।

হঠাৎ মিছিল আনে আনিখিল অন্বয়, আততি ;
তখনি আশ্চর্য্যে দেখি মুহূর্তে ফুলের মতো ফোটে।
কিম্বা যাকে ভালোলাগে এরকম কোনো মহিলার
পাশে পা মিলিয়ে হাঁটছো, হঠাৎ বিজনে
আঁচল মশাল হ'য়ে জ্ব'লে
কেবলই মুহূর্তমাত্র সবদিকে দেখায় সুন্দর।

শেয়ালদা ষ্টেশনে দেখি একজন মধ্যবয়সিনী
লড়াই-এর মন্ত্রে স্থির, ফেরি
করেন মাজন ; মুহূর্তের এক ছবি আসে ঃ
ঝড় ঝঞ্ঝা এবং বিদ্যুতে
জনক্ষয় মানুষের প্রাণ
একজন প্রচণ্ড জেদে আগলে রয়েছেন।

কখনো কখনো খুব দুর্লভের মতো
আমাদের অন্ধকারে বিস্তারের ব্যথা এনে দিতে
কাছে আসে অনন্য, সুন্দর।

একটি নাম, একজন মানুষ

দীপেন রায়

আমিও কি মেনে নেবো অঙ্গরাজ্য
নাকি সমস্ত ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ !
কঠিন বাস্তবে তার বহুভাষা—বিভেদের নুড়ি,
কেবল একটি নদী আসমুদ্র জনপদে
বহুধা বিস্তৃত
আমি তার বাহুতে বাহুতে বহুশাখা উপশাখা নদী
দেশ-গ্রাম-শহর-বন্দরের
একই পশ্চাদ্‌ভূমি।
আবাল্য যৌবন মাত্র একটি নাম
একজন মানুষ
কখনো দুঃখ বা রাগে অবিচ্ছিন্ন একই প্রকৃতি।

না, আমি মানিনা এক অঙ্গরাজ্য,
যদি তাতে না থাকে সমুদ্র ঢেউ
তরঙ্গমালার নানান মানুষ
একটি নদীর ঢেউয়ের বিপুল বিস্তার
এবং এখানে আমার প্রাপ্য
ন্যায্য উত্তরাধিকারের
মুক্ত দুই হাতের তালুতে
রাখি ঐশ্বর্য গরিমা,
হাঁটি জন্মের মাটিতে,
আজন্ম কাঙ্ক্ষিত মাত্র একটি নাম
একজন মানুষ।

যখন যাবার বেলা

অমিয় ধর

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে"

ঈশোপনিষদ্

গতি ও স্থিতির মধ্যে 'জনস্থান প্রস্রবন গিরি'
টিলায় টিলায় ঢেউ,
রাঙচিতা পলাশের অনুরাগে সূর্যসখা
চলে গোরী গাগরি ভরণে তার কি আনন্দ কি সুখ !
অবাক বিস্মিত ফুলে মালাগাথা চলমান নদী
জানে সে-ও এ জীবন সোনাগাঁথা আহ্নিক-বার্ষিকে।
প্রাণের আঙ্গিনা জুড়ে কারুকার্যে রৌদ্র আর মেঘে
পাড়ে-পাড়ে কূলভাঙা স্নেহ-প্রেম মমতায়
ঝিকি-মিকি শুদ্ধ রসকলি
আখরে-আখরে তার
শুদ্ধসুরে দুলে ওঠে স্বপ্ন-সুখ-রাধা !

জীবন-মৃত্যুর স্রোতে,
এই দেহ, এমন কি চেতনা-ও এই ঘাটে
হিসাব নিকাশ সেরে চলে যাওয়া—
শুধু যাওয়া অনন্ত মাথুরে !
যখন যাবার বেলা
যেন রাত্রি ঢেকে দেবে
নতমুখ বৃক্ষশাখে ফোটা ফোটা কান্নায় শিশির।
যখন যাবার বেলা
চোখে তার
অবাক বিস্ময় নীল বেদনা কী সমুদ্র-মেঘের !

দুঃখ সংক্রান্ত

দুলাল ঘোষ

আমার দুঃখের দাপটে ছা-পোষা অস্তিত্বটাও কেমন
বে-সামাল হয়ে ওঠে
পুলিশ ইনসপেকটরের মুখের ওপর বলে বসে—
'মিছিলের নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করুন'

আমার দুঃখগুলো তখন সারিবদ্ধ বিশাল লাইন
শ্লোগানে মুখরিত অঞ্চল
দূরে ডিসট্যান্ট ল্যাম্পের চোখে
সকাতর অনুরোধ
ততোক্ষণে বিস্তীর্ণ তল্লাট জুড়ে ঘটে গেছে ট্রাফিক জ্যাম

আমার দুঃখগুলো একচ্ছত্র সম্রাটের মতো হেঁটে যায়
সন্ত্রস্ত স্কাইস্ক্যাপার নতজানু
রাইটার্স বিল্ডিং নিজের শরীরে লট্‌কে দেয়
শেষ ফতোয়া—
'কলকাতার রাজপথ থেকে তুলে নেয়া হলো কার্ফ্যু।'

কি করে বলবো আমি

বিপ্লব মাজী

কি করে
বলবো আমি
সময়টা ভালো যাচ্ছে
যখন
গাড়োয়ানের যুবতীঘরণী

লজ্জানিবারণের বস্ত্রের অভাবে
গায়ে কেরোসিন ঢেলে
শিশুপুত্রদের নিয়ে পুড়ে মরে
যখন
ধর্ষিতা বধূদের
বাঁচাতে যাওয়ার অপরাধে
হরিজনদের উলঙ্গ শরীর
প্রকাশ্যদিবালোকে ফাঁসিকাঠে ঝোলে
যখন
খাদ্যের অভাবে কৃষকরমণী
বুনোঘাস তুলতে গিয়ে
সাপকাটাইয়ে ঢলে পড়ে
রাত্রির অন্ধকারে
যখন
কারখানায় লকআউট, ছাঁটাই, লে-অফ
বস্তির ঘরে ঘরে
বিপর্যস্ত মানুষের চোখেমুখে
মৃত্যুর ভয়াল নখ হিংস্রভাবে ঢোকে
যখন
আত্মহত্যার একনাম
অগ্নিপরীক্ষা
যখন
লড়াইয়ের একনাম
অগ্নিপরীক্ষা
যখন
বেঁচে থাকার একনাম
অগ্নিপরীক্ষা
কি করে
বলবো আমি
সময়টা ভালো যাচ্ছে।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

(১৪৭৩-১৯৭৩)

শঙ্কর চক্রবর্তী

১৯৭৩ সালটি হল নিকোলাস কোপার্নিকাসের পঞ্চম জন্মশতবার্ষিকী বছর। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন যুগের পথিকৃৎ হলেন কোপার্নিকাস, যাঁর সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বধারণা (Heliocentric theory of the universe) আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন কোপার্নিকাস করেছিলেন, তা কোনো নতুন আবিষ্কারের জন্যে কিন্তু নয়—বরং বলা যেতে পারে একটি সঠিক ধারণাকে তিনি নির্বাচন করতে পেরেছিলেন বলেই এটা ঘটতে পেরেছিল। সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো তার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে—এ কথা খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় দুশ বছর আগে গ্রীক জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টার্কাসই সর্বপ্রথম বলেছিলেন। এই ধারণাটিকে একটি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ওপর দাঁড় করানো, এটাই ছিল কোপার্নিকাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

কোপার্নিকাস যে যুগে জন্মেছিলেন, তার পূর্বেকার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা মোটামুটি কি ছিল দেখা যাক। প্রাচীন ইয়োরোপের সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। পৃথিবীর প্রথম জ্যোতির্বিদ থেলিসের জন্ম এখানেই। খ্রীষ্ট জন্মাবার ৫৮৫ বছর আগে ২৮ মে তারিখে একটি সূর্য-গ্রহণের সঠিক ভবিষ্যতবাণী তিনিই প্রথম করতে পেরেছিলেন।

পিথাগোরাস

থেলিস মারা যাবার তিন বছর পরে জন্মান গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস। পিথাগোরাস তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের নিয়ে একটি গোপন চক্র গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তাঁরা যেসব বিষয় আলোচনা করতেন, তার কথা বাইরের লোকের জানার উপায় ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে কয়েকটি নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন পিথাগোরাস—যেমন পৃথিবী, সূর্য ও অন্য গ্রহগুলো বলের মতো গোলাকৃতি, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং চাঁদের

নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোতেই সে আলোকিত হয়। পিথাগোরাসের মতে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলো আকাশপথে ঘোরার সময় এক স্বর্গীয়, মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করছে। সে সঙ্গীত শুধু পিথাগোরাস ও তাঁর গোপন চক্রের সঙ্গীরাই নাকি শুনতে পেতেন।

অ্যারিস্টটল

পিথাগোরাসের দুশো বছর পরে মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটল চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহের গতির একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই বিষয়টিও অ্যারিস্টটলের নজর এড়িয়ে যায় নি। তিনি বললেন—সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ওরা কিভাবে চলছে, এই সমস্যার সমাধানের জন্যে অ্যারিস্টটল বলবেন, পৃথিবীর ওপর অনেকগুলো স্বচ্ছ মণ্ডল রয়েছে। ঐ মণ্ডলগুলোর মধ্যে চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগুলো যেন সেঁটে বসানো ; ওরা আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। সবচেয়ে বাইরের মণ্ডলটির গায়ে বসানো রয়েছে তারাগুলো। সবশুদ্ধ মণ্ডল আছে আটটি। এই মণ্ডলগুলোকে ঘোরানোর জন্যে অ্যারিস্টটল একটি নবম মণ্ডলের অস্তিত্ব কল্পনা করলেন। তিনি তার নাম দিলেন 'প্রাথমিক চালিকা শক্তি'।

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, একথা বলার জন্যে তখনকার দিনের মন্দিরের পুরোহিতেরা অ্যারিস্টটলের ওপর খুবই চটেছিল এবং তাদের তাড়নায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কালক্রমে অবশ্য অ্যারিস্টটলের ধারণাই স্বীকৃত হল। তখনকার পণ্ডিতেরা বলতেন, কোনো বিষয় নিয়ে কারো মনে সন্দেহ জাগলে অ্যারিস্টটল পড়লেই চলবে। আর অ্যারিস্টটলে যা নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও নেই।

আলেকজান্দ্রিয়া : পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান

এথেন্সে এমন একদল পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, যাঁরা ছিলেন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিরোধী। আঙ্কিক পদ্ধতির সাহায্যে কোনো বস্তুর পরিমাণ করার কাজ তাঁদের মতে দোকানদার বা ছুতোরদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকা উচিত। ফলে নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ বাধা পাচ্ছিল।

আফ্রিকা ভূখণ্ডে তখন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন হয়েছে। ঐ নগরীর স্থপতি এথেন্সের নতুন চিন্তার ধারক ও বাহকদের কাছে শহরের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। নতুন একদল বিজ্ঞানী মানুষের সঙ্গমতীর্থে পরিণত হল আলেকজান্দ্রিয়া। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় ইরাটসথেনিস, অ্যারিস্টার্কাস ও টলেমির।

ইরাটসথেনিস সহজ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর পরিধির যে মাপ পেলেন, তা হল ৩৮,৪০০ কিলোমিটার ; আধুনিক হিসেবে এই মাপ হল ৩৯,৭৮০ কিলোমিটার। অ্যারিস্টার্কাসের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

টলেমি : ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি তাঁর ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ধারণাকে উপস্থিত করলেন। অ্যারিস্টটল, হেরাক্লেডিস, হিপ্পার্কাস প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের ধারণাকে গ্রহণ করে টলেমি বললেন, পৃথিবীই হল বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। তিনি অ্যারিস্টটলের বিভিন্ন মণ্ডলকে বাতিল করে দিয়ে বললেন—গ্রহগুলো, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি মহাকাশে বৃত্তাকারে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। আকাশের বস্তুদের বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা প্লেটোর আমল থেকেই চলে আসছিল, যেহেতু বৃত্তই হচ্ছে একটি নিখুঁত ক্ষেত্র।

দূরবীনের আবিষ্কার ঘটতে তখনো বহু শতাব্দী বাকি, কিন্তু পরীক্ষা-মূলক পর্যবেক্ষণে টলেমির ছিল অসাধারণ দক্ষতা। তিনি দেখলেন, গ্রহগুলোর বৃত্তাকার কক্ষপথের মধ্যে নানারকমের বিচ্যুতি ধরা পড়ছে। সেই বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দেবার জন্যে তিনি বললেন, গ্রহগুলো একটি ছোট বৃত্তাকার পথে ঘুরছে, যাদের বলা হল epicycle। এই epicycle-গুলোর কেন্দ্র আবার পৃথিবীর চারদিকে একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরে চলেছে, যার নাম দেয়া হল deferent। এতসব সত্ত্বেও টলেমি গ্রহদের আবর্তন সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারেন নি।

পৃথিবীর চেহারাটা যে বর্তুলাকৃতি, এটা টলেমি জানতেন, কিন্তু পৃথিবীর কোনোরকম গতির কথা তিনি স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। পৃথিবী যদি নিজের অক্ষের ওপরে ঘুরতে থাকে, তাহলে ওর বায়ুমণ্ডলটা যে পেছনে পড়ে থাকবে! বাতাসে উড্ডীন পাখিগুলোও কি তাহলে পেছিয়ে পড়বে না?

আর পৃথিবীর সামনের দিকে এগিয়ে চলা ব্যাপারটাও যে অসম্ভব, কারণ তাহলে পৃথিবী স্বর্গমণ্ডলে ওর কেন্দ্র থেকেই কি বিচ্যুত হয়ে বসবে না ?

বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে টলেমির বিশ্বধারণার অনেকখানি মিল ছিল, তাই তাঁর মত পরবর্তীকালে বহুলভাবে প্রচারিত হবার সুযোগ পায়। এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অধিকারও কারো থাকল না। সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে টলেমির মতের রাজত্ব চলল। পণ্ডিতেরা এই ধারণার ওপরে মাঝে মধ্যে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন মাত্র। তবে যতদিন যাচ্ছিল, অনেক ঘটনার যেমন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের অবস্থানগত সঠিক ব্যাখ্যা টলেমির হিসেবের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল না।

নতুন যুগের সূচনা

খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ সাল হল ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ। এযুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে ধ্যানধারণাগুলোও ছিল অসংলগ্ন। গ্রীক পণ্ডিতদের অবদানও বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আরবেরা টলেমি, অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতদের রচনাবলী নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে তাঁদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। আরবদের কাছ থেকে ইয়োরোপের মানুষ কয়েক শতাব্দী বাদে আবার নতুন করে সেগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টানটিনোপলের ওপর তুর্কীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখান থেকে দলে দলে গ্রীক পণ্ডিতেরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইতালির বিভিন্ন জায়গায় এসে বসবাস শুরু করেন। এঁদের আগমনে সমগ্র ইতালি জুড়ে অধ্যয়ন এবং গবেষণার এক নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। পুরনো পুঁথিপত্রের পুনরুদ্ধারের ফলে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তা এবং চেতনার সূচনা হয়, যার ঢেউ ইতালি ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে যায়।

কলম্বাস এবং ভাস্কো দা গামার নতুন দেশ আবিষ্কারের সফল অভিযানও ইতিমধ্যে ঘটেছে। সমুদ্রযাত্রী নাবিকেরাও সাগরে দিক নির্ণয়ের জন্যে নতুন 'নক্ষত্র চার্ট' এবং যন্ত্রপাতির দাবি জানাতে শুরু করেছিল। এই সব ঘটনা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পুঁথিপত্রের ব্যাপক প্রচার জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সঞ্জীবিত করে তোলে। এই সম্ভাবনাময় যুগেই কোপার্নিকাস জন্মগ্রহণ করেন।

কোপার্নিকাস

১৪৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পোল্যাণ্ডের তোরুন শহরে কোপার্নিকাসের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন ঐ শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তোরুনের যে বিদ্যালয়ে কোপার্নিকাসের শিক্ষাজীবন শুরু, সেখানকার পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যাও ছিল।

কোপার্নিকাসের বয়েস যখন দশ, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মাতুল লুকাতস ওয়াটজেনরোড বালক কোপার্নিকাস এবং তাঁর আরো তিনটি ভাই-বোনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। কোপার্নিকাসের জীবনে তাঁর এই মাতুল এক অতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াটজেনরোড ছিলেন গির্জার একজন বিশপ এবং পোল্যাণ্ডের একটি বড় প্রদেশের শাসনকর্তা। তাঁর ভাগনেটি যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে, সেদিকে তাঁর বিলক্ষণ নজর ছিল। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কোপার্নিকাস পোল্যাণ্ডের রাজধানী ক্র্যাকাউ শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। ওখানে জ্যোতির্বিদ্যার পঠনপাঠনের যদিও একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল কিন্তু মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বাইরে বিশেষ কিছু জানার অবকাশ ছিল না। ক্র্যাকাউতে তখন ছিলেন প্রখ্যাত পোলিশ অঙ্কশাস্ত্রবিদ অ্যালবার্ট ব্রুদজেবস্কি, যাঁর প্রেরণায় কোপার্নিকাস জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে গোড়াপত্তন যেমন তাঁর এখানে হয়, তেমনি সেযুগের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং আকাশ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিও তিনি এখানেই শেখেন। ক্র্যাকাউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোপার্নিকাস কোনো ডিগ্রি গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

কোপার্নিকাসের মাতুল তাঁর ভাগনেটিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ফ্রাউয়েনবুর্গে তাঁর নিজের গির্জায় ক্যাননের একটি পদ খালি হলে সেখানে তাঁকে ঢোকাতে চাইলেন, কিন্তু স্বয়ং পোপের একজন নিজস্ব প্রার্থী থাকার ফলে আপাততঃ তাঁকে নিরস্ত হতে হল।

জীবিকা অর্জনের জন্যে কোনো মানুষকে পুরোহিত বা গীর্জার চাকরি গ্রহণ করতে হবে, এটা আমাদের কাছে বর্তমানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে খুব কম লোকেই সেটা ভাবত। চার্চের জীবনেও তখন নানাধরণের টানাপোড়েন চলছিল। কোপার্নিকাস যখন তাঁর মধ্যজীবনে পৌঁছেছেন, তখন মার্টিন লুথার রোমের পোপের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে

নিজের প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়কে গঠন করলেন। কোপার্নিকাস ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে—চার্চের ভেঙে যাওয়ার ঘটনা তাঁর শেষ জীবনটাকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল!

ফ্রাউয়েনবুর্গ গীর্জায় আর একটি পদ খালি হওয়া পর্যন্ত ভাগনেকে বসিয়ে না রেখে ওয়াটজেনরোড ইটালির বোলোনা শহরে আইন পড়ার জন্যে তাঁকে পাঠালেন। চার্চেই যখন শেষ পর্যন্ত কোপার্নিকাসকে ঢুকতে হবে, তখন তার নিজস্ব আইনকানুনগুলো জেনে নিলে ভালো হয় না কি?

বোলোনা ঃ জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম পাঠ

কোপার্নিকাস ১৪৯৬ সালে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্চের আইন পড়তে এলেন। আইন তাঁর পাঠ্য বিষয় হলেও বিজ্ঞানের আরো দুটি বিষয়—অঙ্ক এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর পড়াশুনো শুরু করলেন। বোলোনাতে তাঁর ওপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেখানকার জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক ডোমেনিকো ম্যারিয়া দ্যা নোভারা। ডোমেনিকো এবং কোপার্নিকাস একসঙ্গে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন (দূরবীণের আবিষ্কার তখনো ঘটে নি) এবং পুরনো টলেমীয় ধারণাকে কি ভাবে সংস্কার ও উন্নত করা যায়, তার সরলীকরণই বা কি ভাবে করা যায়—এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা করতেন।

পুরনো যুগের গ্রীক বৈজ্ঞানিক চিন্তার পুনরুদ্ধারের যে বিরাট কর্মযজ্ঞ সমগ্র ইটালি ও উত্তর ইয়োরোপ জুড়ে শুরু হয়েছিল, ডোমেনিকো ছিলেন তার একজন পথিকৃৎ। এই নতুন কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়েছিল জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও, যেখানে সরল জ্যামিতিক ছক বা বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচিত বিশ্বের একটি ছবি রচনার কাজে বিশেষজ্ঞেরা নেমে পড়েছিলেন। স্বভাবতই ডোমেনিকোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জ্যোতির্বিদ্যাকেও একই ধারায় ঢেলে সাজাবার কাজে কোপার্নিকাসকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে।

বোলোনাতেই কোপার্নিকাস প্রথম সুপরিকল্পিতভাবে আকাশের একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। পরীক্ষাটা ছিল, চাঁদ ঠিক যখন আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অ্যালডেবারানের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে ওকে আড়াল করে ফেলবে, সেই সময়টিকে লিপিবদ্ধ করা। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্ব ধারণার একটি হিসেবকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, টলেমির হিসেবের মধ্যে ভুল ছিল।

টলেমির ভূকেন্দ্রিক ধারণা যে সঠিক নয়, এটা কোপার্নিকাস বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ভাবতেন, পৃথিবীর জমিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে যে কোনো মানুষের মনে হতে পারে, সূর্য ও গ্রহগুলো পৃথিবীরই চারদিকে ঘুরে চলেছে। তেমনি সূর্যের বুকে দাঁড়িয়েও (অবশ্য তা যদি সম্ভব হয়) কি সেই মানুষটির মনে হবে না যে, আকাশের গ্রহগুলোও সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে? সাধারণ চিন্তা এবং বুদ্ধিতে প্রথমোক্ত ধারণাটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে হবে, যেমন টলেমির আমল থেকে সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর ধরে তাই মনে হয়েছিল। সেই ধারণার মূলোৎপাটনের জন্যে আঙ্কিক সূত্রের ওপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দাঁড় করাতে হবে।

১৫০০ সালে কোপার্নিকাস রোমে এলেন। উদ্দেশ্য, আইনের অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়া এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা দেয়া। ঐ বছরই নভেম্বরের পাঁচ তারিখে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আর একটি চন্দ্রগ্রহণকে পর্যবেক্ষণ করেন।

ইতিমধ্যে কোপার্নিকাসের প্রতিষ্ঠাবান মাতুল তাঁর নিজের এলাকা ফ্রাউয়েনবুর্গে ভাগনের জন্যে গীর্জায় একটি ক্যাননের চাকরি সংগ্রহ করে ফেলেছেন। তখনকার দিনের নিয়ম অনুসারে গীর্জার যে কোনো উচ্চ পদাধিকারীর ওপর কিছু অঞ্চলের শাসনকাজের দায়িত্বও ন্যস্ত করা হত। সেই সুবাদে কোপার্নিকাস দুটি মোটামুটি বড় শহর এবং বেশ কয়েকটি গ্রামের শাসনের কর্তৃত্ব লাভ করলেন।

গীর্জার চাকরির জন্যে কোপার্নিকাসকে মাঝে আইন পড়া স্থগিত রাখতে হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আইন অধ্যয়নের অনুমতি আবার মিলল, অবশ্য একটা শর্তে—আইনের সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যাও পড়তে হবে।

পাদুয়া

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে কোপার্নিকাস ১৫০১ সালে এলেন ইটালির পাদুয়াতে। এখানে অধ্যয়নকালীন অবস্থায় লোরেনজো ভাল্লার লেখা একটি বই তাঁর হাতে পড়ল। বইটিতে গ্রীকপণ্ডিত ফিলোলাওস সম্বন্ধে প্লুটার্কের একটি উক্তি পড়ে তিনি বিস্মিত হলেন, যেখানে তিনি বলছেন—পৃথিবী, সূর্য এবং চন্দ্র একটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। আর একটি উক্তি ছিল অ্যারিস্টার্কাস সম্বন্ধে—তিনি নাকি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী

সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই সব কথারই আমরা প্রতিধ্বনি পাই পরবর্তীকালে প্রকাশিত কোপার্নিকাসের বিখ্যাত গ্রন্থে।

চিকিৎসাবিদ্যায় কোনো ডিগ্রি কোপার্নিকাস নেন নি। একজন পাদরীরূপে সাধারণ মানুষের ছোটখাট অসুখ সারাবার মতো পারদর্শিতাই ছিল যথেষ্ট। সার্জারি তিনি শেখেন নি। অ্যানেসথেসিয়ার আবিষ্কার তখনো ঘটে নি, কাজেই সে যুগের সার্জারি ছিল প্রায় একটি ভয়াবহ ব্যাপার। পাডুয়াতেই কোপার্নিকাস তাঁর আইনের পড়াশুনো চালিয়ে গেলেন এবং ১৫০৩ সালে গীর্জার আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন। মাতুলের চিন্তা, নতুন চাকরিতে কোপার্নিকাস এত বেশি জড়িয়ে পড়বেন যে ওর অন্য পড়াশুনো বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে কোপার্নিকাসের সঙ্গও তাঁর বিশেষভাবে কাম্য ছিল। যে অঞ্চলটির শাসনকর্তৃত্ব তাঁর হাতে রয়েছে, কোপার্নিকাস কাছে থাকলে তার সুষ্ঠু প্রশাসনের ব্যাপারেও ভাগনের পরামর্শ এবং সাহায্য নিতে পারবেন। বিশপের ক্ষমতাবলে তিনি ভাগনেকে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। কোপার্নিকাস তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে ছ-বছরের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলেন।

মাতুলের সুদক্ষ অভিভাবকত্বে কোপার্নিকাস রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে শিক্ষানবিশি করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য জ্যোতির্বিদ্যার কাজ তাতে এতটুকুও ব্যাহত হয় নি।

সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব

১৫০৭ সালে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হিসেবে কোপার্নিকাস 'আকাশের বস্তুদের গতিবিধি সংক্রান্ত তত্ত্বের ওপরে মন্তব্য', এই নামে কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছোট হাতে-লেখা পুস্তিকা তাঁর বন্ধুস্থানীয় কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করলেন। পুস্তিকাটিতে পরিষ্কারভাবে যে তত্ত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল, তার মোদ্দা কথাটা ছিল এই যে পৃথিবীর কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্র নয়, এ হল পৃথিবীর অভিকর্ষের (অভিকর্ষের আসল ব্যাপারটা কোপার্নিকাসের জানা ছিল না। নিউটনই পরে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।) কেন্দ্র এবং চন্দ্রের কক্ষপথের কেন্দ্র। সমস্ত স্বর্গীয় বস্তু সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে এবং সূর্যই রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রের কাছাকাছি। পৃথিবী একটি দিনে তার দুই মেরুর চারপাশে একটি আবর্তনকে সম্পূর্ণ করে থাকে।

কোপার্নিকাসের জ্যোতির্বিদ্যার মূলে রয়েছে পৃথিবীর তিন ধরনের গতির কথা : (১) আহ্নিক গতি, যার ফলে পৃথিবীর দিন এবং রাতের পালাবদল ঘটছে (২) সূর্যের চারপাশে বার্ষিক গতি (৩) পৃথিবীর অক্ষের অয়নচলন (precession)—একটি লাটিম ঘুরপাক খাবার সময় ওর মাথাটা যেমন দুপাশে আন্দোলিত হতে থাকে, এ হল সেই ধরনের গতি।

কোপার্নিকাসের মত অনুসারে, সূর্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি (বাকি তিনটি গ্রহের তখনো আবিষ্কার ঘটে নি)।—এই ছটি গ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়, পশ্চিমদিকে অস্ত যায়—আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সূর্যই গতিশীল। কিন্তু আসল কথা হল, পৃথিবী আপন অক্ষদণ্ডের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তার ফলেই দিন ও রাতের পালাবদল ঘটছে। পৃথিবী যদি খাড়াভাবে সূর্যের চারপাশে ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি দিনের পরিমাণ হত সমান এবং সূর্যকেও আমরা মোটামুটি একই পথ ধরে চলতে দেখতুম। পৃথিবীর এই গতিকে আমরা বলি আহ্নিক গতি। কিন্তু পৃথিবীর দুই মেরুর সংযোগরেখা তার খাড়া অবস্থা থেকে ২৩½ ডিগ্রি হেলে থাকার জন্যে সূর্য ছয় মাস উত্তর গোলার্ধের ওপর ও বাকি ছয় মাস দক্ষিণ গোলার্ধের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরই ফলে পৃথিবীতে ঋতুর পালাবদল ঘটে এবং দিন ও রাত হয় ছোট ও বড়। মহাবিশ্বের যে ব্যাপ্তির কথা কোপার্নিকাস বললেন, তাও ছিল পূর্বের ধারণার তুলনায় অনেক বিশাল।

কোপার্নিকাসের হাতে-লেখা পুস্তিকার মতামত ইয়োরোপের পণ্ডিতমহলে গুঞ্জনধ্বনি তুলল। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করার ফলে নানা অভিযোগ শোনা গেল। চার্চের কর্তৃপক্ষ কোপার্নিকাসকে তাঁর ধারণার কথা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্যে বলে পাঠালেন। কিন্তু কোপার্নিকাস তাতে রাজী নন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। টলেমির বিশ্বমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণার কথা বিশদভাবে প্রকাশ করে তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন থেকে বঞ্চিত হতে চান না।

জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা ছাড়াও আরো নানা কাজ করেছেন কোপার্নিকাস। পোল্যাণ্ডের প্রতিবেশী একটি অঞ্চল ছিল টিউটনিক অর্ডারের নাইটদের হাতে, যাদের সঙ্গে কোপার্নিকাসের জীবদ্দশাতেই পোল্যাণ্ডকে বারকয়েক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। দুটি রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকার এক বিস্তৃত অঞ্চলের একটি ম্যাপ

কোপার্নিকাস তৈরী করেছিলেন। এই ম্যাপটি চুরি করার জন্যে টিউটনিক নাইটরা গুপ্তচর পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল, যদিও তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

মুদ্রাসঙ্কট ও তার সূত্র

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে টিউটনিক অর্ডারের নাইটদের তের বৎসরব্যাপী এক যুদ্ধের অবসানের পর সমগ্র প্রুসিয়া জুড়ে এক বিচিত্র ধরণের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রুসিয়ার মুদ্রার বাজার দর এবং ইজ্জত দুইই পড়তে শুরু করে। কারণটা আর কিছুই নয়, কর্তৃপক্ষ সোনা ও রুপোর মুদ্রার মধ্যে ঐ দুর্লভ বস্তু দুটিকে যতটা সম্ভব কম পরিমাণে রেখে আপাতত বেশ কিছুটা মুনাফা লুটে নেবার তালে ছিলেন। ফলে জিনিসপত্রের দাম যেমন বেড়ে যাচ্ছিল তেমনি বিদেশী ব্যবসায়ীরাও তাদের সামগ্রীর পরিবর্তে ঐ মুদ্রা নিতে রাজী হচ্ছিল না।

কোপার্নিকাস এই মুদ্রা সংকটের একটা সমাধান দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বললেন, চাষী যদি অতিরিক্ত লাভের জন্যে ভালো বীজের পরিবর্তে সস্তার অজুহাতে খারাপ বীজ দিয়ে চাষের কাজ শুরু করে, তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায়, প্রুসিয়ার মুদ্রার বর্তমান ইজ্জতহানির ব্যাপারটাও সেরকম। তিনি বললেন প্রুসিয়া, পোল্যাণ্ড ও টিউটনিক নাইটদের এলাকা সব অঞ্চল জুড়ে একই ধরণের মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হোক। একজন কর্তৃপক্ষই মুদ্রাগুলো বাজারে ছাড়বেন ও চলতি মুদ্রার পরিমাণকেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করবেন। প্রতিটি মুদ্রার মধ্যে সোনা বা রুপোর পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে বজায় রাখতে হবে এবং এই নির্দিষ্ট মাত্রার কমে যে সব মুদ্রা বাজারে চালু করা হয়েছে সেগুলি সব ফিরিয়ে নিতে হবে। কোপার্নিকাস মুদ্রা সম্পর্কিত নানা ধরনের বাটপাড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে বোঝা যায়। খারাপ টাকার সাহায্যে ভালো টাকাকে বাজার থেকে তাড়ানোর এই যে প্রবণতা, যা পরবর্তীকালে আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে 'Gresham's law' নামে পরিচিতি লাভ করে, তার মূলসূত্র কিন্তু কোপার্নিকাসই উদ্ভাবন করেছিলেন।

কোপার্নিকাসের প্রস্তাব কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আদৌ কানে তুললেন না, কারণ চালু ব্যবস্থায় তাদের লাভের অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলছিল।

টিউটনিক অর্ডারের নাইটদের সঙ্গে তের বছর লড়াইয়ের পর কোপার্নিকাসের নিজস্ব শাসনাধীন অঞ্চলের জনসাধারণও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিধ্বস্ত

অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্যে, বিশেষ করে চাষীদের চাষ-আবাদের কাজে বিভিন্ন উপকরণকে সরবরাহ করে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কোপার্নিকাস চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি।

রুটির দাম যাতে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উর্ধ্বমুখী করে তাদের বিপন্ন অবস্থার মধ্যে না ফেলতে পারে, তার জন্যে কোপার্নিকাস একটি 'Bread tax'-এর পরিকল্পনাও তৈরি করেছিলেন।

আকাশের বস্তুদের আবর্তন

১৫১২ সালে মাতুলের মৃত্যুর পর কোপার্নিকাসকে পুরোপুরিভাবে পাদরী জীবনের কাজ শুরু করতে হল। ফ্রমবর্ক জায়গাটি হল তাঁর আবাসস্থল। যে গ্রন্থটির জন্যে কোপার্নিকাস অমরত্ব লাভ করেছেন, তার কাজ শুরু হল এখানেই। ১৫১৮ সাল থেকে কোপার্নিকাস তাঁর গ্রন্থের জন্যে পৃথিবী ও গ্রহদের আবর্তন সংক্রান্ত আঙ্কিক তত্ত্ব উদ্ভাবনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। গ্রন্থের রচনা শেষ হয় ১৫৩০ সালে। লাতিন ভাষায় লেখা, নাম 'দ্য রেভোলিউশনিবাস অরবিয়াম সিলেসটিয়াম' বা 'আকাশের বস্তুদের আবর্তন বিষয়ক গ্রন্থ'। টলেমির 'আলমাজেস্ট', নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' এবং ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এর সমতুল্য এই রচনাটি। রচনার প্রথম অংশের প্রথম চারটি অধ্যায়ে কোপার্নিকাস যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো হল—এই বিশ্ব এবং পৃথিবী বর্তুলাকৃতি, জল ও স্থলের সমবায়ে কিভাবে এই পৃথিবী গড়ে উঠেছে এবং আকাশের বস্তুদের গতি হল নিয়মিত, বৃত্তাকার এবং অবিচ্ছিন্ন। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ছিল—পৃথিবীর কী একটি বৃত্তাকার গতি রয়েছে এবং পৃথিবীর সঠিক অবস্থান। এই অধ্যায়েই কোপার্নিকাস তাঁর নতুন ধারণার কথা প্রকাশ করেন। তত্ত্বকথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোপার্নিকাস নিখুঁত আঙ্কিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বর্তুলাকৃতি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক আলোচনা—আকাশের কোনো বস্তুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়, নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতার মাপ বিচার ইত্যাদি যার অংশীভুত। গ্রন্থের তৃতীয় অংশে রয়েছে পৃথিবীরগতির বিস্তৃত আলোচনা, চতুর্থ অংশে চাঁদের গতি সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে সূর্যের চারপাশে গ্রহদের আবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কোপার্নিকাস তাঁর গ্রন্থে পূর্বসূরীদের বহু পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এইসব তথ্যের মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যাওয়ার ফলে তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় বেগ পেতে হয়েছে।

গ্রহদের কক্ষপথের চেহারা

বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহদের আবর্তনসংক্রান্ত যে বিচ্যুতি টলেমির কাছেও ধরা পড়েছিল এবং epicycle-এর সাহায্যে যার অপনোদনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কোপার্নিকাস সেই বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন এটা ধরা পড়ছে কক্ষপথে পৃথিবীর নিজস্ব গতির জন্যে। ফলে জটিলতা খানিকটা সরলীকৃত হল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমস্ত সংশয়ের নিরসন হল না। আসল ত্রুটিটা রয়ে গিয়েছিল গ্রহদের কক্ষপথের চেহারা বৃত্তাকার এই ধারণার মধ্যেই ; ঐ কক্ষপথের চেহারা যে আসলে উপবৃত্তাকার—এই আবিষ্কার পরবর্তীকালে প্রতিভাবান জ্যোতির্বিদ কেপলারের গবেষণার অপেক্ষা করছিল, যাঁর চতুর্থ জন্ম শতবার্ষিকী বৎসর উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৯৭২ সালে।

কোপার্নিকাস বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর জায়গায় স্থাপন করেছিলেন সূর্যকে এবং সূর্যকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন স্থির, গতিহীন একটি বস্তু হিসেবে। বর্তমানে আমরা জানি এ ধারণাটা সঠিক নয়। সূর্য তার গ্রহজগতকে নিয়ে স্যাজিটেরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ৭২ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে এবং ছায়াপথ নামে যে বিশ্বে আমরা বাস করি, সূর্য তার কেন্দ্র থেকে রয়েছে ৩৩০০০ আলোক-বর্ষ দূরে।

পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্যে কোপার্নিকাস নিজে কিছু যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, পটুত্বের বিচারে সেগুলি খুব উন্নত পর্যায়ের ছিল একথা বলা যায় না। কোপার্নিকাস নিজেও সেটা জানতেন। তা সত্ত্বেও গ্রহদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে তিনি যথেষ্ট নিখুঁতভাবে (শতকরা ১ ভাগেরও কম ত্রুটিসমেত) নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। পরিমাপের সাহায্যেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, কেন্দ্র থেকে সূর্য ঠিক সৌরজগতের কেন্দ্রে নেই, সামান্য একটু দূরে রয়েছে।

কোপার্নিকাস তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরিমাপের মধ্যে ১০ 'মিনিট অফ আর্কে'র মতো সূক্ষ্মতা অর্জন করতে পারলেই তিনি যথেষ্ট

খুসী হবেন—পিথাগোরাস তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত জ্যামিতিক উপপাদ্যটি আবিষ্কার করে যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছিলেন, তার চেয়ে কিছু পরিমাণে কম নয়। একটি চার আনিকে ৬ মিটার দূরে রাখলে দর্শকের অক্ষিগোলকের সঙ্গে বস্তুটি যে কোন রচনা করবে, তার মাপ হল ১০ 'মিনিট অফ আর্ক'। আধুনিক দূরবীনের সাহায্যে আকাশে যে কোনের পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে, তা হল এক 'সেকেণ্ড অফ আর্কে'র একশ' ভাগের এক ভাগ। চার আনিটিকে ৩৬০ কিলোমিটার দূরে রাখলে অক্ষিগোলকের সঙ্গে যে কোন তৈরি হবে এ হল তার পরিমাপ। দূরবীনের আবিষ্কারের পর পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা কতটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে নিয়ে কোপার্নিকাস ১৫০৭ সালে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন, ১৫২৫ সালে তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার পর ইয়োরোপের বিদ্বজ্জনের কাছে কোপার্নিকাস সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মূল গ্রন্থটির জন্যে সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মূল গ্রন্থের রচনা ১৫৩০ সাল নাগাদ শেষ হলেও কোপার্নিকাস বারে বারে সেই পাণ্ডুলিপির সংশোধন করে চললেন। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে তিনি কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এই আশংকাতেই তিনি হয়তো এ ব্যাপারে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

রেটিকাস

১৫৩৯ সালে রেটিকাস নামে এক তরুণ জার্মান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের কাছে এলেন, উদ্দেশ্য তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে বিশদভাবে পরিচিত হওয়া। রেটিকাস কোপার্নিকাসের বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছ থেকে প্রায় একরকম জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে জার্মানির এক ছাপাখানা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘকাল বাদে বইখানা ছাপা হয়ে যখন কোপার্নিকাসের কাছে এসে পৌঁছল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কোপার্নিকাস মারা যান ১৫৪৩ সালের ২৪ মে তারিখে এবং বইখানিও নাকি এসে পৌঁছোয় সেইদিনই। কোপার্নিকাস প্রকাশিত গ্রন্থটিকে চোখে দেখে যেতে পারেন নি, কারণ তার কয়েকদিন আগে থেকেই তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে ছিলেন।

রেটিকাসের উদ্যোগ ছাড়া কোপার্নিকাসের গ্রন্থ কোনোদিন প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ। সামান্য একটু ভুল করে ফেলেছিলেন কোপার্নিকাস। যে

মানুষটির ভূমিকা তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেই রেটিকাসের প্রতি তিনি তাঁর গ্রন্থে কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। সম্পূর্ণ ভুলবশতই হয়তো এই ত্রুটিটুকু ঘটেছিল, কারণ জীবনে এবং কর্মে কোপার্নিকাস ছিলেন এক অতি মহৎ মানুষ।

নতুন চিন্তা ও যুগের সূচনা

কোপার্নিকাসের গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ভাবজগতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হল। ক্যাথলিক চার্চ এবং মার্টিন লুথার কোপার্নিকাসের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও পেছিয়ে রইলেন না। কিন্তু স্রস্টা তখন সমস্ত নিন্দা ও অপবাদের বাইরে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

কোপার্নিকাস তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের মধ্যে সৌরজগতের বিজ্ঞানসম্মত এক পরম সরলীকৃত ছবিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক চিন্তা ও বিচারপদ্ধতির নিরিখে ঐ তত্ত্বের মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া গেলেও সে যুগের ধ্যানধারণা এবং চিন্তাজগতে তা যে বিরাট বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মতো সম্পূর্ণ নতুন একটি দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে যে নতুন যুগের প্রবর্তন করলেন কোপার্নিকাস, পরবর্তীকালে তা কেপলার, গ্যালিলিও, ব্রুনো, নিউটন প্রভৃতি মহারথীদের অবদানে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার চোখ ধাঁধানো সব আবিষ্কারের মধ্যে এই পূর্বসূরীদের আমরা যেন ভুলে না যাই—বৈজ্ঞানিক চিন্তাক্ষেত্রে এক নতুন রেনেসাঁর প্রবর্তনে যাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আধুনিক সাহিত্য, প্রগতি সাহিত্য, এস্টাব্লিশমেণ্ট

তরুণ সান্যাল

বন্ধুবর অমিতাভ দাশগুপ্তের লেখা 'সারথি, পথ দেখাও তুমি অর্জুনকে' পড়েছি। খুব রাগী লেখা। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তিনি লিখেছেন। লিখেছেন নানা বাণিজ্যসফল, লেখা বন্ধ করে দেওয়া, লেখার জগতে কোনোক্রমে টিকে থাকা এবং লেখার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান নানা বর্গের লেখকদের কথা। আমি পাঠক হিসেবে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অমিতাভর এ-প্রবন্ধটির হাল্কা রচনারীতিটি পছন্দ করছি না। এমন-কি তাঁর বিভিন্ন লেখক বিষয়ে বিশেষণ বা মন্তব্য অনেক সময় আমার কাছে অবান্তর মনে হয়েছে। সে যাই হোক। তাঁর লেখাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কেই আমার এই লেখা। পাঠক হিসাবেই আমি ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখছি। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসাবে নয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত সাহিত্য-পরিবেশের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেন। সুতরাং তাঁর লেখার মধ্যে যে তাঁর অভিজ্ঞতার নানা প্রকাশ রয়েছে এ কথাটা প্রথমেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার আপত্তি তাঁর প্রবন্ধটির কোন কোন বিষয়ে, বা সাম্প্রতিক সাহিত্য বিষয়ে আমার বক্তব্যই বা কি তা সময়মতো বলা যাবে।

অমিতাভর লেখাটির সার সংক্ষেপ মোটামুটি এ রকম : সময় লেখকদের খাদকের মতো তাড়া করে ফিরছে। তাড়া করার ফল হিসাবে লেখক "অবলীলায় অচিন্তায়" "অনর্গল" লিখে যাচ্ছেন বাজারি পণ্যের মতো নানা রচনা। এই সব রচনায় দায়বদ্ধ ক'রে "অদৃশ্য ঈশ্বর"রূপী কোনো সাহিত্য-এস্টাব্লিশমেন্ট একদা-বিদ্রোহীকে ঠাণ্ডা বানিয়ে গড়ে তুলছে তার বশংবদ ভৃত্য। সত্যিকারের বিদ্রোহী সম্পর্কে তাদের নীতি : "কিল হিম বাই সাইলেন্স"। সাচ্চা বিদ্রোহীরা এই চাপের কাছে ঘাড় নোয়াতে অস্বীকার করে থেমে যাচ্ছেন লিখতে। প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ লেখকের পাণ্ডুলিপি। বড়ো লেখক লিখছেন স্বল্পজনপাঠ্য ছোট কাগজে। অথচ একদল শূন্যকুম্ভ হয়ে গেলেও এখনো তাঁরা লিখেই চলেছেন—পাঠকরা তাঁদের যদিও বিদায় জানিয়ে

দিয়েছে। এই নিদারুণ নৈরাজ্যের অবস্থায়-যে প্রতিরোধযোগ্য সংগঠন গড়া যাবে তাও প্রায় নানা কারণে দুষ্কর। কেননা প্রগতিশীলদের অনেকেই "মুখে মার্কসবাদী হলেও চরিত্রে ট্রট্স্কাইট"। তাই তাঁরা কার্যত ঐক্যবদ্ধ সাহিত্য-ফ্রণ্ট গড়ে তোলার পরিপন্থী। আর সেই সুযোগে "মুক্ত সাহিত্যের ফিরিঅলা"দের সঙ্গে মিলেমিশে "সারা জীবনের" প্রগতিবিরোধীরা রাতারাতি ভয়ঙ্কর প্রগতিশীল হয়ে "পয়লা সারির সংগ্রামীর কক্ষে পাচ্ছেন"। অর্থাৎ প্রগতিশীলদের শিবিরেও এখন নিদারুণ নৈরাজ্য। এমন পরিস্থিতিতে কি 'দেশ' কি 'পরিচয়' সব জায়গাতেই বিগ্রহ-প্রতিমরা লিখছেন বলে প্রতিশ্রুতিময় তরুণ আগন্তুকদের আর লেখবার জায়গা হচ্ছে না।

জানি না, লেখাটি এমন সারসংক্ষেপ অমিতাভ পছন্দ করবেন কিনা। তবে তাঁর নানা রাগী মন্তব্যের জঙ্গল সরিয়ে আমার কাছে এমনটাই প্রবন্ধটির নির্গলিতার্থ মনে হয়েছে।

অমিতাভ চতুর্দিকে নৈরাজ্য দেখছেন। আর টন টন সাহিত্য-পণ্যের যোগানদার 'ঈশ্বররূপী' এস্টাব্লিশমেন্টকেই মুখ্যত এই নৈরাজ্যসৃষ্টির নাটের গুরু বলে মনে করেছেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সত্যি কথাই লিখেছেন অমিতাভ। কিন্তু আপাত বহিরঙ্গের মোড়ক ছাড়িয়ে অন্তঃস্থলটি নিয়ে তিনি কোনো সতর্ক বিচার করেন নি। আসলে সেটাই তো আলোচনার বিষয় হবার কথা। অন্তঃস্থল হল প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ। এবং নির্বিতর্কে 'আধুনিকতা'র নামে আমরাও প্রগতিপন্থী বা সমাজতন্ত্রীরাও সে জালে কেমন জড়িয়ে পড়েছি।

লেখকরা সময়ের পেটের ভেতর ঢুকে পড়েছেন সবাই? অমিতাভ এই "সময়" বলতে হয়তো বুঝেছেন আজকের সাহিত্যের হালচালের দিকটা। আসলে সময়ের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ার তো অন্যতর অর্থ আছে। যা কিনা, যুগের ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার তাৎপর্যে অন্বিত হওয়াও। এবং সময়টা অমিতাভ-কথিত এস্টাব্লিশমেণ্টের পক্ষেও নেই আজ। সময়টা বরং একেবারে ভিন্ন মেরুর পক্ষে। অর্থাৎ তেরিয়া, জেদী, কালসচেতন যোগ্য বিপ্লবীদেরই পক্ষে। তাইতো যাকে "অদৃশ্য ঈশ্বর" বলেছেন অমিতাভ, সেই ঈশ্বরের আজ মাথাব্যথা কি ভাবে এই যুগের তাৎপর্যকে বিকৃত করা যায়। জনগণের বিপ্লবী মেজাজকে ভোঁতা করে ফেলা যায়। আর সেজন্যই তাদের সেবকদের প্রতিক্রিয়ার পক্ষে লড়বার যোগ্যতার নিরিখেই বেছে নিচ্ছে তারা। এটাতো প্রতিক্রিয়ার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কেবল এদেশে নয়। সারা দুনিয়া

জুড়ে। লড়াইটাও যে সমাজতন্ত্র বনাম সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। তবে অমিতাভ এস্টাব্লিশমেণ্ট নিয়ে এত ভাবিত কেন? আসলে এস্টাব্লিশমেন্ট তো মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যার তা অন্তর্গত সমস্যা মাত্র। 'সব কিছু নষ্টামি এস্টাব্লিশমেণ্টেরই'—এমন ধারা চিন্তা, আসলে মূল সমস্যা থেকেই চোখ ফিরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এমন কি এস্টাব্লিশমেণ্টকে সর্বশক্তিমান মনে করে ভুল ময়দানে যুদ্ধ দিতে নেমে পড়তে পারে অর্জুন। এস্টাব্লিশমেণ্টের 'অদৃশ্য ঈশ্বরের' পেছনে থেকে কলকাঠি কারা নাড়ছে, তা জানা প্রয়োজন।

হয়তো ক্লিশের মতো শোনাবে, তবু বলি, অমিতাভও আমার মতনই জানেন যে কোনো সমাজ-আর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে গেলে জানতে হয় সেই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা। উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির দ্বন্দ্ব। জানতে হয় সামাজিক উদ্‌বৃত্ত ভোগ করছে কোন কোন শ্রেণী। উৎপাদন সম্পর্কগুলির সামগ্রিক যোগফলই তো আর্থনীতিক ব্যবস্থা। এই আর্থনীতিক ভিত্তির উপরেই "আইনগত, নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক বা দার্শনিক—সংক্ষেপে, ভাবাদর্শগত আঙ্গিকগুলি" গড়ে ওঠে। শোষকশ্রেণীগুলি তাদের শোষণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখার জন্যে এই ভাবাদর্শগত আঙ্গিকগুলির সামগ্রিক ঐক্যের তাৎপর্যে গড়ে তোলে এক অদৃশ্য সর্বগ্রাসী প্রভাবশীল সংগঠন। এরই রক্ষণশীল ও সক্রিয় অংশটির নাম এস্টাবলিশমেণ্ট। শোষকশ্রেণীর এই এস্টাবলিশমেণ্টের—সাহিত্য এস্টাবলিশমেন্ট একটি অঙ্গ ও অংশমাত্র। আবার ভাবাদর্শের আঙ্গিকগুলির মধ্যেই ধরা পড়ে উৎপাদনশক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ। এস্টাবলিশমেণ্ট-এর মধ্যেও "মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার নিরসন ঘটায়"। অমিতাভ অত্যন্ত রাগীভাবে সাহিত্য এস্টাবলিশমেণ্টকে দেখছেন। ঠিকই দেখেছেন তার নৈরাজ্যমূলক অভিব্যক্তির দিক। কিন্তু দেখেন নি ঐ নৈরাজ্য আসলে শোষকশ্রেণীগুলির লোভকে চরিতার্থ করার জন্য শোষিত মানুষের সংগ্রামী চৈতন্যকে ভোঁতা করে, বিভ্রান্তির পথে চালিত করে নেবার অস্ত্রবিশেষ। এস্টাবলিশমেন্ট আসলে এ-দেশে একচেটিয়া ও সামন্তবাদীদের শোষণব্যবস্থাকে স্থিতাবস্থায় রাখা, এ-দেশে নয়া-ঔপনিবেশিক-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ব্রতী। এমনকি প্রয়োজন হলে তা এ-দেশী দুর্বোধ্যতাবাদ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক বিকৃতির সঙ্গে মার্কিন দেশের যৌন-উন্মার্গগামিতা বা ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স প্রভৃতি পুঁজিবাদী ডেকাডেন্সের

ফলগুলি একই সঙ্গে পরিবেশন করতে তৈরি থাকে। এ ব্যাপারটা ধরা পড়লে, অমিতাভর রচনায় স্পষ্ট হতো এদের কার্যকলাপের অভিসন্ধিগুলি। অভিসন্ধিগুলি কেবল তাৎক্ষণিক মুনাফালাভই নয়, এ-দেশে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য ও সংগ্রাম চূর্ণ করাও। অমিতাভও জানেন, রাজনৈতিক-সামাজিক-আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথেই এ-বিরোধের নিরসন। কিন্তু গাছ দেখতে গিয়ে তাঁর চোখে পুরো জঙ্গলটা চোখে না পড়ায়, তিনি কিঞ্চিৎ একচক্ষু হয়ে যান। ভাবাদর্শগুলির মধ্যেও যে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ ধরা পড়ে, নতুন সংস্কৃতি রচনার নতুন তাৎপর্য নিয়ে গড়ে উঠছে শ্রেণীসংগ্রামের উপরে দাঁড়িয়ে নতুন ভাবাদর্শের যে শিল্পআঙ্গিক, অমিতাভ এই সদর্থক দিকের গুরুত্বটাকে তেমন করে দেখছেন না। দেখছেন না বলে বাজারি প্রকাশনাসংস্থা ও বৃহৎ বুর্জোয়া পত্রিকার প্রভাব দেখে বড় বেশি হা হুতাশ করছেন।

আর সাচ্চা বিপ্লবী লেখকের ব্যাপারে রক্ষণশীলদের ভূমিকা? সত্যিকারের বিদ্রোহীকে, নানা কায়দায় প্রকাশ্য বা গোপন প্রতিক্রিয়াশীলরা তো পাত্তাই দেবে না। বরং লক্ষ্যণীয়ভাবে তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করবে, অনাদরতো ঘটবেই তাঁর। চেষ্টা হবেই 'টু কিল হিম বাই সাইলেন্স। এতো কিছুই নতুন কথা নয়। কিন্তু এতে সাচ্চা বিপ্লবীরা লড়াইয়ের মাঠ থেকে সরে যাবেন? কি করে তাঁরা বিশ্বাস করেন "ধুলো বালি উড়ে গেলে একদিন না একদিন আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে"! এস্টাবলিশমেণ্টের ঔদাসীন্য বা বিরূপতার দরুনই বিপ্লবী লেখকের লেখা বন্ধ হয়ে যায়? বরং এত সত্ত্বেও তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছেন। অমিতাভর ভাষ্য অনুসরণ করেই বলি, অমিয়ভূষণ মজুমদার এস্টাবলিশমেণ্টের কল্কে না পেলেও লেখেন কি করে তাহলে? কায়েমীস্বার্থ, একচেটিয়াপতি, সামন্তবাদী, আমলাতন্ত্রী ও তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদ—নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণ হাসিল করার জন্য যে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে চায়, তাদের ভাবাদর্শের বাহন হিসাবে তথাকথিত সাহিত্য এস্টাবলিশমেণ্ট তো চাইবেই—তার স্বপক্ষীয়রাই একমাত্র উপাস্য হোক।

বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক পরিবেশেই বর্তমানে আমাদের দেশের 'প্রভাবশালী' লিখিত সাহিত্য। ডেকাডেণ্ট পশ্চিমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মুখাপেক্ষিতা ও স্বদেশে পুঁজিবাদী আর্থনীতিক বিকাশের ভ্রান্ত পথে পা দেবার ফলে সেটাইতো

হবার কথা। উৎপাদন সম্পর্ক তো সেই কথাই বলে। ফলে বুর্জোয়াদের দেয়া স্বীকৃতিই এ পরিবেশে প্রভাবশালী সামাজিক স্বীকৃতি হতে বাধ্য। কখনো কখনো এই এস্টাবলিশমেণ্ট নিরপেক্ষতার ভান করে। ফলে প্রগতিশীলদের কাউকে কাউকে হঠাৎ হঠাৎ নানা মাপের স্বীকৃতি দিয়ে বসে। আমরা অবাক হয়ে যাই দেখে, এই পোড়া দেশে শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল লেখকও যদি সাহিত্য এস্টাবলিশমেণ্টের কাছে পুরস্কারধন্য স্বীকৃতি পান আমরাও বিগলিত হয়ে যাই। আমাদের নমস্যদের আমাদের পক্ষ থেকে তার আগে যোগ্যভাবেও শ্রদ্ধা জানাতে পারি না। আমাদের মধ্যেও যেন এক ধরনের বুর্জোয়া স্বীকৃতির প্রতি দুর্বলতা রয়ে গেছে। আবার কারো এ ধরনের স্বীকৃতিতে আমাদের পক্ষাবলম্বী কোনো কোনো গোষ্ঠী খুব খুশি হন, আবার তাঁরাই অন্য কারো স্বীকৃতিতে সমালোচক হয়ে ওঠেন। বুর্জোয়াদের হাত চলে এসেছে কতদূর !

আর্থনীতিক ভিত্তি বদল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো পুরো বিপুল "উপরিতল মোটামুটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়"। আসলে আর্থনীতিক ভিত্তির বদল না ঘটিয়ে, আমরা যদি আশা করি এক্ষুনি এস্টাবলিশমেণ্ট-এর কাছে স্বীকৃতি আদায় করে নেব, তাহলে খুবই ভুল করা হবে। আমরা তো ভিত্তিটাই পরিবর্তিত করে দিতে চাই। উৎপাদনের ব্যবস্থারই বদল চাই। সচেতনভাবে এই লড়াইয়ের ফলস্বরূপ এস্টাবলিশমেণ্টকেও গুঁড়িয়ে দিতে চাই।

সাহিত্য এস্টাবলিশমেণ্ট কি আমাদের দেশে একটা ? একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বী হয়ে আছে বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্রিকা সংবাদপত্র কমপ্লেক্স। তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য সামন্তবাদী ও কুলাকদের জন্য আছে 'নবকল্লোল' ঘরানার পত্রিকা ও প্রকাশন। অমিতাভর কাছে এই 'নবকল্লোল' ঘরানার পত্রপত্রিকা ও তাদের প্রকাশনা বিভাগ ইত্যাদির দিকটি চোখ এড়িয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তরুণ লেখকরা প্রকাশক পাচ্ছেন না, অমিতাভ লিখেছেন। এটাও তো হবারই কথা। তবু বোধহয় মনে সান্ত্বনা মেলে এ-দেশ ও-দেশ সবদেশেই বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখককে বহু দরজায় প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে। প্রগতিশীলদের জন্য তো দরজা সব বুর্জোয়া দেশে প্রায় বন্ধই। ব্যাপারটা সব সময়েই ঘটে। ঘটাটা অস্বাভাবিক নয়। তবুতো এ-দেশে ম্যাকার্থিবাদের সম্মুখীন আমাদের এখনও হতে হয়নি ! হতে হয়নি যে তার কারণ ভাবাদর্শের ভুবনেও আছে

বৈপরীত্য ও সংঘাত। এখনো পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রশক্তিতে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতাসীন হতে পারেনি। এখনো রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিপুল ক্ষমতাশীল অংশ নয়া ঔপনিবেশিকতার বিরোধী। এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষ সাম্রাজ্য-বাদী চাপ, একচেটিয়াপতি ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে শক্তিধর। অর্থাৎ আমাদের দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক জনগণের মেজাজ ও সংগ্রাম আজো এ-দেশকে সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হতে দেয়নি। কিন্তু ম্যাকার্থিবাদের প্রেতচ্ছায়া আমরা দেখেছিলাম 'স্বাধীন সাহিত্য'র ফেলিঅলারা যখন তাদের সাহিত্যপ্রচার মাধ্যমকে কংগ্রেসের মধ্যে তৎকালীন ক্রমোপ্রভাবশালী একচেটিয়াপতি, সামন্তপ্রভু ও আমলাতন্ত্রীদের অভিন্ন লক্ষ্যের পথে ব্যবহার করতে পেরেছিল। সেই কংগ্রেসও ভাঙলো। এবং সে দলে গণতান্ত্রিক মেজাজের প্রসার ঘটলো। ফলে শেষ পর্যন্ত শোষকদের এস্টাব্লিশমেণ্ট ও শাসকশক্তি এক লক্ষ্যে বিধৃত হতে পারলো না। বলা যেতে পারে, এদেশে দুটি সরকার চলে। এক জনগণের নির্বাচিত সরকার। অন্যটি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী 'অদৃশ্য' সরকার। দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে দখল করতে চায়। আর জনগণ প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে চূর্ণ করার জন্য বলদৃপ্ত দেখতে চায়। এই বৈপরীত্যের তাৎপর্যে বুঝতে হবে এ-দেশের শোষকদের এস্টাব্লিশমেণ্ট। অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের মতো এদেশে এখনো রাজশক্তি ও আর্থনীতিক শক্তি একেবারে মিলে মিশে যেতে পারে নি।

অমিতাভ বলছেন, পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় পেয়ে যাওয়া লেখকরা এখনও শূন্যমঞ্চে তাল ঠুকে যাচ্ছেন। আসলে তাঁরাও নতুন কায়দায় ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছেন নৈরাজ্য রচনার নতুন পরিস্থিতিতে। প্রবোধকুমার সান্যালদের শূন্যগর্ভ বলি কি করে? বুড়ো বয়সে তিনি খেউর ছিটোচ্ছেন 'বনস্পতির বৈঠক'-এ। রগরগে ভ্রমণ, সতীর্থদের কেচ্ছা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিত্য নতুন প্রেম—এই সব কেচ্ছাও তো নৈরাজ্যেরই একটি বিশেষ দিক। 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ' এঁরা কি এখনই আখমাড়াই হয়ে গেছেন! সবুর করুন অমিতাভ। প্রবোধকুমারের পর আরো কতজন যে 'বনস্পতির বৈঠক'-এর লাইনে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কে জানে। প্রবোধকুমার সান্যাল তো স্মৃতিচর্চার নামে পরচর্চা লেখায় শিবরাম চক্রবর্তীর 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা'র জুতোতেই পা গলালেন মাত্র।

অমিতাভ বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি, এসটাবলিশমেণ্ট কেবল "পেঁয়াজ রসুন

ঠাসা…কিস্‌সা"ই যোগান দেয়না। তাদেরও 'সিরিয়াস' লেখক আছেন। 'এই সিরিয়াস লেখকরা পশ্চিমের হালফিল উন্মার্গগামিতার সাক্ষ্যবহ নানা 'বুদ্ধিদীপ্ত' রচনা প্রকাশ করে থাকেন। এ সব প্রবন্ধের লেখকরা শূন্যতা, নিখিল নাস্তি, যৌনতাই সারাৎসার, হিংস্রতা ইত্যাদি ভারিক্কি চালে প্রকাশ করে "আঠারো বছরের ছাত্রীদের কান কালা করা" নয়, আমাদের দেশের তরুণ বুদ্ধিবাদী ও লেখকদের চমৎকৃত করে দেন। বাংলা ভাষার যোগ্যতর প্রকাশের নামে এমন কি দুর্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় এমন কিছু আবেগের কথাও তাঁরা সৃজনশীল সাহিত্যের নামে চালিয়ে দেন, তাতে তা বড় তা বড় প্রগতিশীল লেখকরাও আহা আহা করে ওঠেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের শতবার্ষিকীতেও আমরা বাংলা ভাষার রচনারীতিকে আরো একশো বছর পেছিয়ে দিতে চাই ?

এই হাল্কা ও 'সিরিয়াস' লেখকদের লক্ষ্য মুখ্যত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন আমাদের মধ্য'বিত্ত' শ্রেণী—যাদের অধিকাংশের বিত্ত হিসাবে ভাঁড়ে মা ভবানী। বঙ্গবিভাগ ও গ্রামীন কুলাক শ্রেণী বিকাশের তাৎপর্যে এরা শ্রমজীবী মানুষের কাছাকাছি এসে গেলেও, উচ্চ বর্গে ওঠবার বাসনা এদের বড়ো অংশকে বুর্জোয়া সংস্কৃতির পাপচক্রের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। কি ইনটেলেকচুয়াল পাঠক, কি সাধারণ পাঠক—সবাইকে ঘাড়ে ধরে এই এসটাব্লিশমেণ্ট জীবনবিরোধী মানবতাঘাতী ভাবাদর্শের সাহায্যে মাথা ধোলাই করে দিচ্ছে।

যাই হোক, অমিতাভ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলদের ফ্রন্ট চাইছেন। কিন্তু সেখানেও দেখেছেন নৈরাজ্য। কেন ? এঁদের অনেকেই "মুখে মার্কসবাদী হলেও চরিত্রে ট্রটস্কাইট"। তাই তাঁরা ব্যাপক সাহিত্য ফ্রন্ট গড়তে পারেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে ট্রটস্কাইট ঝোঁক কাকে বলছেন তিনি ? "প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে দোদুল্যমান মিত্র বিপজ্জনক এবং এদের ঝেঁটিয়ে তাড়াতে না পারলে সাহিত্যে মহান বিপ্লব সম্পন্ন হবেনা—এমন পাতি বুর্জোয়াসুলভ দায়িত্বহীনতা ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে" যেসব "অপ্রতিষ্ঠানিক লেখক বা পত্রিকা পরিচালকদের মধ্যে" তাঁরাই তাঁর কাছে ট্রটস্কাইট। আর এরই জন্য "ফ্রন্ট ভাঙছে, সংগঠন ভাঙছে…" ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে তো অমিতাভ কথিত এই "মুখে মার্কসবাদী …চরিত্রে ট্রটস্কাইট"রা বড়ই শক্তিশালী ! এতই তাদের ক্ষমতা !

আসলে সাহিত্যে 'ট্রটস্কিবাদ'টা নেহাৎই আটপৌরে ব্যাপার। ত্রৎস্কি তাঁর 'রেভলিউশান অ্যাণ্ড আর্ট'-এ শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের ধারক

বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই। শ্রমজীবীদেরই বরং সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যই নেই। আর তাই "সর্বহারার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা··· সর্বহারা বর্তমানে এই ধারাবাহিকতা বুঝতে পারছে। প্রত্যক্ষভাবে নয়, বরং অপ্রত্যক্ষভাবে। সৃষ্টিশীল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্য দিয়ে···।" কেননা "সর্বহারার যদিও রাজনীতির সংস্কৃতি আছে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কর্ষণ যৎসামান্যই"। বলেছিলেন, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের "অসক্রিয় রাজনৈতিক স্থানগ্রহণের দিক রয়েছে"। আর এজন্য এই "ধ্যানী বুদ্ধিজীবীরা" শিল্পসৃষ্টি করবেন সর্বহারার রাজত্বে।

ত্রৎস্কি এরকম ভাবতেন বলেই, রাজনীতিক বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক বক্তব্য—এই দুটি দিকে ত্রৎস্কিবাদীদের মেরু-বিপ্রতীপত্ব বিপুল ফারাকের চিহ্ন বহন করে। আসলে তাঁরা শ্রমজীবী আন্দোলনকে দু-ভাবে সাবোতাজ করেন। এক, রাজনীতির ক্ষেত্রে অতিবিপ্লবী কায়দায় সমস্ত মিত্র শ্রেণীগুলিকে দুর্বল ক'রে প্রতিবিপ্লবের শক্তিকেই বলশালী করা। দুই, ভাবাদর্শের জগৎ একেবারে বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়াদের হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে ছেড়ে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শে চালিত করা ও বিকৃত করা। অমিতাভ যদি একটু চোখ মেলে তাকাতেন, তাহলে বুঝতেন ত্রৎস্কিবাদী ঝোঁক হল—মুখে ও রাজনীতিতে অতি বাম, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পরম দক্ষিণ! অথচ রাজনীতি কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি একই উপরিতলের আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন! ত্রৎস্কির এ-ভ্রান্তির গোড়াতে কার্ল কাউটস্কির অবদান নিতান্ত কম নয়। তিনিই তো প্রথম বলেছিলেন" সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদনের আর্থনীতিক নিয়মের তাৎপর্য সর্বহারার নেতৃত্ব নিয়ে যায় এই আকারে: **বৈষয়িক উৎপাদনে কমিউনিজম, মনীষাগত উৎপাদনে নৈরাজ্য।**" সুতরাং, রচনা ইত্যাদিতে যারা বুর্জোয়ার শিবিরের লেখকদের নানা প্যাঁচ, জটিলতা, দুর্বোধ্যতা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলনের ব্যাপার স্যাপার ভাবছেন—আসলে এঁরাই কার্যকরী ভাবে ত্রৎস্কিবাদী। আর রচনাগত নৈরাজ্য, নানা উন্মার্গগামিতার পক্ষে জোর ওকালতি, জীবনমুখী প্রগতিশীল সাহিত্যকে সরল মানবমুখীন ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জটিলতার নানা ঘোরপ্যাঁচে, ভাষার নানা উল্টোপাল্টা কারিকুরিতে, ফর্মের বাহাদুরিতে সঙ্কীর্ণ সংখ্যক একদল বিভ্রান্ত বা বুর্জোয়া ঘরানার পাঠকের হাততালি যখন জুটিয়ে আনে, আমরা একাধিক প্রগতিশীল লেখককে সে প্রশংসায় ধন্য হয়ে যেতেও দেখি! আমাদের সাহিত্যে আসল ত্রৎস্কিবাদ এই দিক থেকেই আসছে।

তবে আরো একটি দিক আছে। অমিতাভর 'ত্রৎস্কিবাদী' দেওয়া নাম একটু বদলে দিয়ে তাঁর উল্লেখিত ব্যক্তিদের আমরা নিতান্ত সঙ্কীর্ণতাবাদী বলতে পারি। যা মাওবাদ ও ঝানভবাদের বিকৃত রূপ। এঁরা সাহিত্যকে দৈনন্দিন মোটা প্রচারের স্তরে নিয়ে আসতে চান। অবশ্য সিভিক্ সাহিত্যের যে প্রয়োজন নেই এমন নয়। কিন্তু আমাদের এ-রাজ্যে অমিতাভ কথিত সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তি—'অপ্রতিষ্ঠানিক লেখক ও সম্পাদকদের মধ্যে যে খুব বেশি রয়েছেন—যাঁদের কার্যকলাপ বর্তমানে খুবই প্রভাব ফেলতে পারে, এমন তো আমার কখনো মনে হয় নি।

তবে বুর্জোয়াদের থেকেও কি কিছু নেবার নেই? আছে। লেনিন যেমন তলস্তই সম্পর্কে বলেছিলেন "…মহান শিল্পী…যদি তিনি মহান শিল্পী হয়ে থাকেন, তাঁর রচনায় বিপ্লবের অন্তত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি নিশ্চয়ই প্রতিফলিত করেছেন"। তেমনি গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণাও করেছিলেন "বুর্জোয়া যুগের সবচেয়ে মূল্যবান সাফল্যগুলি বর্জন করা তো দূরের কথা, বরং ঠিক বিপরীত, দু-হাজার বছরেরও বেশি সময়ের মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির যা কিছু মূল্যবান সবই মার্কসবাদ আত্মস্থ করেছে এবং তার নতুন রূপ দিয়েছে" (৮ই অক্টোবর, ১৯২০ লেনিনের খসড়া প্রস্তাব)। এমন সাহিত্য গড়ে তোলাই তো জীবিত সাহিত্য আন্দোলনের কাজ।

বিভ্রান্তিটা তাই দু-দিকেরই। প্রগতি শিবিরের নৈরাজ্যমনস্ক সন্ধ্যাভাষীর দল ও অতি উচ্চকিত প্রায় প্রলেটকাল্টবাদী সঙ্কীর্ণতাবাদীর দল বস্তুত নিজেদের অজানতেই অদৃশ্য ঈশ্বররূপী এস্টাবলিশমেণ্টের কাজ করে দিচ্ছেন। তবে প্রথম গোষ্ঠীর কাছ থেকেই বিপদের আশঙ্কা বেশি।

অমিতাভ শেষ পর্যন্ত 'পরিচয়'কেও রেয়াৎ দেন নি। "বিগ্রহপ্রতিমরা 'দেশ' থেকে 'পরিচয়'-এর পাতা এমনভাবে জুড়ে আছেন যে…কচিকাঁচাদের পাত্তা পাওয়াই মুস্কিল"। এ বিগ্রহপ্রতিম কারা? 'দেশ' পত্রিকাটি তো অমিতাভ কথিত এস্টাবলিশমেণ্টের চূড়ামণি। তাদের তো নিশ্চয়ই নীতি আছে—যা এ-দেশে, যে শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শের তারা প্রতিনিধি, তাদের সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম ও বোলবোলাও। তাহলে 'দেশ'-এর বিগ্রহপ্রতিমরা 'পরিচয়'-এও বিগ্রহপ্রতিম? বিগ্রহপ্রতিমদের তো, অমিতাভই বলেছেন, এস্টাবলিশমেণ্ট 'ইনাম, ইনাম, ইনাম'-এর ব্যবস্থা করে দেয়। 'দেশ'-এর বিগ্রহপ্রতিমরা 'পরিচয়'-এও পূজ্য? এঁরা 'পরিচয়'-তেও তরুণদের পথ আটকে আছেন?

আমার তো বরং বিস্ময় লাগে দেখে যে 'দেশ' বা 'অমৃত'—এবং তাদের কমপ্লেক্সের দৈনিকের সাহিত্য-পাতাগুলি তাদের বহর বা মাপের এবং প্রকাশের দ্রুতির জন্য এত তরুণ লেখকদের প্রকাশের সুযোগ এনে দেয় যে ধারণার অতীত। কবিতা-গল্প ইত্যাদি তো তারা মুখ্যত তরুণ লেখকদেরই ছাপে। এবং ঐ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশের ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা আমাদের দেশের তরুণ সাহিত্যকারদের অন্যতম সামান্য লক্ষণ। সিরিয়ালাইজ্‌ড উপন্যাস, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি এবং ফিচারগুলি ছাড়া, বাকি অংশে তো তরুণ, অতি তরুণ-দেরই ছড়াছড়ি। এবং পূতনাপ্রতিম ঐসব ঢাউস পত্রিকার এইটাই তো একটা উদ্দেশ্য। বাহান্নো সপ্তাহে যে তরুণরা গল্প কবিতা লেখেন তাঁদের কতজন শেষপর্যন্ত লেখার ব্যাপারে টিকে থাকেন? আসলে "রাজার এঁটোর" দলে না ভিড়লে প্রশ্রয় মেলে না। তেমনি "রাজার এঁটো" হয়ে গেলে, চৈতন্য ও অভিজ্ঞতায় যেহেতু দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়, ফলে সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ও জোটে না। অবশ্য প্রতিশ্রুতিবান বহু তরুণ লেখক কেবল 'দেশ' ও 'পরিচয়'-এ লেখেন তা নয়, অন্যান্য বহু পত্রপত্রিকাতেও তাঁরা লেখেন। কেউ এক-আধবার এ-দুটি পত্রিকায় লিখলেই বিগ্রহ প্রতিম হয়ে ওঠেন? আমি তো জানি অমিতাভ যে 'দেশ ও 'পরিচয়'কে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন সে-দুটিতে অন্তত "বিগ্রহপ্রতিম"দের মধ্যে আছেন সার্বজনমান্য বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলেও আমাদের অতি প্রিয়জন অসীম রায়, দেবেশ রায় ও স্বয়ং অমিতাভ দাশগুপ্ত। তারজন্য তাঁদের 'পরিচয়' বর্জন করবে? কেন? বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও এঁরা প্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন, লেখক যদি তাঁর চরিত্র বর্জন না করে বহু প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাকে যোগ্যভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারেন সাময়িকভাবেও, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? বুর্জোয়াদের, এমন কি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের সুপারষ্টাকচারেরও এমন কিছু নিজের নিয়ম আছে, যার ফাঁক ব্যবহার করা একেবারে অসাধ্য নয়। তবে যোগ্যব্যক্তিই তা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ডিমিট্রভ লাইপজিগে এমন কি নাৎসী বিচারগৃহে অভিযোগকারীদেরই অভিযুক্ত করতে পেরেছিলেন! অবশ্য এক্ষেত্রে যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন আছে বই কি!

"তরুণ লেখক, তরুণ লেখক" বলে তাঁদের পুনর্বাসনের কথা উচ্চকণ্ঠে বললেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? আমরা কি আজকের দিনের রচনা বিশিষ্টতা, রচনা-উদ্দেশ্য ও রচনারীতি নিয়ে কোনো কথাই বলব না?

একনিঃশ্বাসে 'দেশ' ও 'পরিচয়' উচ্চারণ করতে যে আমাদের বাধে না, তার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে কি রচনারীতি বা কি রচনাবৈশিষ্ট্য বহু ক্ষেত্রেই যেন স্পষ্টতর তফাৎ করা যায় না। তবে ব্যাখ্যামূলক দিকে দু-রকম ঝোঁক থাকতেই পারে এবং ঐটুকুও পত্রিকাগুলির চরিত্রানুগ বিশিষ্টতা।

আসলে আমাদের দেশে 'আধুনিক' সাহিত্য ও 'প্রগতিশীল' বা 'সমাজতান্ত্রিক' সাহিত্যের চরিত্র আমাদেরই অনবধানতার ফলে একসঙ্গে গুলিয়ে গেছে।

পৃথিবী যখন সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছে তখন, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এ-দেশের সাহিত্যে এসেছিল একই সঙ্গে গোর্কি ও হামসুনের প্রভাব। বলা যায়, মার্কস ও ফ্রয়েডের প্রভাব। আর কবিতাতে এসেছিল বিশেষভাবে বৃটিশ আধুনিকদের প্রভাব; সে প্রভাব মুখ্যত ও-দেশের বুর্জোয়া ডেকাডেণ্ট যুগের ব্যক্তির চূড়ান্ত ভাঙনের নিদর্শন বয়ে এনেছিল। কেউ কেউ অবশ্য পরবর্তীকালে অডেন-এর মতো "মার্কস ও ফ্রয়েডকে 'বিবাহিত'" দেখতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত বহু লেখকদের কাছে মূল ঝোঁকটা পড়েছিল ফ্রয়েডের। ফলে ব্যক্তিত্বের ভাঙনের প্রতিলিপি, খোলাখুলি 'কংক্রিট' বাস্তবতার প্রকাশ করছি বলে যৌনতার বিকৃত প্রকাশ—এসবই অঙ্গীকৃত হয়ে যায়। এই পশ্চিমমনস্ক হাওয়ায় গা ভাসিয়ে এসেছে কখনো অ্যালিয়েনেশন, কখনো অ্যাবসার্ড বা একজিসটেনশিয়ালইজম; কাফকা, আয়ানেস্কো, কামু ইত্যাদি। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া অবক্ষয়ের প্রকাশ আমরা কতটা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি তা বিচার না করে একের পর এক নির্বিরোধী চিত্তে প্রগতি শিবিরের লেখকরাও এসব নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে চলেছি। আমাদের প্রগতি শিবিরের শ্রেষ্ঠতম কবি বিষ্ণু দেকে এলিঅট বিশারদ হিসাবে দেখলে আমরাও যতটা আপ্লুত হই, সেই তুলনায় এলিঅট ইত্যাদির 'আধুনিকতা'র যোগ্য মূল্যায়ন করেছি কি? বিষ্ণু দেকে তাঁর যোগ্য মূল্যে শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছি কি?

আসলে এ দেশে ভুলটা ঘটেছে গোড়াতেই। তাই মার্কসবাদী লেখকও নিজেকে যে 'আধুনিক সাহিত্যের' লেখক ঘোষণা করে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন—সেই 'আধুনিকতা' এসেছে বুর্জোয়া ডেকাডেন্স থেকে। বুর্জোয়া সমাজ পশ্চিমে যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে, সেই সমাজে সমাজবিপ্লবের পথে সঙ্কটের নিরসন নয় বরং নানা ঘরানার আত্মসমর্পণ বা পলায়ন অথবা অভিমানের মধ্যেই এই

'আধুনিকতা'র সৃষ্টি। মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল অন্যান্য লেখকদের কাছে এই আধুনিকতা একেবারেই আকাঙ্ক্ষিত হবার কথা নয়।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে, ইয়োরোপের বুর্জোয়া সঙ্কটের 'আধুনিকতা' আর সমাজতন্ত্রী উত্থানের প্রভাব একই সঙ্গে এসেছিল। 'আধুনিকতার' নামে আমাদের অনেক পূর্বসূরিই আধুনিকতার বিপ্রতীপ এ-দুধারাকেই না মূল্যায়ন করে একসঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। একমাত্র সচেতনভাবে বিষ্ণু দে-ই তাঁর সম্পাদিত কাব্যসঙ্কলনের নাম আধুনিকতায় চিহ্নিত করেন নি। 'এ কালের কবিতা' নাম দিয়েছেন। বরং বুদ্ধদেব বসু নাম দিয়েছেন 'আধুনিক বাংলা কবিতা।' অথচ এই 'আধুনিক' বাঙলা কবিতার প্রথম সঙ্কলনের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিবাদী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আবু সয়ীদ আইয়ুব। অবশ্য দুটি আলাদা ভূমিকা লিখে দুজনে সেই 'আধুনিকতা'র বিচার করেছিলেন। কিন্তু হীরেণবাবুও 'আধুনিকতা'র যে সতর্ক বিচার করেছিলেন, তাও কি আমরা মনে রাখলাম?

তবু দুটি ধারায় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'আধুনিক' ধারা থেকে চলে এসেছিলেন 'প্রগতিশীল' ধারায়। আধুনিকদের শিরোমণিরা সেই প্রগতিশীলতায় উত্তীর্ণ হওয়াকে ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁরা সুকান্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, সুকান্ত রাজনীতি করতে গিয়ে কবি হলেন না। বললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন বলে তাঁর উত্তরকালের সাহিত্য আর উঁচু দরের শিল্প হল না। যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েছেন, তাঁরাই বলবেন, সেই লেখক-টাইটানের কমিউনিস্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁর 'আধুনিক' রচনায় ছিল 'প্রগতির' বীজ—যা শেষ পর্যন্ত মহীরুহতে সমুত্থিত হয়েছিল।

আমরা মিথ্যেই মানিকবাবু নিয়ে আপ্লুত হই। এমন কি যাঁরা এসটাব্লিশমেন্টের আমলাফয়লা-স্তাবক-তাত্ত্বিক, তাঁরাও কোরাসে মানিকস্তুতি করেন। প্রগতিবাদীরা তাঁদের ঐ বাক্‌বিভূতিতে খুবই খুশি হন। অন্তত ভেবে আনন্দ পান—যাক্ মানিকবাবুকে তাঁরাও বুঝেছেন! আসল ঘটনাটা কিন্তু অন্য। তরুণ গল্পকার উপন্যাসকারদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা থাকে এসটাব্লিশমেন্টের—ত্যাখো, ত্যাখো, মানিক কমিউনিস্ট বলে 'তার সব ভালো যার শেষ ভালো' হতে পারলেননা।

অমিতাভ কমলকুমার মজুমদারের কথা তুলেছেন। কমলবাবুতো কমিউনিস্ট

নন বা প্রগতিশীল শিবিরেরও নন। আমিতো আগেই বলেছি, এসটাব্লিশমেন্টের আক্রমণ দু-দিক থেকে। তথাকথিত সিরিয়াসনেসের কায়দায় আর সরল পাঠ্য রচনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য একটাই। প্রগতির শক্তিকে সারভার্ট করা, তাকে অকিঞ্চিৎকর করে তোলা। আর তাই প্রথামত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিগলিত অথচ এসটাব্লিশমেন্টের বশংবদ এবং কমলবাবুর গুণগ্রাহী লেখকরাইতো 'ঝাল লঙ্কা-পেঁয়াজ ঠাসা' সাহিত্যের বিষ তৈরি করে যাচ্ছেন।

আমাদের দেশের সাহিত্য এমনই এখন যে কেই বা 'দেশ'-এর লেখক আর কেই বা 'পরিচয়'-এর লেখক সব সময় যেন ঠাহর করা যায় না। কেননা সবাই রকমফেরের 'আধুনিক'। আর তাই লাল পতাকার তলায় মিছিলে হেঁটে যাওয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর শোভাযাত্রীর 'পকেটে সচিত্র যৌন পত্রিকা'। যৌন পত্রিকা না হয়ে যদি 'দেশ', 'অমৃত', 'নব কল্লোল' হয় তা হলেই বা দোষ কি? 'পরিচয়' 'চতুষ্কোণ' 'নন্দন' পকেটে উঠে এলেই কি প্রমাণিত হয়, একেবারে ভিন্ন মেজাজের পাঠক এঁরা? যাঁরা নানা দায়ে পড়ে এ-সব পত্রিকা কিনতে বাধ্য হন তাঁদের বাড়ি বা লাইব্রেরির টেবিলে দেখতে পাওয়া যাবে জাঁকিয়ে বসে আছে 'অদৃশ্য ঈশ্বর'-এর আশীর্বাদ। কেন তাঁরা এস্টাব্লিশমেন্ট প্রভাবিত পত্রিকাগুলি কিনবেন না? যা জোলোভাবে মিলবে প্রগতিশীল পত্রিকায়, তাই রগরগে ভাবে মিলবে বড় বড় পত্রিকায়। সেখানে উপরি পাওনা আছে হরেক রকমবা। রাজনীতির লড়াইয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লড়াইকে কি আমরা যোগ্য মর্যাদা দিতে শিখেছি?

তরুণ লেখকরাও তাই 'প্রগতি' 'আধুনিক' ব্যাপারটা না ধরতে পেরে প্রথমাবধিই 'আধুনিক' লেখক। পাঠক পাঠিকারাও 'আধুনিক'-এর পাঠক। আমে আর দুধে মিশে গেল। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে জয়ও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

তরুণ লেখকদের লেখার জায়গা নেই? আমার তো মনে হয় তরুণ লেখকদের প্রকাশমাধ্যমের বিস্ফোরণ ঘটেছে। এ-দেশে দার্জিলিং থেকে কাঁথি, মুর্শিদাবাদ থেকে পুরুলিয়া—হাজার হাজার প্রকাশমাধ্যমের ছড়াছড়ি। কলকাতাতে তো অলিতে গলিতে পত্রিকা। লিখতে শুরু করতে না করতেই তরুণ লেখক কবিদের বছরে বছরে বই বেরোয়। যারা কোনো উল্লেখযোগ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর দেখেন তাঁরাই জানেন কি হারে লেখা পত্রপত্রিকায় এসে জমা পড়ছে।

কিন্তু সে লেখাগুলিই-বা কেমন, তার বিচার তো আমাদের উন্মার্গগামী 'আধুনিক' সাহিত্যের বিচার-রীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রগতিশীল মহলে কি সুষ্ঠু সমালোচনার রীতিও গড়ে উঠেছে? নাকি বুর্জোয়াদের মতই সাবজেকটিভ কায়দায় বিচার চলেছে নিয়ম মাফিক? কোনো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় কে গল্প বিচার করেন, কে কবিতা বিচার করেন—এসব আটঘাট জেনেই বুদ্ধিমান লেখক লেখা পাঠান। বিচারও তেমনি ধারা। বিচারক তাঁর নিজের মনগড়া বিচাররীতিকে ধ্রুব জেনে কাউকে স্বর্গে পাঠাচ্ছেন, কাউকে নরকে।

আর আমাদের মনোভঙ্গির ফলেই এক নিঃশ্বাসে আমরা উচ্চারণ করি আজকাল আর লিখছেন না বলে প্রগতি অ-প্রগতির কথা না ভেবে 'সমর সেন, ননী ভৌমিক, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তীর' সঙ্গে উৎপলকুমার বসুর নাম। মনেও পড়েনা কেন যেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গোলাম কুদ্দুস, প্রদ্যোৎ গুহ, চিত্ত ঘোষ, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং আরও অনেকের নাম তেমন করে! (আমার তো বহুবার মনে হয়েছে এই সব গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও কবিরা বহু ক্ষেত্রে স্বজনদের নিকটেই যোগ্য মর্যাদা পান নি 'আধুনিকতা'র ব্যাধিতে তাঁদের স্বজনেরা ভুগছিলেন বলে।) অবলীলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এমন কি শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, নামের পর উপন্যাস লেখক হিসাবে চলে আসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বুঝে উঠতে পারি না কমলকুমার মজুমদার কেন "বাইবেলের পূত ব্যাখ্যাতা" বলে হঠাৎ উল্লেখিত হয়ে যান। আমরা তো জানতেও পারি নি এতদিন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় "শেষবারের মতো জ্বলে ওঠার চেষ্টায় কি করুণ" ভাবে নিভে গেলেন। কবে নিভে গেলেন তিনি?

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, শংকর, নিমাই ভট্টাচার্যকে" তো আমাদের অত ভয়ের কারণ নেই। কেননা এরা অত মানুষের 'মর্মবস্তু' নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না। সাদা মাটা লেখার মধ্য দিয়ে এঁরা ছিলেন, এঁরা আছেন। রয়েছেন এই মাত্র। যেখানে লেখক মর্মবস্তু নামে নানা বিকৃত ব্যাপার মানুষের ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দেন, সেখানেই বিপদ। কিন্তু পাঠকদের মনোরঞ্জনে এঁরা তো কেউই 'অনাধুনিক' নন! নন বলেই কারো রচনার নাট্যরূপে ক্যাবারে দৃশ্যের এত চটকদার বিজ্ঞাপন, কারো রচনায় বড় ঘরের কেলেঙ্কারীর নামে নানা বিকৃতির আমন্ত্রণ এবং ইত্যাদি। এঁদের অনেকেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেন্ট করে যাচ্ছেন

লোকরুচি বিকৃত করে দেবার জন্য। এই তথাকথিত লোকরঞ্জন ঘরানাও কম বিপজ্জনক নয়। 'ঝাল লঙ্কা ঠাসা কিসসা' রচয়িতাদের এঁরাও সগোত্র লেখক। 'শাস্ত্র বিরোধী'র দল বা 'হাংরি' ইত্যাদির দল আজকের দিনের মাস কলচরের জগতের তেমন কিছু নয়। অবশ্য এঁদের রচনাতে যে মুহূর্তে এস্টাব্লিশমেণ্টের যেমন যেমন প্রয়োজন পড়ছে, একটি দুটি লেখককে তারা তেমন হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের অঙ্গীকার যেহেতু এঁদের অনেকের লেখায় নেই—এঁরাও কার্যকরী ভাবে এস্টাব্লিশামণ্টের সুদৃঢ়তম সঙ্গী হয়ে যেতে পারেন। আর্নস্ট ফিসার অন্তত এক্ষেত্রে বোধহয় ঠিকই বলেছেন: "'আঙ্গিক সর্বস্বতাবাদ' পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিপজ্জনক নয়, বিপজ্জনক নয় বিমূর্ত চিত্রকলা বা কবিতা কিংবা ক্রম প্রকাশ্য সংগীত কিংবা অ্যান্টি-নভেল। সত্যিকারের ভয়ঙ্কর বিপদ রয়েছে অত্যন্ত কংক্রিট, একেবারে অতিবাস্তব, যদি বলতে চান 'বাস্তব', সেই সব পণ্য যা নির্বুদ্ধিতা, বদমায়েসী এবং অপরাধকে জাগিয়ে তোলে। কোনো সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম মহাযুদ্ধের মতো ভয়ানক ব্যাপারকে সংঘটিত করতে পারে না। তারজন্য দরকার খুব মোটা ধরনের খোরাকি।" আমাদের দেশে মোটা ধরনের খোরাকির পাশাপাশি চলেছে নানা আভাগার্দ-এর প্যাঁচ—ফলে পাঠকদের উপরে নানা মাপের প্রভাব পড়ছে। বুদ্ধিবাদীদের উপরে এক রকম। সাদামাটা পাঠকের উপর আরেক রকম। অবশ্য হরেদরে ফলাফলটা একই ধরনের হচ্ছে।

আমরা কেমন ভাবে "বাস মিস" করেছি, 'আধুনিক' আর 'প্রগতিশীলতা'র কথা বলতে গিয়ে তা বলেছি। আসলে প্রগতিশীল সাহিত্যিকের কাছে লেনিনের ১৯২০ সালের ৯ই অক্টোবরের প্রস্তাবটির যথেষ্ট কার্যকারিতা ছিল। "এক নতুন সর্বহারার সংস্কৃতি **আবিষ্কার** নয়, বরং ঐতিহ্য ও চলতি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলি সর্বহারার একনায়কতার যুগে মার্কসবাদের বিশ্বদৃষ্টি এবং সর্বহারার জীবন ও সংগ্রামের **দৃষ্টিভঙ্গির** তাৎপর্যে **বিকাশ**।" শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিমনস্কতা রয়েছে তারই বিকাশ অন্বিষ্ট হবার কথা ছিল। আমাদের বঙ্গদেশের শ্রমজীবী মানুষের যে সাংস্কৃতিক উপকরণ উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ মনস্বীরাই মেনে নিতে পারেননি বা আত্মস্থ করতে পারেননি আজ তারই নতুন উত্তরাধিকার সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকাশ ও বিভাস অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের জীবনচারণায় যে গণতান্ত্রিক মনুষ্যত্বের দিক্ রয়েছে তাকে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার

আলোয় তুলে ধারাটা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-বিকাশের দিক। শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক অন্তঃসার ধারণ ও তার বিকাশই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্য। এক কথায় লোকজীবনের মধ্যে অন্তঃগ্রথিত লোকমানস, লোকবীরচরিত্র, লোকছন্দস্পন্দ্য, লোকঅনুষঙ্গের ব্যঞ্জনা এই নতুন সাহিত্যের অনিষ্ট হবার কথা। অথচ সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয়, আমাদের প্রগতি সাহিত্যের একটা বড় দিকই কোনো না কোনো ভাবে সামন্ততন্ত্রের উপরে নির্ভরশীল অথবা বুর্জোয়া গ্লানিতে আপাদমস্তক মাখা বাঙালি মধ্যবিত্তর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে রয়ে গেল! এমন কি কখনো আধা-প্রতিষ্ঠিত প্রগতি শিবিরের লেখকরা—তরুণ লেখকদের সামনে এমন সব ব্যক্তিকে, উল্লেখযোগ্য রচনারীতির মূল্যায়ন করতে গিয়েও শিরোপা দেন, যাঁরা প্রগতি-শিবির ত্যাগ করে 'আধুনিকতা'র দাম হাতে হাতে পাওয়ার দায়ে বুর্জোয়া শিবিরে মাথা মুড়িয়েছেন—যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য এখন এদেশের বামপন্থী আন্দোলনকে বিকৃতভাবে চিত্রণ করা।

প্রগতি লেখকদের সংগঠিত হতে না পারলে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই, ঠিক কথা। কিন্তু কেবল যদি সংগঠিত হতে পারলেই সব কিছু সুরাহা হয়ে যেতো—তবে ভারি চমৎকার ব্যাপার হতো। সংগঠন করতে গেলে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা দরকার! লক্ষ্যকে কার্যকরী করার জন্য যোগ্য সংগ্রাম-আঙ্গিক থাকা জরুরি। সংগঠনকে যোগ্যভাবে ব্যবহার করতে হলে, যোগ্য সংগ্রামী সৈনিক প্রয়োজন, প্রয়োজন অস্ত্রের। লেখক কবিদের সেই অস্ত্র—তাদের রচনা। রচনা কতখানি লক্ষ্যবেধ করতে পারে তা জানতে হলে অস্ত্রর চরিত্রও জানতে হবে। বুর্জোয়াদের কায়দায়, বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল রচনা পদ্ধতিতে প্রগতির পথ উন্মোচিত হবে—এ হয় না, হতে পারে না। আর সেজন্য নতুন প্রগতিশীল সাহিত্যের কথা বলছি। যে সাহিত্য আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লোক-জীবনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিকতার ঐতিহ্যে অন্বিত করবে। প্রকরণ যার অ-জটিল, পাঠকদের যা বোধ্য, এবং লোক অনুষঙ্গের তাৎপর্যে যা ঐতিহ্যের চেনা মুখ মনে করিয়ে দেয়। যা রক্তে জারিত রয়েছে, বয়ে চলেছে, শিরায় ধমনীতে।

বিভ্রান্তি না কাটলে বড়ো সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রকাশনার মঞ্চ, মুদ্রণের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেও দেখা যাবে বুর্জোয়া সামন্তবাদী এস্টাব্লিশমেন্টের ধারণার পথেই আমরা সাফল্য চাইছি। আসল সাফল্য নতুন সাহিত্যে ; প্রগতিশীল সাহিত্য,

সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার অভিব্যক্তিবিধৃত সাহিত্য রচনায়। কে জানে আমাদের প্রগতিশীল বলে পরিচিত বন্ধুরা সে ব্যাপার ভাবছেন কিনা !

পরিশেষে কিছু বহু কথিত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত 'ক্লিশে'তে আসি।

সদ্য স্বাধীন দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা চায় সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত নয়া উপনিবেশ, চায় একচেটিয়াপতি ও সামন্তপ্রভুদের বোল বোলাও। এমন অবস্থা রচনার কাজে তারা সাহিত্যে ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের নানা দিক। শেষ পর্যন্ত নাস্তিবাদ, হিংস্রতা ও মাদকতা আচ্ছন্ন উন্মার্গগামিতা, দুর্বোধ্যতা, কূপমণ্ডূকতা, জাতি ও ভাষা বৈরিতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি নানা বিষয়কে তার উদ্দেশ্য করে তোলে। তাদেরই শোষণ ব্যবস্থাকে স্থিতাবস্থায় রাখার প্রয়োজনে পশ্চাদপদ সমাজ-আর্থনীতিক পরিবেশ তাদের জন্য রচনা করে সাহিত্য, রীতিনীতি, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, আইনকানুন ইত্যাদি সব জড়িয়ে রাখা এক বিমূর্তায়িত রূপ, অদৃশ্য অথচ সব সময়েই সর্বস্থানে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত এক এস্টাব্লিশমেন্ট। আমরা দেখিয়েছি সাহিত্য এস্টাব্লিশমেণ্ট কি ভাবে 'মডার্নি-জ্‌ম্'কে ব্যবহার করছে।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কোনো যোগ নেই। অতি সঙ্কীর্ণ সামাজিক অন্ধ গলিতে তাদের অবস্থান। দেশের লোকায়ত মনোভঙ্গির প্রগতিশীল যে ধারা রয়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে তুলে এই প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ চূর্ণ করা যায়। আমাদের পক্ষেই রয়েছে ইতিহাস, সময়। নিরক্ষর মানুষ (এ রাজ্যের শতকরা ৬৮ ভাগ) এখনো তার গণতান্ত্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ মানব-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ত্যাগ করে চলে যায় নি। যদিও তার বৈষয়িক সংস্কৃতি ও মানসিক সংস্কৃতির স্তর বেশ নীচুই। অথচ তারই জীবনধারার মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক মানবিকতার উৎস যাকে সমাজতন্ত্রের সমুদ্রে পৌঁছে দিতে হবে।

অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বামমার্গের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নানাভাবে রয়ে গেছে। অথচ এরাইতো মুখ্যত বুর্জোয়া-সামন্তবাদী যুগ্ম এস্টাব্লিশমেন্টের সাহিত্য-পণ্যের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার ! কিন্তু আমরাও তো মডার্নিজমের দায়ে আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিক্রিত হয়ে এদের জন্য সাংস্কৃতিক বিষ পরিবেশনের অংশভাগী হয়েছি। এদের প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বের করে আনতেও তো যোগ্য শক্তিশালী সাহিত্যকর্ম প্রয়োজন ছিল। এদের জন্য যোগ্য নায়ক ভিত্তিক, সাহিত্য-মহিমায় উন্নত অথচ পঠনে অদুরূহ প্রগতিশীল ও মানবমুখীন কথাশিল্প যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম—তা

হলে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল এস্টাব্লিশমেণ্ট আমাদের প্রতিরোধ করতে পারত না।

কবিতাকেও পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে সারল্য; আবিষ্কার করতে হবে মানুষের মুখের ভাষার ব্যঞ্জনায় মানবিকতার নানা দিক—যা নানা বিচ্ছিন্নতাকে উত্তীর্ণ করে দেবার সাহস ও সামর্থ জোগাবে।

এ-সব কিছুর জন্য জরুরি যোগ্য সৃষ্টিশীল সমালোচনাও। মার্কসবাদী লেনিনবাদী সমালোচনার ধারা যোগ্যভাবে প্রয়োগ করাও শিখতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা অঙ্গরাষ্ট্রের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, জীবনমুখীন এই সাহিত্যসমালোচনা ধারার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়।

পরিশেষে, নানা বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, মানবপ্রেমী সাহিত্যসেবিদের একটি প্রতিনিধিমূলক সংগঠন সৃষ্টিশীল ক্রিয়ার প্রয়োজনে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ধরা পড়ছে। এখনই কাজে নেমে পড়া দরকার। অমিতাভ দাশগুপ্তকে তাঁর রচনাটির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

অমিতাভ দাশগুপ্তর প্রবন্ধের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে 'পরিচয়' সম্পাদকদ্বয় কোথাও একসঙ্গে কোথাও আলাদাভাবে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্যের মূল্যায়ন-প্রয়াস অনেক সময়ই বিতর্কমূলক হয়। এবং 'পরিচয়'-এর ঐতিহ্য হল কোনো রচনায় যদি সততা ও পারদর্শিতার সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রগতিশীল মূল্যায়নের প্রচেষ্টা থাকে, তবে সম্পাদক কোথাও কোথাও দ্বিমত পোষণ করলেও সে-রচনা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় এবং তা নিয়ে যথোচিত আলোচনাও হয়। কারণ আমাদের বিশ্বাস নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসা ও নিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা সত্যের কাছে পৌঁছতে পারি। এ-কারণেই অমিতাভ দাশগুপ্তর প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা সৃজনশীল লেখক ও পাঠকদের মতামত আহ্বান করেছিলাম।

এই সংখ্যায় তরুণ সান্যালের মতামত প্রকাশিত হল। বলা প্রয়োজন এ-মতামত তাঁর ব্যক্তিগত এবং আমরা জানি তা বহুলাংশে বিতর্কমূলকও বটে।

আমরা আশা করি সৃজনশীল সাহিত্যিক ও সচেতন পাঠকরা এই আলোচনায় অংশ নেবেন। বিতর্কের সমাপ্তিতে সম্পাদকদ্বয়ের যৌথ বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

পুস্তক-পরিচয়

সতীনাথ-স্মরণে। সম্পাদক : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, পাটনা। আট টাকা

কিছুকাল আগে পাটনায় (২১।১১।৭২) বিদগ্ধজনের এক সভায় বিহারের প্রদেশপাল 'সতীনাথ-স্মরণে' গ্রন্থটি উপস্থাপিত করেন। সম্পাদক শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায় বহু যত্নে আর আয়াসে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রচনাগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এই নূতন এবং বিশিষ্ট সংযোজন 'সতীনাথ-স্মরণে' গ্রন্থখানি প্রকাশিত করার গৌরব তাঁরই। এজন্য তিনি ও পাটনাস্থ 'ভারতী ভবন' আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী নিজে পূর্ণিয়ার লোক। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনার প্রসাদগুণমুগ্ধ অজস্র পাঠকের মধ্যে তিনিও একজন। এ গ্রন্থ প্রয়াত লেখকের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রচনা সম্পর্কে কিছু বলার আগে সাধারণভাবে কয়েকটি মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি। ত্রুটির প্রশ্ন তোলাতে এমন যেন ধারণা না হয় যে ভুল ধরানোর উদ্দেশ্যেই তা লেখা। বরঞ্চ, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি বলেই মনে করি, পরের সংস্করণে এ বই আরও শোভনতর এবং নির্দোষ হয়ে প্রকাশিত হতে পারবে যদি সম্পাদক আরও একটু যত্ন সহকারে পরিচ্ছেদ-গুলির বিন্যাস করেন। উপাদানগুলিও সতর্ক অভিনিবেশে পরিবেশিত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রচনাগুলিকে দুইভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথম দিকের রচনাগুলি প্রয়াত লেখকের উপরে লেখা। সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাঁর বন্ধু-বান্ধব পরিচিত ও অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে। তাঁদের কেউ কেউ বা ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ীর সহযোগী সহকর্মী। দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক-গুলি রচনাই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যকর্মের উপর ভিত্তি করে লেখা। এর মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধনিবন্ধ পূর্বপ্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে সংকলিত। এই দুই জাতের রচনা ব্যতীত এ গ্রন্থে আছে বিহারের প্রদেশপালের লেখা একটি

মুখবন্ধ। এ ছাড়া আছে 'সম্পাদকের কথা' (পৃঃ vii) এবং সম্পাদকের লেখা 'ইতিকথা' (পৃঃ ১), সম্পাদকের সংকলিত সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার 'দু-একটি ছেঁড়া পাতা' (পৃঃ ১৫৯) এবং 'পোস্টস্ক্রিপ্ট' নামে সম্পাদকের অন্য একটি লেখা (পৃঃ ১৬৫)। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লেখা তিনটি একত্রিত হয়ে 'ইতিকথা'র মধ্যেই যেতে পারত, অথবা একটি দীর্ঘ ভূমিকার মধ্যে। এতে করে অনাবশ্যকভাবে অন্তত চারবার সম্পাদককে উপস্থিত হতে হত না।…'ছেঁড়া পাতা'গুলি সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্য একটি পুনর্মুদ্রিত লেখার সঙ্গে অনায়াসে একত্রিত হতে পারত একটি পরিশিষ্টের মধ্যে (পৃঃ ১৬৭)। সেই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারত লেখকের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিগুলিকে একত্র করে। উপস্থিত সেগুলি অপরিকল্পিতভাবে সমস্ত বইয়ের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তেমনিই খারাপ লাগে যখন দেখি ১৬১ পৃষ্ঠার পরেই ১৭৫ পৃষ্ঠা এসে যায়। প্রথমটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক থাকে পৃষ্ঠার ওপর এবং দ্বিতীয়টিতে নীচে। আবার পৃষ্ঠা ১৭৬ এর পর আসে পৃষ্ঠা ১৬৩। এখানেও সেই বিসদৃশভাবে পৃষ্ঠাঙ্ক কোথাও উপরে দেওয়া, কোথাও নীচে। একটুখানি যত্ন ও সতর্কতা নিয়ে দেখলে এই ভ্রমপ্রমাদগুলি ঘটে এভাবে বইখানির সৌষ্ঠব হানি করত না।

পরিশিষ্ট (২) অংশে আছে সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্বসমেত ১৬খানি বইয়ের উল্লেখ। 'জাগরী'র কিশোর সংস্করণ ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর দ্বিতীয় চরণ তার অন্তর্গত। 'পরিশিষ্ট' (৩)-এ লেখকের সংগৃহীত ফরাসী গ্রন্থাদির আংশিক তালিকা দেওয়া হয়েছে—এগুলি মৃত্যুর পরে লেখকের আত্মীয়েরা 'চন্দননগর স্থ ইনস্টিট্যুট'-এ দান করেন। শ্রীযুক্তা বাণী রায়ের প্রবন্ধ থেকে আমরা তার পূর্ণ পরিচয় পাই (পৃষ্ঠা ৪৪)। ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের লেখক-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গেই সংকলক অথবা সম্পাদকের পরিচয়ও থাকতে পারত। আমরা আশা করতে পারি, এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে আবার আমাদের সামনে শীঘ্রই উপস্থিত হবে।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বইখানি মোট দুই জাতের রচনায় ভাগ করা—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রথমার্ধে আছে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপর লেখা স্মৃতিচিত্র। সূচী অনুসারে এ খণ্ডের লেখকদের নাম হলো শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, শ্রীফণীশ্বরনাথ 'রেণু', শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা বাণী রায়, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য, শ্রীকৈলাসবিহারী সহায়, শ্রীমতী গৌরী রায় ও

শ্রীনারায়ণপ্রসাদ ভর্মা। কোনও একটি মাত্র লেখা থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের পূর্ণ আলেখ্য পাওয়া যাবে না ঠিকই। কিন্তু সবকটি লেখাকে একত্র করলে প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-চিত্র পাওয়া যায়। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীকৈলাসবিহারী সহায় এবং শ্রীনারায়ণপ্রসাদ ভর্মার—বিশেষ করে শেষোক্ত দুজনার লেখাতে প্রয়াত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আন্তরিক-ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এ লেখাগুলি মূল হিন্দী থেকে সম্পাদক তর্জমা করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি যতটা সম্ভব মূল লেখার মেজাজটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ফণীশ্বর 'রেণু' নিজেও হিন্দী সাহিত্যের একজন স্বনামখ্যাত লেখক। তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীর এককালের রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন—একত্রে কারাবাসও করেছেন। বস্তুত প্রয়াত লেখক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক যোগ নিবিড় ছিল। আলোচ্য নিবন্ধে তিনি অকুণ্ঠ মনে তাঁর গুরুজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দান করেছেন। সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে এ লেখাটি শ্রী'রেণু'-র প্রথম বাঙলা রচনা। লেখাটিতে লেখকের প্রতিভা, আন্তরিকতা ও গতিশীল শৈলী লক্ষ্য করার মতো। আমাদের আশা রইল ভবিষ্যতে শ্রী 'রেণু'-র কলম থেকে বাঙলা ভাষার রচনা আমরা আরও পাব। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে তাঁর পত্নী শ্রীমতী লীলা রায় 'জাগরী'-র ইংরাজী অনুবাদ (Vigil) করেছেন এবং সেটি 'য়ুনেস্কো'-র তরফ থেকে প্রকাশনার জন্য গৃহীত হয়েছে। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শ্বেত তরুলতা' লেখাটি কাব্যসৌন্দর্যে ও স্বকীয় মাধুর্যে সমুজ্জ্বল। দুইজনারই মনের একটি "সহৃদয় হৃদয় সম্বেদ্য" রস এই রচনাটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্তা বাণী রায়ের লেখাটি আর একটু নৈর্ব্যক্তিক হলেই বিশেষ উপভোগ্য হতে পারত। সব লেখাগুলির মধ্যেই সনতারিখ মিলিয়ে সাজানোর একটি ক্ষীণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেটি আর একটু স্পষ্ট হলেই ভালো হত। এই রচনাগুলির মধ্য থেকে মানুষ সতীনাথ ভাদুড়ীর যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছে শ্রীগোপাল হালদার মহাশয়ের রচনার শেষ কয়টি পংক্তি (পৃঃ ৮০): "আমি যেন বুঝতে পারলাম ওঁর জীবনবোধে আন্তরিকতার সঙ্গে এসে মিশেছিল এমন বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা, আর তাই লেখায়ও উজ্জ্বল ভাবধারার সঙ্গে রূপায়ণে বাস্তবতার ঘটেছে সঙ্গতি।"

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি বেশির ভাগই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য-কর্মের উপর টীকাটিপ্পনী ও সমালোচনার পুনর্মুদ্রণ। এ অংশে যাঁদের লেখা আছে তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, শ্রীবিমল কর, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচীন বিশ্বাস, শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্তী, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীভগবান প্রসাদ মজুমদার, শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, এবং শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী। সামগ্রিক ভাবে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা মনোজ্ঞ, শিল্পকুশলতায় ও বিদগ্ধ মনীষায় রসসমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'জাগরী'ই সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাতে আঞ্চলিক ও তাৎকালিক রূপ থাকলেও কালাতীতের স্পর্শও আছে একথা তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্তীও মনে করেন 'ঢোঁড়াই চরিত-মানস'-এ পূর্ণিয়ার আঞ্চলিক ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি আরও মনে করেন 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' 'রামচরিত মানস'-এর ঢঙে লেখা। জোর করে একটা তুলনা হয়তো করা যায়। তবু এই বলাই যথেষ্ট যে সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা বাস্তব চরিত্র নিয়ে—সেখানে রামায়ণের 'টাইপ' বা আদর্শ চরিত্র কোথায়? ফরাসী সাহিত্যে পুষ্টমানস সতীনাথ ভাদুড়ী গম্ভীর 'রাম চরিতমানস'-এর পুরাতন ভাব-পাত্রে নবীন হালকা মেজাজের রস পরিবেশন করে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' রচনা করেছেন একথা বলা খুব অসঙ্গত হবে না। কিছু কৌতুকের সঙ্গে অন্তর্নিহিত একটি তীক্ষ্ণতাও আছে। আর আছে অপরিমেয় সহানুভূতি। এর ফলে চরিত্রগুলি জীবন্ত এবং তাদের রচনাকলা কতকটা পটের শিল্পের মতো দক্ষ তুলিতে টানা অথচ ভাস্কর্যের দৃঢ় কাঠামোয় বিন্যস্ত। বরঞ্চ এই আঙ্গিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়'-এর জীবনীই মনে পড়িয়ে দেয়। শ্রীবিমল করের মতে সতীনাথ ভাদুড়ীর লিখনশিল্প তাঁর উদ্যানকলার মতোই সযত্নে লালিত-পালিত। উভয়েই একান্ত সুকুমার এবং দীর্ঘ অধ্যবসায়ের নীরব তপস্যার ফল। সত্যই সকলে উদ্যানপ্রেমী হতে পারে না। তার জন্যে দরকার বিশেষ ধরনে তৈরি চোখ ও মন। ঠিক এই কারণেই মনে হয় সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা সাধারণ্যে ঠিক সমাদৃত হতে পারে না। উদ্যানের রচনা আর লেখার সাধনার দর্শক তিনি একক, তেমনি পরিশীলিত হওয়া চাই তাঁর পাঠকেরও মন। সৈয়দ মুজতবা আলী যথার্থই বলেছেন—"তাই এই বই কখনই জনপ্রিয় হবে না—আমরা এখনো উচ্ছ্বাস সাবানের বুদ্বুদ ভালোবাসি।"

শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী উভয়েই বিশেষ করে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় 'অন্তঃশীলারীতি' বা Stream of consciousness ধারার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যে এ ধারার প্রথম বাহক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ ও প্রুস্তের এই রীতি পূর্বাপর বহু আধুনিক লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে ঠিকই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সেই অনুকরণ অথবা অনুসরণ খুব সার্থক হয় নি। সতীনাথ ভাদুড়ীও সেই ক্বচিৎ কদাচিৎ ব্যতিক্রমের মধ্যেই পড়েন। শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী উভয়েই এই ধারার লেখকদের এক-একটি তালিকাও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন দুটি তালিকাই অসম্পূর্ণ। শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সতীনাথ ভাদুড়ী "জাত লেখক।" শ্রীশচীন বিশ্বাস আলোচনা করেছেন লেখকের ছোটগল্প নিয়ে। তাঁর ছোট গল্পের বাঁধুনির মধ্যে এক-একটি আশ্চর্য চরিত্র চিত্রায়িত হয়ে আছে। তাদের আকস্মিক মনে হয় না, নিতান্তই তাৎকালিকও নয়; অনেকেই তারা চিরন্তন। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান ছোটগল্প-লেখক ব্রেট হার্টের চরিত্রচিত্রণ মনে পড়ে যায়। শ্রীভগবান প্রসাদ মজুমদার প্রয়াত লেখকের ব্যঙ্গনৈপুণ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যঙ্গকৌতুক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরশুরাম-এর ট্রাডিশন বা পরম্পরায় পড়ে। আমাদের তা মনে হয় না। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে যা ছিল তা একরকমের 'উইট' বলা যায়। আধুনিক যুগের ব্যঙ্গাত্মক রচনা, শ্লেষ্ট রচনা, কৌতুক রচনা সবাই প্রায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্কে আসার ফলে জন্মলাভ করেছে বলা অসঙ্গত হবে না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্বকীয় মহিমায় বিশিষ্ট, তিনিই এক অর্থে বাঙলা ভাষায় 'এ্যাবসার্ড'-এর স্রষ্টা। পরশুরাম-এর প্রথম দিকের রচনাগুলি অন্তত ইংরাজী হিউমারের অথবা নির্মল হাস্যরসের পরিবেশক। বাঙলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, 'কথার পৃষ্ঠে কথার জবাব' অর্থাৎ humour, Satire, Sarcasm ও witticism সবই প্রায় মেশামেশি করে থাকে। জোনাথন সুইফটের তীক্ষ্ণ শ্লেষ সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় নেই। ফরাসী সাহিত্যের যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তা অত্যন্ত স্থূল বাস্তবানুগ। সতীনাথের 'পরিহাস বিজল্পিত' রচনা বরঞ্চ "হাসতে হাসতে কান্না বা কাঁদতে কাঁদতে হাসি"র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তুলনা করলে বলতে হয় এ লেখার মেজাজে অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর-'এর আমেজ আসে। সতীনাথ ভাদুড়ীর হাত চাবুকে অনভ্যস্ত

ছিল। তাঁর অভ্যস্ত হাতে তিনি হাল্কা জলের ঢেউ সহজে সরিয়ে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ভাবমূর্তিকেই তুলে আনতে চেয়েছেন। এই প্রচ্ছন্ন বেদনাই তাঁর বাইরের হাসির আড়ালে ছিল।

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ নাগ ও দিলীপ চক্রবর্তী দুজনাই সতীনাথ ভাদুড়ীর মনস্বিতা ও বিদ্যাবত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রয়াত লেখক ফরাসী ভাষায় ফরাসী সাহিত্যের পরিচয় যে ভালো মতেই পেয়েছিলেন তা তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়। অথচ তাঁর লেখার মেজাজ বিশেষ অর্থে ভারতীয়। একদিকে তাঁর বাচনভঙ্গী হল ভারতীয় কথকের। আবার ফরাসী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের যথার্থ অনুশীলন তাঁকে দিয়েছিল মননশীলতার তীক্ষ্ণতা ও অন্বীক্ষার আন্তরিকতা। ভারতীয় মূল্যবোধকে এমন স্বচ্ছন্দ মাত্রাবোধের মাধ্যমে প্রকাশ করাটাই তাঁর বিশিষ্ট অবদান। সেটাই এই সমস্ত রচনাগুলির একত্র ফলশ্রুতি। সত্যই মনে হয় শিল্পী সতীনাথ মানুষ হিসাবে জীবনশিল্পীও ছিলেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁর সংযুক্ত হয়েছিল জীবনবোধে। আশেপাশের প্রত্যেকটি লোককেই তিনি দরদ দিয়ে বুঝেছিলেন। স্পর্শকাতর মন প্রবুদ্ধ হয়েছিল মানবিকতায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি ছিলেন—

"Rich in experience
Radiant with love".

অরুণা হালদার

To each my Blood : Edited by Prithvindra Chakravarty. Papua Pocket Poets. Port Noresby, 1971.

সুদূর নিউগিনি থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম সমেত দুই বাঙলার আঠারো জন বাঙালি কবির একটি করে কবিতার অনুবাদের একটি সংকলন সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। ব্যাপারটি অত্যন্ত আনন্দের। আনন্দের আরো এই কারণে যে সংকলনের কবিতাগুলি বাঙলাদেশের ১৯২৫

সালের ভাষা আন্দোলনের এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে নিবেদিত। বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের সংকলনকে প্রতিনিধিস্থানীয় করা সহজ নয়। আর, এ-বইটি তো বেরিয়েছে সেই পাপুয়া থেকে!

সংকলনে যে সব কবিতা নেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি আমি মূল বাঙলায় পড়েছি, অন্যগুলি পড়ার সুযোগ ঘটে নি। তাতে একটি সুবিধা অন্তত এই হয়েছে যে, অনুবাদ হিসাবে কবিতাগুলি কেমন উৎরেছে তা বেশ বুঝতে পারছি। যে কবিতাগুলি আগে পড়া, সেগুলি সম্পর্কে আমার খুঁতখুঁতে ভাব আমি ইচ্ছে করলেও তাড়াতে পারছি না। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অতি বিখ্যাত 'আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা' কবিতাটির অনুবাদ এখানে আছে। স্বভাবতই মূল কবিতার ছন্দস্পন্দ, তার সেই অসাধারণ বাক্‌নির্মাণ অনুবাদে আসে নি বলে মনে হয়েছে। তেমনি যে কবিতাগুলি আমি মূল ভাষায় পড়ি নি, যেমন আহসান হাবীব-এর Street song বা Song Majestic, কিংবা কায়সুল হকের you will never know, জসীমুদ্দিনের Song of storm ইত্যাদি, সেগুলির অনুবাদ কিন্তু আমার কবিতা হিসাবেই ভালো লেগেছে।

এই জন্যেই বোধহয় কডওয়েল সাহেব কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা অনুবাদ করা যায় না। যা করা যায় তা হচ্ছে মূল কবিতার ভাব নিয়ে নতুন কবিতা রচনা করা। আমি বাঙলা কবিতা মূল ভাষাতেই পড়ি। তাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা অর্থাৎ যে কবিতাগুলি আমার আগে পড়া, তা পড়তে গিয়েই যেমন আমার মূল কবিতা-গুলির কথা মনে পড়ে গিয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ কবির বিশেষত্বটিকে কবিতায় না পেয়ে খারাপ লেগেছে, তেমনি আবদুল গণি হাজারী, আনিসুজ্জমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, অর্থাৎ কিনা যাঁদের মূল কবিতা আমি পড়ি নি, তাঁদের কবিতা, আমার কিন্তু কবিতা হিসাবেই বেশ ভালো লেগেছে। সংকলনে পশ্চিমবঙ্গের তরুণতর কবিদের অন্যতম সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খুশী হয়েছি।

একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই সংকলনটি মূলত তাঁদেরই জন্য যাঁরা বাঙলা কবিতা মূল ভাষায় পড়েন নি। আর আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু বুঝতে পারছি, অনুবাদক হিসাবে পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী অনুবাদ কার্যে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, কেননা আমি যেমন কয়েকটি কবিতা

অনুবাদের মধ্যে দিয়েই কবিতা হিসাবে উপভোগ করতে পারলাম, তেমনি যাঁরা কারো কবিতাই মূল ভাষায় পড়েন নি তাঁরা নিশ্চয়ই এই সংকলন পড়ে বাঙলা কবিতার, সম্পূর্ণ না হলেও, কিছু পরিচয় পেতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, লক্ষ্য করলাম দূর নিউগিনিতে পাপুয়া বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানান দেশের কবিতার অনুবাদ করে চলেছেন। এতে করে তাঁদের নিজেদের কাব্যধারাই পুষ্টি লাভ করবে। আমাদের দেশেও তো কবিরা বলেন যে এখানেও একটি কাব্য-আন্দোলন চলছে। তাঁরা কি অন্তত প্রতিবেশী রাজ্য-গুলির কাব্যধারার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য এ রকম একটা চেষ্টা শুরু করতে পারেন না? কিংবা সাময়িক পত্রিকাগুলি? এটা খুবই জরুরি প্রশ্ন। এটা করা হলে আমাদের নিজেদের সম্পদ যেমন বাড়বে তেমনি অনেক মিথ্যা অহমিকার ফানুসেও খোঁচা লাগতে পারে, যা আমাদের নিজের সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই হিতকর হবে বলে আমার ধারণা।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

যেখানে প্রবাদ। মৃণাল বসুচৌধুরী। বিশ্বজ্ঞান। তিন টাকা

স্বাভাবিক, শ্রীযুক্ত মৃণাল বসুচৌধুরীর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'যেখানে প্রবাদ' (অক্টোবর, ১৯৭২) ল্যাকারিং করা রঙচঙে মলাট, পুরু ম্যাপলিথো কাগজ, পরিষ্কার ছাপা—এই সব ব্যয়বহুল সাজগোজে প্রাথমিকভাবে আমাদের চোখ কাড়বে। বইখানি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়; এই রকম সুশ্রী প্রকাশনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁদের সশ্রম উদ্যোগের জন্যে জানাতে হয় সাধুবাদও। তবে মৃণালবাবুর কবিতাগুলি এইরকম কোনো তাৎক্ষণিক প্রতি-ক্রিয়া তৈরী করতে পারে না। অনেক আসাযাওয়া, বিবেচনা, পিছু হাঁটাহাঁটির পর আমাদের বলতে হয়—কিন্তু পরের কথা পরেই বলা ভালো।

কারো কারো হাত থেকে এমন কবিতা বেরিয়ে আসে যা পড়ামাত্রই পাঠক বলে ওঠেন: বাহ্। প্রথম পাঠেই প্রেম জন্মে যায়। মনে হয় না কবিতা আদৌ কোনো সেরিব্রাল নিরীক্ষার বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ এমনি একটা বিভ্রম। বিভ্রম, যেহেতু কিছুটা মাথা ঘামাতেই হয়। কবিতার মর্মমূলে

ঢোকার ছাড়পত্রই হচ্ছে সংবেদ আর মননের শুভ যোগাযোগ। তা নইলে প্রথম দর্শনে প্রেম জন্মালেও তার বৃদ্ধি, ঘনতা, স্থায়িত্ব ও বহুতর সম্ভাবনায় পল্লবিত হবার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তবু অস্বীকার করা যায় না, কিছু কিছু কবিতা পাঠককে সঙ্গে সঙ্গেই জিতে নেয়। মৃণালবাবুর কবিতায় কিন্তু এমনিতর জিগীষা একেবারেই নেই। 'যেখানে প্রবাদ' বইখানি সেদিক থেকে বেশ অহঙ্কারী, রাশভারী। এক্ষেত্রে পাঠককেই এগিয়ে আসতে হবে; যে মিত-ভাষিতা ও সংকেতময়তা মৃণালবাবুর কবিতায় প্রকীর্ণ তার যাথার্থ্য, অপরিহার্যতা পরখ করে দেখতে হবে। হয়তো তাঁর প্রমিতভাষণের গম্ভীর ভূপৃষ্ঠ খুঁড়ে দেখলে মিলতেও পারে টলটলে ঠাণ্ডা জল।

বস্তুত মৃণালবাবুর কবিতার প্রযুক্তি অনেকদিন থেকেই এইরকম মুখচোরা, বলা-না-বলায় সম্বৃত। তাঁর আগের বই 'শহর কলকাতা'য় (এপ্রিল ১৯৭০; প্রকাশক: অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯) লক্ষ্য করেছি তাঁর আভাস, বিলাসী উচ্চারণের প্রবণতা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত চার বছরের কবিতার এই স্বনির্বাচিত সংকলনে বেশ বুঝতে পারি কিছু প্রতীকী শব্দের আড়ালে তিনি আত্মগোপন করে আছেন। কবিতার দীক্ষিত পাঠককে দায়িত্ব নিতে হয় এই নিহিত ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটনের। "থামো / এখানেই ছোট হবে নদী / জেগে উঠবে বালুচর রাজ্যপাট গীর্জা ও মন্দির…" লাইনগুলি পড়বার সময়, পড়া হয়ে গেলে—আমি এই বইয়ের প্রথম কবিতা 'এখানেই' সম্বন্ধে বলছি—আমাদের একটু থামতেই হয়। "এখানেই ছোট হবে নদী"—কী বলতে চান কবি? সম্ভবত অভিজ্ঞতা, সম্ভবত পৃথিবী, দিন থেকে দিনান্তরে প্রবহমান ঘটনাস্রোত যা আমাদের চেতনাচেতনে আঘাত করে, সেদিকেই আঙুল দেখাচ্ছেন তিনি। দৈনন্দিন জীবনেই পেয়ে যাব ভূপর্যটনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ "প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ম্লান ঘণ্টাধ্বনি / হরিণশিশুর কাছে বিপন্ন ময়ূর / হারানো পাখির হাড় / ঘোরানো সিঁড়ির মতো সমস্ত কিছুই / উঠে আসবে একে একে…।" অর্থাৎ বিষাদ, আবর্তমান পর্যায়ক্রমিক বিষাদ। আবার 'জলপ্রপাতের শব্দে', 'গতিপথ'-এর মতো ছোট ছোট কবিতায় লুকিয়ে রয়েছে বস্তুবিশ্বের 'গোলাপের গন্ধ' আর 'কিছু রক্ত কিছু অন্ধকার'-এর প্রতি মমতা এবং বিপর্যস্ত দিনযাপনের পটভূমিতে মানুষের বিমূঢ় লক্ষ্যহীনতা। ভালো লাগে, এইসব কবিতার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই আবিষ্কারের আনন্দ, কবিকে চিনে নেওয়ার পরিতৃপ্তি। সেই সঙ্গে টের পাই আমাদের কোনো কোনো অনুভবের সঙ্গে তাঁর মেজাজের

শিল্পগত অন্তরঙ্গতা। এমনিতর কবিতা একটা পর একটার পড়তে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের জন্য কিছু কৌতূহলী হয়ে পড়ি। 'যেখানে প্রবাদ' যেন এই কৌতূহলেরই চার ফর্মাজোড়া নিরসন।

কিন্তু মৃণালবাবুর কবিতার অবয়ব এখানেও প্রায় একই রকম—সেই ছোট ছোট যতিচিহ্নহীন লাইন, সেই কবিত্বসংকুল শব্দপুঞ্জের প্রতীকী সংস্থান, সেই প্রমিতি। প্রায়, কেননা এই গ্রন্থে কবিকে ছন্দের গণিত সম্পর্কে—অন্তত অক্ষরবৃত্তে—অনেক বেশি সচেতন, আর সেজন্যেই প্রযুক্তিগত ব্যাপারে তাঁকে কিছু অগ্রসর মনে হল। এখানেও তিনি চরণগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সাজিয়েছেন, কিন্তু বেশ হিসেব করে। এক-একটি লাইন অক্ষরবৃত্তের বিধিবদ্ধ পর্বে-মাত্রায় সম্পূর্ণ; এগুলোকে যোগ করলেই এই ছন্দের সাবেকি, শাস্ত্রসিদ্ধ চেহারাটি পুরোপুরি দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'শবাধারে ফুল রেখে' কবিতাটিকে তিনি এইভাবে সাজিয়েছেন; "শবাধারে ফুল রেখে / চলে গেলে / ভেবেছ কি দায়িত্ব ফুরোবে / পেছনে মিছিল আছে / দীর্ঘশ্বাস বিষণ্ণ চোখের / ঘুমন্ত চিবুকে ম্লান ছায়াপাতে / বিপর্যস্ত যেদিকেই চাও…"ইত্যাদি। সামান্য মনোযোগেই এর ৮+৪+৪+৬, ৮+১০, ৮+৪+৪+৬ মাত্রার চাল ধরা পড়ে। ভালো লাগে ভাবতে, ব্যাপক ছন্দকানা পদ্যচর্চার সাম্প্রতিক দুর্যোগে শ্রীযুক্ত বসুচৌধুরী আমাদের সামনে শিক্ষিত ছন্দোনৈপুণ্যের বিরল দৃষ্টান্ত রাখলেন। কিন্তু শুধু নিখুঁত ছন্দেই যে কবিতা নিখুঁত হয়ে ওঠে না—এই পুরোনো কথাটাও এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার। ছন্দ কবিতার সাফল্যের অন্যতম যদিও একমাত্র উপায় নয়। আসল কথা কবি আর পাঠকের মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা কবিতার মধ্যস্থতায় তৈরি হচ্ছে কিনা। সেক্ষেত্রে মৃণালবাবুর কবিতাগুচ্ছ আগের তুলনায় অনেকখানি আত্মমুখী, পাঁচিল-তুলে-দেওয়া দুষ্প্রবেশ্য দুর্গের মতো গম্ভীর। "ঘুমন্ত গোড়ালি দেখে / নতমুখে দাঁড়ায় যৌবন / ভেঙে যায় ঘরবাড়ি / স্বপ্নের ভেতরে ছোটে ঘোড়া / জমাট বরফে ঢাকা ঘাসের ওপরে / পড়ে থাকে মুণ্ডহীন দেহ"—পড়ার সময় মনে হয় 'শহর কলকাতা'র কবি আমাদের কাছ থেকে বেশ দূরে সরে গিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছেন। সত্যিই কৌতূহল ছিল আমাদের তাঁর সম্পর্কে, সহজাত সংবেদনশীলতা নিয়ে আমরা রাজি ছিলুম তাঁর কবিতার ভেতর থেকে কোনো বিশেষ মেজাজ অথবা বার্তা নিষ্কাশন করে নিতে। কবিতা যে কবি আর পাঠকের যৌথ সংরচন—এমনি একটা কান্তিতত্ত্বেও আমাদের সমর্থন ছিল, আছে; কিন্তু এটা কী? কবিতা কি

কিছুই জানাবে না আমাদের, এমন কি মৃণালবাবুর যত্নলালিত সৌখিন ইঙ্গিতেও নয় ? 'ঘুমন্ত গোড়ালি', 'স্বপ্নের ভেতরে ছোটে ঘোড়া', 'মুণ্ডহীন দেহ' শব্দগুলো আমাদের সামনে সারিসারি ভিনদেশী তন্ত্রমন্ত্রের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে ; এক বর্ণও আমরা উদ্ধার করতে পারি না। এমনিভাবে 'কাঁটাতারে দীর্ঘায়ু বেড়াল,' 'যেমন প্রবাদ', 'ছায়া,' 'পায়ের ধুলোয়' ইত্যাদি কবিতাগুলো বারবার পড়ে ভাবতে বাধ্য হই, মৃণালবাবু হয়তো শব্দ থেকে অর্থকে পুরোপুরি বিদায় দিয়েছেন, অথবা, দয়া করে এক-আধকণা কোথাও কখনো রাখতেও পারেন ; কিন্তু আমরা তার হদিশ পাই না। বলা ভালো, হদিশ পেতে গিয়েও হারিয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে—এত সামান্য, এত পাতলা, দুর্বল সেই অর্থবোধ। যেমন, 'পায়ের ধুলোয়' কবিতাটির কথাই ধরা যাক : "পায়ের ধুলোয় মেশে রঙ/চৌকাঠ পেরোলে মাটি/ মাটির তলায় ভাঙা/ কাঠের পুতুলে নয়/ অনভিজ্ঞ পাখির পালকে কাঁপে ভয়"—কী জানি, সসঙ্কোচে বলতে ইচ্ছে হয়, রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতার বাইরে কোনো রোম্যান্টিক অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে কিছু বলছেন কবি ? তার পরই আচমকা এসে গেল ধুলোর অনুষঙ্গ ছেড়ে সার্কাসের এরিনা ; "তবুও থামেনি কোন উৎসব/থামেনি ভয়ার্ত হাতি/মৃদু বাজনার তালে/প্রথামত নেচেছে ভালুক"—না, সমস্ত গুলিয়ে গেল, এবং হাল ছেড়ে দিলুম। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক কিছু বলতে চেয়েছেন এই মাতৃভাষার ছদ্মবেশী গ্রীকে। আমরা সেটা ধরতে পারছি না। স্বীকার করি, সব কবিতাই জলবৎ স্বচ্ছ হয় না ; কিছু কবিতা ইঙ্গিতময়, সঙ্কেতবহ, অনুষঙ্গপ্রধান হতেই পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ যথাসাধ্য সেই ইঙ্গিত, সঙ্কেত আর অনুষঙ্গের মাটি খনন করা, তার গভীরে গাহন করা, কবির সঙ্গে আমাদেরও একরকম কবি হয়ে ওঠা। কিন্তু সেই শ্রম—বলা বাহুল্য কাজটি শুধু সংবেদশীলতার নয়, মস্তিষ্কেরও—শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল ঘর্মপাতে পর্যবসিত হলে দোষটা কার ? আসলে ব্যক্তিসাক্ষিক আর ব্যক্তিগত শব্দদুটোর মধ্যেকার পার্থক্য কবি যেন জ্ঞাতসারেই স্বীকার করেন না। 'যেখানে প্রবাদ'-এর দু-একটা কবিতা ছাড়া সবগুলোই আমাদের মনে হয় মৃণালবাবুর ব্যক্তিগত জিনিস। ব্যক্তিগত ভাঙাভাঙা প্রতীকের ব্যবহারে৷ ব্যক্তিগত অনুষঙ্গচ্যুত কল্পপ্রতিমার নির্মাণে, শব্দ আর বাক্যবন্ধের সম্পর্কের চেতনায়। মিতকথনে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু যেটুকুও বা বললেন তা এত পুরু আস্তরণের তলায় লুকনো যে আমাদের স্বস্থানে প্রস্থানই পরিণাম হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে, 'পরিবর্তে', 'এখন,' 'শবাধারে ফুল রেখে'র মতো কবিতার বিরল

ব্যতিক্রম আমাদের আরাম দেয়। "ঠিক কোথায়/দাঁড়িয়ে আছি/বলতে পারিনা/বলতে পারিনা/ঝরবে বকুল না পোকামাকড়" (এখন)—না, কোনো অসুবিধে নেই এইসব কবিতায় ; এখানে তাঁকে ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিসাক্ষিক, লিরিক্যাল মনে হয়। যেন তাঁর অনুভবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পাতা হয়ে যায়, স্পর্শ করা যায় কবির অসহায়, স্থৈর্যহীন বিপন্ন ব্যক্তিত্ব যা এই উদ্ধৃতিটুকুতে অক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু কম, খুবই কম এমনিতর আমন্ত্রণময় কবিতা। 'যেখানে প্রবাদ'-এর মূল সুর—অবশ্য সুর বলে যদি আদৌ কিছু থাকে—অর্থাৎ অধিকাংশ কবিতার অন্তর্গত চূড়ান্ত আত্মসর্বস্বতার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সবিনয় অনুরোধ, এমনিতর কবিতাই তিনি আমাদের উপহার দিন যাতে আধক অন্তত তিনি ধরা দেন, বাকি অর্ধেকের দায় আমাদের। তিনি ছন্দসজাগ, শব্দসচেতন, কবিতার ভাষা সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত—'শহর কলকাতা' পড়ে আমাদের এই রকমই প্রতীতি জন্মায়, আর সেজন্যে কৌতূহলও জেগেছিল তাঁর পরবর্তী বই সম্পর্কে—ন্যায্যতই আশা করতে পারি, আমাদের নাগালে তাঁকে ধরতে পারব তাঁর শিল্পসম্মত মিতভাষিতা আর গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে।

শিবশম্ভু পাল

কোজিনৎসেভের হ্যামলেট

......I think that every classical art changes during the epoch. For every new generation a classical art has a new sense and many new meanings. Now Hamlet, in our understanding and in our feeling, is a modern theme in many of its parts.

—Kozintsev

কোজিনৎসেভের হ্যামলেট অসাধারণ; ভিসকন্তির 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর পর এত সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ ছবি কলকাতায় আমাদের দেখবার সুযোগ হয় নি। হ্যামলেট সার্থক, কারণ শেকস্পীয়রের সাহিত্যকে এত দক্ষতার সঙ্গে "visual content"-এর জগতে অনুবাদ করা হয়েছে যে কখনও হ্যামলেট-কাব্যরসের অনুভব কমে গেছে বা থমকে যেতে হয়েছে, এরকম ঘটে নি। অথচ এরকমও মনে হয় নি যে দূর কোনো ক্লাসিক পৃথিবীর চিত্ররূপ আমাদের শুধুমাত্র অজানা আগ্রহের টানে বসিয়ে রেখেছে। হ্যামলেট অসম্ভব সমসাময়িক, অত্যন্ত মানবিক। আমাদের এই বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য সময়েও হ্যামলেটের সঙ্গে আমরা একটা আন্তরিক সম্পর্কে আসতে পেরেছি। কারণ, মানবিকতার শর্তই হল কারাগার চূর্ণ করা, পৃথিবীটাকে পাল্টানো—হ্যামলেট সেই চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখে নি। টাইটেলের পাথর আর মশালের আগুন—কারাগার আর মুক্ত-চেতনার এক নিঃশর্ত ডায়ালেকটিক। হ্যামলেট বনাম অন্যায় আর ত্রাসের রাষ্ট্রশক্তি। উইটেনবার্গের ছাত্র হ্যামলেট, মার্টিন লুথার, ডঃ ফসটাস। হ্যাম-লেটের মধ্যে রেনেসাঁস ও প্রোটেসটান্ট বিশ্বচেতনা মিশে যায়। হিউম্যানিটাস বনাম ফেরিটাসের লড়াই। আজকের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?

লেনিনগ্রাদের পুশকিন অ্যাকাডেমিক থিয়েটারে কোজিনৎসেভ যখন পাস্তেরনাক-অনূদিত হ্যামলেট পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন পাস্তেরনাক তাঁকে বলেছিলেন—"Cut, abbreviate, slice again, as much as you

want. ......it is your right."—কোজিনৎসেভ কথা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, চোখে দেখার বিষয় অনেক বেশি, এবং ফিল্মে তাই হওয়া উচিত। অবশ্য তিনি লরেন্স অলিভিয়ারের মতো ডেনমার্ক, রসেনক্রানৎজ ও গিলডেনস্টার্ন, ফরটিনব্রাস—সবকিছু বাদ দিয়ে এক নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের কাহিনী বলেন নি। হ্যামলেটকে তার দেশ ও সময়ের মধ্যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এমন কি বিষে শরীর থিভিয়ে আসার সময়ে হ্যামলেট যখন আড়ষ্ট পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, সেখানেও কথা অনেক কম "the rest is silence" ভীষণ নগ্ন ও স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। হ্যামলেট যেন হাত তুলে কোনো এক দিক নির্দেশ করতে গিয়ে থেমে যায়। এই মুহূর্ত অসীম, শুধু ট্রাজেডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এবং গভীর অর্থবহ।

ছবির শুরুতে প্যারালেল ট্র্যাকিং শটে হ্যামলেট যখন ঘোড়া ছুটিয়ে আসে তখন আকাশের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ, অশুভ সম্ভাবনার এই পরিবেশ আকাশ, মেঘ, পাথুরে জমির নিজস্ব রঙে নির্মমভাবে ছবির মুড তৈরি করে দেয়। ডিপ ফোকাস লেন্সের ব্যবহারে বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। এ ছবির নির্মাণ একেবারেই কায়দা-বর্জিত কিন্তু এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা আমার কাছে আইজেনস্টাইন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ বলে মনে হয়েছে। এই ছবির মন্তাজ-পদ্ধতি নতুনতর—শটের কাটিং পয়েন্টে না কাটার ফলে সম্পূর্ণ নতুন এক rhythm তৈরি হয়েছে। এবং হ্যামলেটের অনেক সংলাপ দৃশ্যের সঙ্গে এক Counterpoint ও tension সৃষ্টি করেছে যার ফলে হ্যামলেটের চিন্তার জগতে পৌঁছতে দর্শকের অনেক সুবিধা হয়েছে। একই ফ্রেমের মধ্যে দ্বান্দ্বিক উপাদানগুলি সাজানোর একটি সার্থকতম উদাহরণ এই ছবি। অভিনেতাদের সঙ্গে হ্যামলেটের দৃশ্যগুলি যার প্রমাণ—সেখানে মুকুট, হ্যামলেট, অভিনেতারা সকলেই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে যুক্ত। আরও বিস্ময়কর যে প্রতিটি অংশের ও অংশগত দৃশ্যের মধ্যে পরিচালকের কি পরিমাণ চিন্তা কাজ করেছে! যেমন প্রেতাত্মার দৃশ্যের আগে ঘোড়াদের ভয় পাওয়ার দৃশ্যটির কোনো তুলনা নেই। ম্যাকবেথের সেই ঘোড়া। লাগাম ছিঁড়ে ঘোড়ার ছুটে যাওয়ার ছবিটি দেলাক্রোয়ার ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং তারপরে স্লো-মোশানে হ্যামলেটের পিতার প্রেত আসে। যন্ত্রণায় করুণ এক মুখবর্মের নিচে আমরা যেন কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাই। কারণ, কোজিনৎসেভের ভাষায়—"the ghost is not a mystic apparition, but a character, endowed with human thoughts and

emotions ; perhaps this makes it possible to think that the importance of the father's ghost lies not in the fact that he is a ghost but in that he is a father."—অলিভিয়ার মমির মাথা দেখিয়েছিলেন। মন্তব্যের কোনো দরকার নেই। এই অংশে আমার কাছে যেটা অসাধারণ লেগেছে সেটা হল—"বিষ"—এই ভয়াবহ কথাটির উচ্চারণের সময় অন্ধকার সমুদ্রের ওপর ক্যামেরা থেমে যায়, যেন সমুদ্র বিষ হয়ে গেছে। এই দৃশ্য আমার কাছে এপিক এবং শুধুমাত্র এই দৃশ্যটুকুর জন্য কোজিনৎসেভের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা যায়।

কোজিনৎসেভের হ্যামলেটের যে কোনো অংশ ধরে বিশ্লেষণ করলেই এই যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধির খোঁজ পাওয়া যাবে। দেশী ও বিদেশী বহু পত্রপত্রিকায় অনেক আলোচনা চোখে পড়েছে। তার মধ্যে কিছু ডিটেল সংক্রান্ত কথা আমি কোথাও দেখি নি, অথচ আমার মনে হয়েছে যে এগুলি প্রমাণ করে এই ছবির পেছনে কি পরিমাণ শ্রম ও চিন্তা রয়েছে। গার্ট্রুডের ঘরে পোলোনিয়াসকে হত্যা করার দৃশ্যে ভারি পর্দা ছিঁড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওপারে মাথাবিহীন কয়েকটি ম্যানেকিন দেখা যায়—রাণীর পোশাক ঠিক ঠিক মাপে রাখবার জন্য ঐ ম্যানেকিন। হ্যামলেটের এই অনিচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষী ওরা কারা? কবন্ধ রাষ্ট্রশক্তি? মানে খোঁজবার বাতিক বলে প্রমাণিত হবার পূর্ণ সুযোগ যদিও এখানে রয়েছে, তবুও ঐ দৃশ্য বিস্ময়কর।

পিতার মৃত্যুতে শোকপালনের জন্য পুষ্পসদৃশ ওফেলিয়াকে প্রথা অনুসারী সজ্জার জন্য লোহার ফ্রেম পরিয়ে দেওয়া এবং কিছুটা অজ্ঞান অবস্থায় ওফেলিয়ার দুহাত তুলে আত্মসমর্পণের অসহায় অবস্থা কি নির্মম। এবং সমস্ত ছবিতে পাথর আর কঠিন পাথুরে মাটি, সমুদ্র, এলসিনর দুর্গের দাঁতওয়ালা গেট—শুধু নিমজ্জিত ওফেলিয়ার দৃশ্যে একটা গাছ দেখা যায়, শ্যাওলা, ছোট ছোট মাছ। এরপরেই কবরের দৃশ্য—যোরিকের খুলি হাতে নিয়ে হ্যামলেটের চূড়ান্ত প্রশ্ন—কঙ্কাল-মস্তকের চোখের কোটর দিয়ে ঝুর ঝুর করে বালি পড়ে, ক্লাউনের কান্না নিয়ে তামাশা করার মতো। শ্রমিক কবর-খনকের রুটি আর মদ খেয়ে নেওয়ার কথাও ভোলা যায় না। কফিনের ওপর পেরেক ঠোকার শব্দ বুকের মধ্যে গিঁথে যায়…সমস্ত ডেনমার্ক কারাগার, কিন্তু কারাগারের আকাশে একটা পাখি সমস্ত আকাশ বেড় দিয়ে উড়ে যায়…হ্যামলেটের শেষ জবাব সে তরবারিতেই দেয়—ক্লদিয়াসের ঘৃণ্য চক্রান্তে জীবন দিতে হলেও

হ্যামলেট প্রমাণ করে যে বুদ্ধিজীবীরাও প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরতে জানে। উইটেনবার্গের ছাত্র দার্শনিক হ্যামলেট শেষ সংগ্রামে তুলনাহীন।

হ্যামলেট রাজা ও তার চাটুকার পারিষদবর্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানায়। পোলোনিয়াসের মৃতদেহ খোঁজবার দৃশ্যগুলি বার বার এই চ্যালেঞ্জকে স্পষ্ট করে তুলেছে। জুতোর মধ্যে থেকে পাথর বের করবার দৃশ্যটিতে হ্যামলেট রসেনক্রানৎজ ও গিলডেনস্টার্ন সমেত সমস্ত মিথ্যাবাদীদের নিয়ে তামাশা করে, রাজার কক্ষে ঢোকবার সময় মশাল ছিনিয়ে নিয়ে ঢোকে—যেন সমস্ত অন্যায় ও নীচতাকে সে তছনছ করে দেবে। পিতার হত্যার ঘটনা জানবার পর রাজপুত্র হ্যামলেটের প্রাসাদের মেঝেতে বসে থাকবার দৃশ্যটি থেকে হ্যামলেটের চ্যালেঞ্জ প্রকাশ্য হয়ে পড়ে, যার শেষ হয় ঘৃণ্য ক্লদিয়াসকে হত্যা করায়। স্মিরনভের কট্টর তাত্ত্বিকতার মধ্যে যেটুকু নেবার আছে কোজিনৎসেভে তার চেয়ে বেশি কিছু নেই। ফরটিনব্রাসকে শুধুমাত্র সফল বুর্জোয়া বলে মনে হয় না, নতুন যুবশক্তি হিসেবেও সে নিজেকে চিহ্নিত করে। অলিভিয়ার সংস্করণে মানুষ সম্বন্ধে হ্যামলেটের কথাগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ কয়েকটি মানবতায় আস্থাসূচক কথা বাদ দিলে হ্যামলেটের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তখন হ্যামলেট আর ভ্লাদিমির বা এস্ত্রাগনে কোনো তফাৎ থাকেনা, যারা বেকেটের নাটকের শেষে চলে যাওয়ার কথা বললেও চুপ করে বসে থাকে। হ্যামলেট চুপ করে বসে থাকার লোকই না। আর হ্যামলেট চরিত্রে কোথাও কোনো আতিশয্য নেই। আত্মহত্যা করা না-করার জায়গায় অলিভিয়ার ছুরি হাতে যা করেছিলেন তা অত্যন্ত মোটা দাগের।

কোজিনৎসেভ ডেনমার্কের জনগণকে দেখিয়েছেন—প্রথম যখন ক্লদিয়াসের নতুন বিবাহের কথা ঘোষণা করা হয় এবং শেষ যখন হ্যামলেটের মৃতদেহ দুর্গের বাইরে নিয়ে আসা হয়। যদিও হ্যামলেট এদের অনেক কাছের লোক তবুও দুর্গের ভেতরের জগত এদের কাছে অপরিচিত। তারাই ডেনমার্ক। হ্যামলেটকে তারা চুপ করে দেখে, একটা ছোট ছেলে শুধু নড়াচড়া করে। জনগণের সঙ্গে হ্যামলেটের এই ব্যবধান কোজিনৎসেভ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। দুর্গের ভারি দরজা খোলবার যাঁতাকলে শ্রমিকদের রোমান ক্রীত-দাসদের মতো দেখায়। ক্লদিয়াসদের বিরুদ্ধে অসিধারণ করে হ্যামলেট এদের পক্ষ নেয়, তা সে জেনেই হোক, অজান্তেই হোক। সম্ভবত হ্যামলেট জানত, কারণ সেই তো বলেছিল যে ডেনমার্ক কারাগার।

হ্যামলেটের ভূমিকায় ইলোখেনতি স্মোকতুনোভস্কির অভিনয় অভিনয়-জগতের এক আশ্চর্য বিস্ময়। মিখাইল রমের 'নাইন ডেজ অফ ওয়ান ইয়ার' অথবা 'চাইকোভস্কি'-তে আমরা তাঁকে দেখেছি। নিঃসন্দেহে হ্যামলেট তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। শুনেছি, 'টেমিং অফ দা ফায়ার' চলচ্চিত্রে তিনি রকেট-বিজ্ঞানের জনক সিওলকভস্কির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। স্মোকতুনোভস্কি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের একজন পার্টিজান যোদ্ধা, এখন মালি থিয়েটারের নিয়মিত অভিনেতা। ওফেলিয়ার ভূমিকায় ভার্তিনস্কায়া ও ক্লদিয়াস, গার্ট্রুড, পোলোনিয়াস, লেয়ার্টাস—প্রত্যেকটি ছোট বড় ভূমিকার অভিনয়ই বিশ্বমানের।

সুরকার সোস্টাকোভিচের সঙ্গে কোজিনৎসেভের যোগাযোগ নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ থেকে চলে আসছে। সোস্টাকোভিচের সঙ্গীত এই চলচ্চিত্রের এক অসাধারণ সম্পদ। ওফেলিয়ার নাচ শেখার সময় তারযন্ত্রের মিষ্টি বাজনা হৃদয় স্পর্শ করে। আবার পিতার প্রেতাত্মা দেখবার সময় ও হ্যামলেটের শেষ-যাত্রার সঙ্গীত একেবারে অন্যরকম—রাজকীয়, গম্ভীর ও অতলস্পর্শী। এক্স-প্রেশনিস্ট পর্যায়ের 'দা নোস' এবং মহান 'লেনিনগ্রাদ সিম্ফনি'-র স্রষ্টার হ্যামলেট সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাজকীয় স্ট্র্যাভিনস্কির কোনো কোনো সঙ্গীতাংশ মনে পড়ে। স্ট্র্যাভিনস্কি কথিত 'গ্রেট ট্র্যাডিশান'-এর সত্যতা সস্টাকোভিচ আবার প্রমাণ করলেন।…"Shostakovich will compose new music for my Hamlet. He has composed music for other of my films but for this he has a special interest. We began working during the silent period…"

বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের অনেকে হ্যামলেট সম্বন্ধে (এবং শেকস্পীয়র সম্বন্ধেও) ঝুড়ি ঝুড়ি বাজে কথা আমাদের শিখিয়েছেন যা প্রায় ঘুমন্ত লোকের কানে বিষমন্ত্র ঢেলে দেওয়ার মতোই ব্যাপার। যেমন এলিয়ট সাহেবের মতো বিজ্ঞজনও মাঝে মাঝে কি অমোঘ ভ্রান্তিরই না শিকার হন। এলিয়ট তাঁর Hamlet and his Problems শীর্ষক প্রবন্ধটিতেও বহু "buffonery" এবং "adolescent" মানসিকতা সমৃদ্ধ যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে এই জাতীয় একটি উক্তি ছিল—"We must simply admit that here Shakespeare tackled a problem which proved too much for him." একটু ঘুরিয়ে বললে কথাগুলো তাঁর এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার সম্বন্ধেও খেটে যায়। হ্যামলেট এঁদের দুজনের তুলনাতেই বড় কঠিন। অলিভিয়ার সংস্করণে হ্যামলেট ফাঁকা

সিংহাসনের দিকে উঠে যায়। অতএব, হাতে থাকে শূন্য বা অস্তিত্ববাদের ফাঁকা আস্তিন। কোজিনৎসেভের হ্যামলেট শুধু বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীল ভূমিকাটুকুই পালন করে না—পৃথিবীর পাল্টানোর চেষ্টায় সে মার্কসের ভাষায় মানবিক মুহূর্তগুলির চিরায়ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, মানুষের activity, essence ও action কে সমার্থক বলে প্রমাণ করে। খোলা তরোয়াল হাতে হ্যামলেট যখন ক্লদিয়াসের দিকে ছুটে যায় তখন অ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিক-ভিয়েতনামের মুক্তি-সৈনিকদের একজন শুভানুধ্যায়ী অগ্রজকে স্পষ্ট চেনা যায়। কারণ, সেখানেও বিষ-বিশারদদের শেষ করা হচ্ছে। নির্মীয়মান পৃথিবীর সেই মডেলে হ্যামলেট ও ওফেলিয়া বেঁচে থাকে এবং ডেনমার্কের সমস্ত কারাগার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষ সেখানে যুক্তিতে মহান, সৃষ্টি ক্ষমতায় অপরিসীম···

রাজনীতি বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান করার কথা বিশ্বাস করি না। কোজিনৎসেভের এই অত্যন্ত আধুনিক তথা সেকস্পপীয়রিয় ও মানবিক শিল্প-সৌধটিও অনবদ্য 'মুক্ত' রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়ায় নি। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ বেয়াদব তামাশা করে সমালোচনার শিরোনাম লেখা হয়েছে, 'হ্যামলেট ইভানোভিচ' এবং মতামতেও সমঅনুপাতে আয়রনি ও মরচে। কিছুদিন আগে ঐ পত্রিকাতেই 'ক্রেনস আর ফ্লাইং'-খ্যাত মিখাইল কালাতোজভের 'দা রেড টেন্ট'-এর সমালোচনায় বলা হয়েছিল যে ছবিটি নাকি কোনো একজন রুশ দ্বারা পরিচালিত। আঁদ্রে জিদ একবার একদল ক্ষুদে লুম্পেনকে অশক্ত ভের্লেনের গায় ঢিল ছুড়ে তামাশা করতে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন আহত ঈগলকে কাকের বাচ্চারা ঠুকরোচ্ছে।

পরিচালক গ্রেগরী কোজিনৎসেভ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। কলকাতায় তখন হ্যামলেট চলছিল। তাঁর পরিচালিত কিং লিয়ার আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবার সুযোগ পাব। এই সমালোচনার প্রয়াস কোজিনৎসেভের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করারই একটি চেষ্টা মাত্র।

নবারুণ ভট্টাচার্য

বিবিধ প্রসঙ্গ

আ মরি বাংলা ভাষা

গত বছর ৫ই মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষার দাবি সম্বলিত কতগুলি সুদৃশ্য পোস্টার হাতে "মোদের গরব মোদের আশা…" গান গাইতে গাইতে সুরেন্দ্র উদ্যান থেকে বিধানসভার অভিমুখে মিছিল করে যান। পথে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে এবং তাঁরা সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে এই অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পথসভা ও কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মিছিলকারীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে বিধানসভাভবনে আহ্বান করেন। শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী মিছিলকারীদের কাছে ফিরে এসে ঘোষণা করেন: বিধানসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এখানে আসতে পারলেন না। বাংলা ভাষার এই দাবি ন্যায়-সম্মত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি এই দাবির পক্ষে। পি. ডি. এ.-র সতেরো দফা কর্মসূচীর অন্যতম হল বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এই মন্ত্রিসভার হয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ঘোষণা করছেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি অবিলম্বে উত্থাপিত হবে। এ সম্পর্কে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারার মতো কোনো কারণই তিনি দেখছেন না।

তারপর এক বছর কেটে গেছে। মন্ত্রিসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা সেই স্মারকপত্রটি অবিকল প্রকাশ করছি। সমবেত দায়িত্ববিস্মৃতির ভ্রান্তি অতিক্রম করে এই রাজ্যে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আশা করি, সকলেই তৎপর হবেন। —সম্পাদক

এ রাজ্যে বাংলা ভাষার দাবিতে
১৯৭২ সালের ৫ই মে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রদত্ত
॥ স্মারকপত্র ॥

আমরা এ রাজ্যের শিল্পী-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বিদ্যার্থী, নানা কাজের এবং নানা পেশার মানুষ। সরকারের কাছে আমরা এসেছি বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে।

বিগত নির্বাচনে ঘোষিত নীতি অনুসারে বর্তমান সরকার এ রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এর আগে অনেকবার কথা দিয়েও কথা রাখা হয় নি। আমরা তাই এই সরকারকে তাঁদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমরা নিষ্ফল আশায় কালক্ষেপ করেছি। আর অপেক্ষা করতে আমরা রাজী নই।

আমরা জানি, শুধু সরকারের চেষ্টায়, শুধু আইন করে বা ফতোয়া দিয়ে এ কাজ হওয়ার নয়। সরকারের সঙ্গে এ রাজ্যের সকলের এ কাজে সহযোগ চাই। সরকার যদি হাত বাড়ান, তাহলে তাঁদের হাত শক্ত করতে এ রাজ্যে লোকের অভাব হবে না।

আমরা মনে করি, বাংলা ভাষাকে এ রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হলে অন্ততপক্ষে এই এই কাজ এখুনি করা দরকার :

১। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে একটি জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ বা বিশেষ দপ্তর গঠন।

২। রাজ্য সরকারের ভাষানীতিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার জন্যে একান্ত আবশ্যিক আশু কর্তব্য হবে :

(ক) ১৯৬১ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা আইন অবিলম্বে সংশোধন করে আজকের উপযোগী করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা কার্যকর করা।

(খ) হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে এখুনি মফস্বল পর্যায়ে এবং তারপর ক্রমশঃ কলকাতার বিভিন্ন আদালতের রায়, ডিক্রি, আদালতের সর্ববিধ কাজকর্ম বাংলা-ভাষায় চালানোর ব্যবস্থা করা।

(গ) রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাতে এখুনি বাংলা ভাষাকে স্বীকার করে নেন, তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) সাইনবোর্ড, নোটিশ, প্রচারবিজ্ঞপ্তি, টিকিটপত্র, রাস্তার নাম যাতে বাংলায় হয়, তার জন্যে সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানকে সময় বেঁধে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া। একাধিক ভাষায় হলে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে বাংলা।

(ঙ) সিনেমাহলে প্রদর্শিত সমস্ত বিদেশী ভাষার ছবি (বিশেষত দলিলচিত্র বা জনশিক্ষামূলক ফিল্ম) বাংলা ভাষায় পরিবেশনের ব্যবস্থা করা। বাংলা ভাষায় তোলা ছবি পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শনের আরও বেশী সুযোগ দিতে সিনেমা মালিকদের বাধ্য করা।

(চ) রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তরকে জনজীবনে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার কাজে সচেষ্ট করা।

(ছ) আকাশবাণীকে এ রাজ্যে বাংলা প্রবর্তনের কাজে সহায়ক করা।

(জ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বস্তরে ও সর্ববিষয়ে বাংলাকে শিক্ষার বাহন করার জন্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করা।

(ঝ) অনুবাদক ও দোভাষী তৈরির জন্যে বিশেষ তালিম, বাংলাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, বাংলা ভাষায় সর্ববিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লেখানো, অন্য ভাষার বই অনুবাদ ও প্রকাশ, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা বাংলায় শিক্ষার ব্যবস্থা—সরকারকে এসব কাজে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য বিদ্বৎসংস্থার সাহায্য নিতে হবে।

৩। ভাষার বাহন হিসেবে লাইনোযনা ও ছাপার হরফ, টেলিপ্রিণ্টার, টেলিগ্রাফ টাইপরাইটার, শর্টহ্যাণ্ড, বানানবিধি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সরকারকে অবিলম্বে বিচার বিবেচনা করতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাঁরা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কুশলী, তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে। এ সব বিষয়ে উদ্ভাবনী কৃতিত্বকে যেন সব সময় স্বাগত জানানো ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। টাইপ এবং ছাপার হরফে মিল আনা দরকার। ভারতে বা বাংলাদেশে যাঁরাই বাংলা ভাষা বা বাংলা হরফ ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ থাকলে পারস্পরিক সাহায্য হতে পারে এবং ব্যাপক ব্যবহারের প্রশ্নে টাইপরাইটার বা ছাপার যন্ত্রের হয়ত দাম কম হতে পারে।

৪। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে সরকারের উদ্যোগে গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত বাংলা আকাদেমি এ রাজ্যে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আকাদেমির কাজ হবে : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা, আলোচনা ও উৎসাহ সৃষ্টি, চিত্তাকর্ষকভাবে জনসমক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন, সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষা, সম্মাননা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা, পত্রিকা ও পুস্তকপ্রকাশ ইত্যাদি।

আশা করি, আমাদের এই স্মারকলিপিটি সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

সতীশ লুম্বা

বালদণ্ডায়ুধম

মোহন কুমারমঙ্গলম

সুরেশ চক্রবর্তী

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ কালিদাস মিত্র

জাতীয় জীবনের উপরোক্ত কৃতী পুরুষদের প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'পরিচয়'-এর পরবর্তী সংখ্যায় এঁদের সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।